নবম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা
মাঘ-চৈত্র তেরশ' আটষট্টি

কবিতা সংগীত শিল্পচর্চা ও সমালোচনার ত্রৈমাসিক মুখপত্র

সম্পাদক
অরুণ ভট্টাচার্য

উত্তরসূরী

★

উনবিংশ শতকে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাস নানাদিক থেকে বৈচিত্র্যময়। বৃটিশ শাসকদের সংস্পর্শে তৎকালে একদিকে যদিও পাশ্চাত্যের উদার চিন্তাধারা ভারতবর্ষকে নবযুগ আন্দোলনের পথে নিয়ে গিয়েছিল, অন্যদিকে জাতিগতভাবে নৈতিক ও সামাজিক চরিত্রে ভারতবাসী ক্রমশঃ আদর্শচ্যুত হয়ে পড়ছিল। সেই সংকটকালে যে বিরাট পুরুষ ও সাধক দেশকে নতুন করে গড়বার স্বপ্ন দেখলেন, শুভ কর্মের পথে উদাত্ত আহ্বান জানালেন সমগ্র দেশবাসীকে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। উচ্চ-নীচ ধনী-দরিদ্র বিভেদ ভুলে তিনিই ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষকে রাখীবন্ধনে বাঁধলেন।

তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী বৎসরে সমগ্র জাতির সঙ্গে আমরাও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

★

কে সি দাশ প্রাইভেট লিমিটেড

আবিষ্কারক—রসোমালাই

কলিকাতা-৯

উত্তরসূরী

নবম বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা | শ্রাবণ-আশ্বিন | ১৩৮৯

★

সাময়িকপত্র ও বাংলা সাহিত্য :

সূত্র-নির্ণয় প্রসঙ্গে : অরুণ ভট্টাচার্য ৪০১

বাংলা সাহিত্যে সাময়িকপত্রের দান :

দিগ্‌দর্শন থেকে বঙ্গদর্শন : বিনয় ঘোষ ৪১৮

বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন : ভবতোষ দত্ত ৪৩৩

সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৪৪২

প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্র : পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ৪৫৫

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও পরিচয়-এর প্রকাশ : হরীন্দ্রনাথ দত্ত ৪৭৩

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা : সঞ্জয় ভট্টাচার্য ৪৭৮

আধুনিক বাংলা সাময়িকপত্র ও
বাংলা সাহিত্যের এ-কাল : নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ৪৮৩

বাংলা সাময়িক সাহিত্যের যুগরেখা : সনৎকুমার গুপ্ত ও মানস রায়চৌধুরী সংকলিত ৪৯৫

★

মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রতিষ্ঠিত 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট' পত্রিকার রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে আলোচনা-চক্র আয়োজিত হয় তাতে উপরোক্ত প্রবন্ধগুলি (১ম, ৩য় ও ৯ম রচনা বাদে) পঠিত হয়। উক্ত পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে আমরা সেগুলি বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করছি।

WEST BENGAL Mat

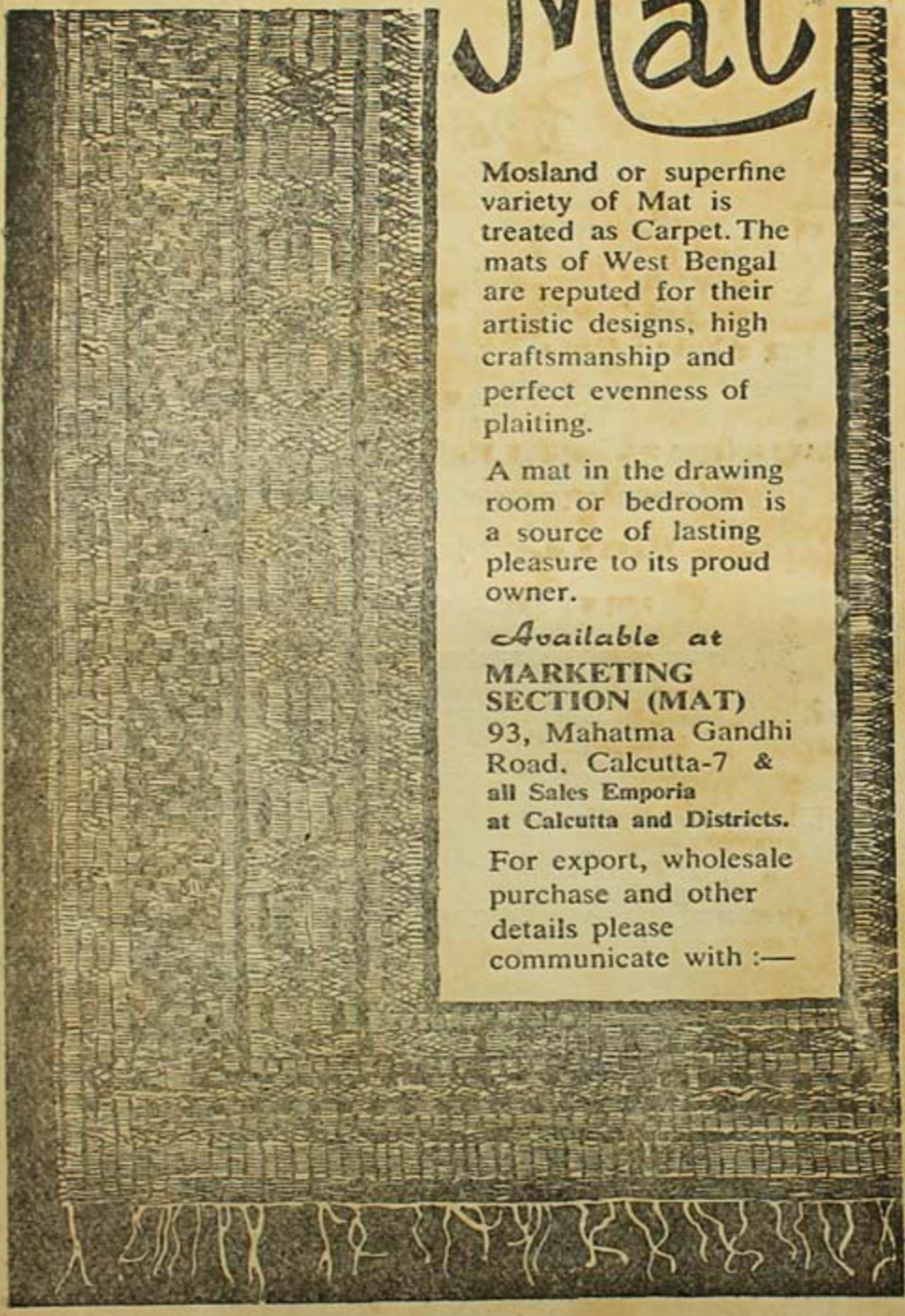

Mosland or superfine variety of Mat is treated as Carpet. The mats of West Bengal are reputed for their artistic designs, high craftsmanship and perfect evenness of plaiting.

A mat in the drawing room or bedroom is a source of lasting pleasure to its proud owner.

Available at

MARKETING SECTION (MAT)
93, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-7 &
all Sales Emporia at Calcutta and Districts.

For export, wholesale purchase and other details please communicate with :—

DIRECTORATE OF INDUSTRIES

Cottage Section, West Bengal

1, HASTINGS STREET (9th Floor), CALCUTTA-1

CHITRAKARU-91-11

হরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

উত্তরসূরী

নবম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮

ধূর্জটিপ্রসাদ : সহৃদয় সামাজিক

এক

সংসার রূপ বিষবৃক্ষে জাত যে দুটি মাত্র অমৃত ফলের আস্বাদন-আকাঙ্ক্ষা প্রতীচ্য ঋষি করেছেন তার পূর্ণ মর্যাদা যেন ধূর্জটিপ্রসাদের জীবন-চর্যায় রক্ষিত হয়েছিল। কাব্যরসাস্বাদ, কিংবা বিস্তৃত করে বললে জ্ঞানরসাস্বাদ সজ্ঞান সত্য সন্ধিৎসার আজীবনকাল তাঁর প্রধান, ইংরাজীতে যাকে প্যাশান বলে, তাই ছিল। বিদ্যাবস্তুর প্রতি বিশুদ্ধ অনুরাগ, প্রকৃত জিজ্ঞাসুর জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞানের নিরলস অনুশীলন তাঁর জীবনকে এক বর্তমানকালে প্রায়লুপ্ত মূল্যের হীরকোজ্জ্বল দ্যুতিতে ভাস্বর করেছিল। আর এই পঠন বুদ্ধিদীপ্ত মননে পরিণত হয়ে তাঁর নিত্যালাপে অপরূপ কথারূপ পরিগত হয়ে দক্ষ মার্জিত আলাপচারীর নিপুণ কথকতায় বন্ধুজন ও গুণগ্রাহীদের মুগ্ধ রাখত। পঠন, মনন ও কথোপকথনের তুলনায় তাঁর স্বল্প রচনার মধ্যেও এই আলাপচারীর কণ্ঠ যেন ধ্বনিত হতে থাকে। পাঠককে যেন এক ঘনিষ্ঠ বৈঠকী পরিবেশে টেনে নিয়ে যায়, সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্য তার আলাপ। এইখানেই তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য নিহিত। তাঁর রচিত ত্রিখণ্ডীয় উপন্যাসখানি তো বাংলা সাহিত্যের এক লক্ষণীয় ব্যাপার বলে পরিগণিত হবার দাবী রাখে। ইংরাজ লেখক ই এম ফর্স্টারের মত তিনিও যেন মনে করতেন এই ত্রুটিপূর্ণ, গ্লানিময় মানবসংসারে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের অন্তরঙ্গতার মধ্যেই সান্ত্বনা রয়েছে ও ফর্স্টারের মত এই ব্যক্তিসম্পর্ককে, সহৃদয় সপ্রেম চর্চার বিষয় বলেই যেন তিনি মূল্য দিয়েছিলেন। একথা যে নিতান্তই কল্পিত বস্তু নয়, তার সাক্ষ্য তাঁর জীবিত বন্ধু ও গুণগ্রাহীদের সকলেই দেবেন।

বর্তমানের ক্রমনিমজ্জিত মূল্যবোধের যুগে তাঁর তিরোধান আরও

তীব্রভাবেই শোকাহত লাগছে, কারণ তিনি ছিলেন এমন এক যুগের প্রতীক, এমন এক জীবনচর্যার প্রতিভূ যাকে কবর দিতে শুরু আমরা ভুলে যাচ্ছি। এই হিসেব করে চলা যুগে, মেপে মেপে চলা, সুবিধা বুঝে চলা মানুষের ভীড়ে তাঁর মত মুখ আর দেখব কিনা সন্দেহ। যখন লোকে হিসেব করে ছেলেকে পড়ায় ব্যস্ত, আর সে পড়া শেষ করে ডিগ্রির ছাপ নিয়ে অনায়াসে লেখাপড়া ভুলে জীবিকা ওছিয়ে তথাকথিত সাচ্ছন্দ্য ও আরাম বিলাস সংগ্রহে ব্যস্ত, আর সংস্কৃতি চর্চা যখন প্রায়শঃ নিতান্তই অবান্তর নামান্তরমাত্র, তখন তাঁকে আমাদের প্রয়োজন ছিল। এই হতভাগ্য দেশের তিনিই কি শরদীয় পূর্ব-সূরীদের শেষতম ব্যক্তি. আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি বিদায় নিলেন? পূর্ব ব্যক্তি নয়, অসংখ্য খণ্ডিত ব্যক্তির ভগ্নাংশে এই সমাজে তাঁর সহজাতীয়দের আবির্ভাব আর কি সম্ভব?

ত্রিদিব ঘোষ

দুই

সামনাসামনি ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে যেটুকু আলাপ আলোচনা হয়েছে, তাঁর লেখার বিক্ষিপ্ত কণিকা পড়েছি, মাত্র তিনখানি বইতে রাগসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ে যতটুকু মতামত জেনেছি তাতে আমি নিঃসন্দেহ যে এই মৃত্যুতে শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা ভারতবর্ষই একজন সমঝদার সঙ্গীতরসিককে হারালো যার অভাব সহজে পূরণ হবার নয়। সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য, অর্থনীতি বা দর্শনে ঘরোয়া বৈঠকে মজলিসী আড্ডায় যেমন তাঁর সহজ অধিকার ছিল, তেমনি সহজ ছিল তাঁর কাছে রাগসঙ্গীতের দুরূহ জটিল তত্ত্ব নিয়ে গভীর গবেষণার আলোচনা করা, মল্লারের প্রকারভেদ বা আশ্রয় বরাটীর গায়কীতে কতটা সোহানিয়রের ঘরের মিশ্রণ হয়েছে তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা। দুএকজন ব্যক্তির মুখে ধূর্জটিপ্রসাদের রাগসঙ্গীতের অধিকার নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুনেছি। আমার ধারণা, তাঁরা ধূর্জটিপ্রসাদের সাঙ্গীতিক আলোচনা-গুলি যথেষ্ট মনোযোগসহকারে পড়েন নি, হয়ত আদৌ পড়েন নি। সত্যেন বুঝতেন, ভারতীয় রাগসঙ্গীতের এমন ভক্ত কদাচিৎ মেলে: তিনি কোথাকিনই গোড়ামীকে প্রশ্রয় দেননি, অথচ এর ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। 'কথা ও সুর' নামে যে বইটি তিনি দিলীপ রায়কে উৎসর্গ করেন, তার

উপক্রমণিকা অংশটুকু পড়লেই বুঝতে পারা যায় যে তিনি বাংলাদেশের সঙ্গীত চর্চা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে কতটা পরিচিত ছিলেন। খাম্বাজী সঙ্গীতের আবহাওয়ায় তিনি নিজেকে মুক্ত রেখেছিলেন, উত্তর ভারতের বিভিন্ন সঙ্গীত কেন্দ্রে তিনি বহুবার গানবাজনা শুনেছেন, তৎকালীন দেশীয় রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় যে রাগসঙ্গীতের প্রচার ও প্রসার হয়েছিল তাতে তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছিল, অন্যদিকে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে প্রবর্তিত ও শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতঞ্জনকার অনুসৃত রাগ পদ্ধতিকেও তিনি সমান উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন জানিয়ে গেছেন—ইংরাজীতে যাকে বলে free mind—বস্তুত আজীবন কি ভাষচর্চায় কি শিল্পচর্চায়—তিনি তাইই প্রতিভূ। Indian Music—An Introduction' নামে তাঁর যে অধুনা দুষ্প্রাপ্য ইংরেজী গ্রন্থটি আছে তাতে তিনি একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক ও উপপত্তিক আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। তিনি যে শুধু মজলিশী শ্রোতাই ছিলেন তাই নয়, তাঁর জ্ঞান যে সুবিস্তৃত ছিল, কত যত্ন করে তিনি নানা গ্রন্থপাঠে সাঙ্গীতিক জ্ঞান আহরণ করেছিলেন তাও জানা যাবে এই ছোট্ট গ্রন্থটি পড়লে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর আগে ভারতীয় সঙ্গীতের যে অবস্থা ছিল আজ তা নেই। সঙ্গীত অনেক জনপ্রিয় হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কোথায় যেন সে তার মর্যাদা কুণ্ণ হতে দিয়েছে, যোগসূত্র কিছুটা লুপ্ত হয়ে গেছে। ধূর্জটিপ্রসাদ সেই পূর্বযুগের সঙ্গীতরসিক ছিলেন যখন কোন বিশিষ্ট ঘরানার বিখ্যাত আস্তাই শুনতে হলে অনেক ধৈর্য অনেক পরিশ্রম স্বীকার করতে হোত, এখনকার মত তা সহজলভ্য ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে পরিপুষ্ট হয়ে যে সঙ্গীত-ঐতিহ্য বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে হঠাৎ থেমে গিয়েছে, ধূর্জটিপ্রসাদ সেই অতীত যুগের আবহাওয়ায় লালিত। অল্পতিনুর অতীতের মানুষ তিনি সঙ্গীতকে যারা যত্ন সমজদার ও গুণীজনের মধ্যে বিকশিত হতে দেখেছেন, ঐশ্বর্য ও উদারতায় যে পরম্পরাগত শিল্প তাঁদের রসিকচিত্তের মনোরঞ্জনে সমর্থ হত। ভারতবর্ষের ঘরানা সঙ্গীতের প্রতি তাঁর যে অসীম মমত্ব ছিল তার প্রমাণ মিলবে এই কয় লাইন উদ্ধৃতিতে :

> সেনীয়া ঘরানার গায়ক-গোষ্ঠীর কুলপতি শিরোমণির বিখ্যাত গায়ক ছিলেন মহম্মদ আলি খাঁ এবং বীণকার গোষ্ঠীর প্রধান অধিনায়ক উজীর খাঁ আজ জীবিত নেই। সেনীয়ার একটি ঘর এখনও জয়পুরে আছেন, তাঁরা সেতারই বাজান। জাফরুদ্দিন, আলাবন্দে খাঁ এবং তাঁর পুত্র মঈনুদ্দিন

এখন জমজমাটির যবনিকোত্তোলন। রবাবী আর একজনও নেই। শরদের পীঠস্থান বোহিলখণ্ডে, বিশেষত রামপুরে। সেখানকার বিখ্যাত সরদিয়া কিদা হোসেনের এবং মহীশূরের বিখ্যাত বীণকার সেদ্দাদ ও রামপুরের উজীর খাঁর মৃত্যু প্রায় সমসাময়িক। পীঠাপুরম-এর সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী কয়েক বৎসর পূর্বে নিজের বীণার পাশে দেহরক্ষা করেছেন। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বেহালা বাজিয়ে বাইজু ত্রিভিয়ামোত্রামে থাকেন, তিনি অন্ধ হয়ে আসছেন, দেওয়ালের রাজার আলির ঘরণ দস্তরের কারাকাছি। ইন্দোরের বিখ্যাত বীণকার মরাদ আলি অল্পদিন হোলো মারা গেছেন, গোয়ালিয়রের অদ্বিতীয় ধ্রুপদীয়া ওমরাও খাঁ, টিকমগড়ের বৃদ্ধা হরচরণ লাল অশীতিপর বৃদ্ধ। গোয়ালিয়রের রাজাভেইয়া, রামপুরের ফৈয়াজ খাঁ মৈহারের আলাউদ্দিন এখনও জীবিত—কিন্তু তাদের স্থান অধিকার করবার যোগ্য ব্যক্তি নেই। (কথা ও সুর : ভাদ্র ১৩৪৪)

এই ছোট মর্মস্পর্শী শুধু যে তথ্যে ভারাক্রান্ত তাই নয়, শুধু যে ভারতীয় সঙ্গীতের একটি উজ্জ্বল চিত্র তাই নয়, লেখকের একটি দৃষ্টি যেন এই সঙ্গীত ইতিহাসের চারপাশে ঘুরছে যা অনুপম, স্নিগ্ধ হয়ও বা নিরোগাস্ত।

দুর্জটিপ্রসাদ, আগেই বলেছি, ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যে আস্থাবান হলেও গোড়ামিকে প্রশ্রয় দেননি, এর পরিবর্তনের সামাজিক কারণগুলি নির্দেশ করবার চেষ্টা করেছেন, এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি জানতেন, রাগরাগিণী যেমন বিভিন্ন যুগে বদলেছে, তেমনি গায়কীর প্রচলনেও নানা ধারা এসে মিশে নতুন রাস্তা আবিষ্কার করেছে। তিনি মন্তব্য করেছেন উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও বাংলা দেশের বাইরে বাজিয়ে মিঞাতার জন্য রাগিণীর ভদ্রতা বর্জন করতে কখনও পরাঙ্মুখ হননি। অতএব বলা চলে যে উত্তর ভারতের সঙ্গীতের ইতিহাস পরিবর্তনের পক্ষে"। সঙ্গীত যে ব্যাকরণ নয়, শুদ্ধমাত্র সুরের সমাহার নয়, আরোহী অবরোহীর, বাদী সমবাদীর তীব্র শাসনে কণ্টকিত নয়, বরং তা তার প্রাণের স্বতস্ফূর্ত আনন্দের ব্যঞ্জনা, যাকে বলা চলে লীলা—একথা দুর্জটিপ্রসাদ বুঝতেন আর বুঝতেন বলেই ভারতীয় সঙ্গীতের এসথেটিক্সে ওঁর অমিত বিশ্বাস ছিল।

দুর্জটিপ্রসাদ এর সঙ্গীত আলোচনার দুটি দিক আমার কাছে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বলে মনে হয়েছে। একটি সঙ্গীতের ঐতিহাসিক ও ঔপপত্তিক দিক—

এ দিকে তিনি খুব বেশী না লিখলেও এ বিষয়ে যে তাঁর উৎসাহ অসীম তার প্রমাণ মিলবে ইংরাজী বইটিতে। দ্বিতীয় দিক হচ্ছে ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে বাংলাদেশের সঙ্গীত চর্চার বিকাশ এবং এই দুই ধারার মধ্যখানে দুটি ঐতিহ্যের সেতুস্বরূপ হিসাবে রবীন্দ্র সঙ্গীতের আবির্ভাব। এখানে এসে তিনি সুরের বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন, মিশ্রণ ইতিহাস বর্জন করে সুরের আনন্দলোকে বিচরণ করেছেন, বুঝতে এবং বোঝাতে চেষ্টা করেছেন কোথায় কোথায় সঙ্গীতের মুক্তি, কোথায় তার মাধুর্য্য, কোথায় তার শ্রেষ্ঠত্ব। বাংলা গান সম্পর্কে তাঁর উদার মত এখানে উদ্ধৃত করছি : "কথা ভাব ও সুরের সংমিশ্রণে যে নতুন সঙ্গীতরূপের সন্ধান মেলে সে রূপ অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে তার পরিণতির পরিচয়, কিন্তু পরিপ্রেক্ষিতের দিক থেকে সে রূপ বাংলা গানের ভবিষ্যতের সুনির্দ্দিষ্ট ইঙ্গিত"। অবশেষে তিনি উপসংহারে মন্তব্য করেছেন, সমগ্র ভারতবর্ষে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগের দুটি দিক চোখে পড়ে—পুনরুদ্ধার ও নতুন সৃষ্টি—এবং কোন নির্দিষ্ট মত ও পথকে সমর্থন না করে তিনি ইতিহাসের গতির পরই তার সিদ্ধান্তকে ছেড়ে দিয়েছেন —সেখানে মানুষ সৃষ্টিকর্তা, তার রুচিতে, সমাজমানসের ব্যাপ্তিতে, যাচাইয়ে, রস-অনুভূতির তাগিদে নতুন রাস্তা তৈরী হতে থাকে।

'সুর ও সঙ্গতি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত আলোচনায় তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ধ্রুপদী ঐতিহ্যে লালিত, শুদ্ধ রাগ রাগিণীতে, বিলিষ্ট বাণী ও নিবদ্ধ তালে রচিত ধ্রুপদে তিনি অভ্যস্ত। উচ্চ অঙ্গের খেয়াল গান তিনি সম্ভবত খুব বেশী শোনেন নি (ধূর্জটিপ্রসাদ ও দিলীপকুমার রায়ের যুগ্ম প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সে শ্রীমতী কেশরী বাঈ-এর গান একবার শুনেছিলেন বলে জানা যায়)। অথচ ধূর্জটিপ্রসাদ সারাজীবন উচ্চ শ্রেণীর ধ্রুপদ ও খেয়াল গান শুনেছেন, খেয়ালের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব কারু অজানা নয়। খেয়াল গানের সৃষ্টির অনুরূপ বৈচিত্র্য ও তার রসানুভূতির আলোচনাতে তিনি দীর্ঘদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কলম চালিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতকে technicalities থেকে মুক্ত রেখে শুদ্ধ শিল্পসৃষ্টির বিকাশ হিসেবে দেখতে চান, অন্যপক্ষে ধূর্জটিপ্রসাদ সঙ্গীতের technicalities কে ভিত্তি করে এগোতে চান, শৃংখলের মধ্যেই শৃংখলা, শৃংখলার মাধ্যমে রসসৃষ্টি ও পরিশেষে ভাব-ব্যঞ্জনা—এমতের যুক্তিতে তিনি আস্থাবান। হয়ত

রবীন্দ্রনাথ বা দূর্জটিপ্রসাদ দুজনেই তাদের স্ব স্ব চিন্তাধারায় একটি মূল জায়গা আলোড়ন করেছেন, সঙ্গীত সম্পর্কে শেষ চিন্তায় দুজনাই হয়ত একমত, তবু তাদের দীর্ঘ পত্রবিনিময়গুলি চিত্তাকর্ষক ও অনন্য রসসমৃদ্ধ।

ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে ও তার সমস্যাগুলিকে দূর্জটিপ্রসাদ ইংরেজীতে এইভাবে পরিবেশিত করেছেন :

> ...the problem of Indian music is more than a technical matter. It is a question of Indian culture itself. A full flowering of Indian music is dependent upon the future course and content of Indian culture; and the long term possibilities will be governed by such large considerations as an understanding between the East and the West and the opportunities of fuller living for the Indian people. In short, the solution of the problems of Indian music will depend upon two factors: the way in which the unequal development of Indian social life and the frustrations of these war-years will be evened, conquered and canalised; and the manner in which the new social forces are going to be shaped . . . After all, music is an integral part of living: living together means a social process, and a genuinely active social process demands not merely an understanding but also an active release of the desires and ethos of peoples who must needs express themselves in various forms of art etc. etc. (Indian Music: An Introduction).

বস্তুত দূর্জটিপ্রসাদ এই সমাজতাত্ত্বিক এর দৃষ্টিকোণ থেকেই সঙ্গীত ঐতিহ্য ও সাঙ্গীতিক ইতিহাস বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা করেছেন।

অরুণ ভট্টাচার্য

ঋণ

['একালের লেখা' নামে দূর্জটিপ্রসাদের যে ছোট্ট রচনাটি উত্তরসূরী পত্রিকার ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল তা এখানে পুনর্মুদ্রিত হ'ল। আধুনিক সাহিত্য ও তরুণ লেখকদের সম্পর্কে তাঁর যে কি পরিমাণ উৎসাহ ছিল এই রচনাটি তার নিদর্শন। বিশেষতঃ যে অনুপম গদ্যরীতি তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য এনেছিল তার স্পষ্ট আভাসও এখানে মিলবে। সঃ উত্তরসূরী]

তোমার১ দেওয়া অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'নীল ডুংরির' রেশ মাত্রার দীর্ঘ অবসরে পড়ে ফেললাম। আটশ' মাইল দক্ষিণের ক্লান্তি ও একঘেয়েমী যে-ব্যক্তি ঘুচিয়ে দিতে পারেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে থাকতে পারছি না। তুমি লেখককে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ো। তাঁকে আমি চিনি না, ও তিনিও আমাকে জানেন না। এ ক্ষেত্রে, ইংরেজী কায়দায় তোমার মাধ্যমতার প্রয়োজন রয়েছে। 'পদ্মের পাঁচালি'র যখন দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকাশিত হয় তখন খোঁজখবর নিয়ে বিভূতিকে চিঠি লিখি (তার উল্লেখ আছে 'অপরাজিত'তে)। আগে-আগে যেচে আলাপ করতাম। বয়সের সঙ্গে উচ্ছ্বাস কমে আসছে, এবং বোধ হয় সাহিত্য-সম্পর্কও দুর্বল হচ্ছে। এই দেখ না, প্রায় দু' মাস ধরে ভাবছি 'দেশ'এর শারদীয়-কে অভিনন্দন জানাই, কিন্তু কিছুতেই হয়ে উঠছে না। তুমি ভদ্রলোকটিকে চেনো? সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর লেখাই আমার আজকাল সবচেয়ে ভালো লাগে। যদি তাঁকে জানো ত বোলো।

যে যাই হোক 'নীল ডুংরি' সম্বন্ধে আমার যা মনে হচ্ছে তাই এখন লিখি। বাঙলা সাহিত্যে এই ধরণের অনেক বই কি? আমার আপাতত অন্য দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে না। অমিয়ভূষণ লিখেছেন যে ইটখানি খানিকটা ঐতিহাসিক আর খানিকটা নয়। প্রত্যেক ঐতিহাসিক নভেলই তাই: যখন নভেল তখন ইতিহাসের কঠিন বন্ধন থেকে খানিকটা মুক্ত ত হবেই। কেবল আবহাওয়া থাকলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। বিখ্যাত ইটালিয়ান নভেলিষ্ট ম্যান্‌জনীর ফিউন্যাল ব্যারণদের বর্ণনা আছে বিস্তর: কিন্তু তাঁর নভেলটি পড়বার সময় শিয়েন, ব্রক, হাউসার্ড প্রভৃতি মধ্যযুগের আধুনিক ঐতিহাসিক-দের তথ্য মিলিয়ে দেখবার প্রবৃত্তি আমার লোপ পায়। একে Suspension of disbelief বলতে পার। অবশ্য তথ্যের, কিংবা বিশেষ জানা কোনো খুঁটিনাটি ঘটনার ভুল হলে মন খারাপ খায় নিশ্চয়। 'নীল ডুংরি' পড়তে আমি খাড়া খেয়েছি দু' এক জায়গায় কিন্তু রসের ব্যাপারে, খাড়া খাওয়ার চেয়ে খাড়া খাওয়ার পর দামলানটাই প্রধান কথা। গল্প বলার ভঙ্গীতে অমিয়ভূষণ আমাকে সামলাতে সাহায্য করেছেন—এইটাই তাঁর কৃতিত্ব। অর্থাৎ, খাইখানি রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

গল্প বলার ভঙ্গীটি ভালো। ভঙ্গী নেই, এইটাই ভঙ্গী। 'নীল ডুংরি'র গল্প চলেছে এমনই পদ্ধতিতে যে 'ভঙ্গী'র প্রয়োজনই ওঠে না। style, flow,

দুই রকমের হয়। এক হয় ভাষায়, যেমন ধরো টমাস উল্ফ-এর। তাঁর ভাষার ঢেউ ও ফেনায় বীচেকার undertow পাওয়া যায়। আর এক গতি হয় ঘটনায়। যেমন স্টাঁদা ও জোবেয়ারের মতোদের। সেখানে ঘটনার বেগের সঙ্গে চরিত্রেরও বিকাশ হচ্ছে। আমি অমিয়ভূষণকে এই মহারথীদের সঙ্গে তুলনা করছি না। কেবল গতির প্রকৃতি নির্দ্ধারণের জন্যই তাঁদের নাম উল্লেখ করছি। 'মীল দুঁইয়া'তে যে গতি পেলাম সেটি ভাষার নয়, ঘটনার। ভাষা এখানে সহজ, এতই সহজ যেন বাধা দেবার ভয়ে লুকিয়ে আছে। গল্পের ওপর শ্রদ্ধার এটি চমৎকার নিদর্শন। অমিয়ভূষণ, দু' একটি জায়গা ছাড়া, ঘটনার ওপর কোন মন্তব্যই করেন নি। বাঙালীর পক্ষে দার্শনিক কিংবা মনস্তাত্ত্বিক মন্তব্য ঘুষিয়ে দেবার প্রবৃত্তি নিতান্তই জোরালো। অমিয়ভূষণ এই প্রবৃত্তিটাকে প্রায় জয় করেছেন। এমন কি মৈথুনিক দৃশ্যের বর্ণনাও তিনি কম দিয়েছেন। গল্প চলেছে, এবং তাই পৌঁচেছে। আরোপিত ভাবে থামতে হয়ে।

গল্প স্রোতের undertow অনুভব করলাম দু'ভাবে। সারল্যতে আছে, কিন্তু গিয়েও যাচ্ছে না। নীলকুঠির মতন plantation adventuresগুলি এসেছে অথচ ঠিক কায়েম হয় নি, ইংরেজ কোম্পানি ঘুষিয়ার গড়ে অবশ্য পাকা করতে তখনও পারছে না, বিদেশী বিদেশ রহস্যের অংশ হয় নয়; সেনাপ্রবোধ জেগেও জাগেনি, পশ্চিমী সভ্যতা ইংরেজী শিক্ষার খিড়কী দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে অথচ অন্দর মহলে প্রবেশ করতে বাধা পাচ্ছে. এই ধরনের tension-এর সাহায্যে স্রোত তৈরী হচ্ছে বইখানিতে। বিদেশী প্রভু ও দেশী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যেকার বিরোধ ভাবকে একটি ঘূর্ণি বলতে পারে।

স্রোতের দ্বিতীয় ভাব হল চরিত্রের বিকাশে ও অভিব্যক্তিতে। বিকাশ আর অভিব্যক্তি এক বস্তু নয়। এইখানে মতভেদটির কিছু গলদ আছে। রাজচন্দ্রের অভিব্যক্তি আছে, বিকাশ কম; নয়নতারার বিকাশ আছে কিন্তু অভিব্যক্তি নেই। শিবেন্দ্রের, বাগচীর বিকাশ এবং হরদয়ালের বিকাশ ও অভিব্যক্তি দুই-ই। এই জন্য মনে হয় হরদয়াল চরিত্রটি সবচেয়ে সার্থক। আদির ছেলে আদিরে যেন কিন্তু তার প্রকাশ আতশবাজীর, explosive-এর।

একটা কথা মনে উঠছে এইখানে। আশা করি ভুল বুঝবে না। নয়নতারা চরিত্রটির function কি? তার প্রকৃতি না হয় বুঝলাম। নয়নতারা মুক্ত

নারী—emancipated নয়, free, এইটাই লেখকের উদ্দেশ্য মনে হয়। অথচ সে বিষয়ই হিন্দু দর্শনের প্রকৃতি নয় (রাজ্ঞও পুরুষ নয়)। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একপ্রকার মেয়ে চরিত্র সৃষ্টি করেন যার অনাবিল স্বাধীনতা অনেকটা মূল প্রকৃতির মতন। হাওয়ার মতন তার গতিবিধি, willy, nilly, blowing—তবু সে চালাচ্ছে কাউকে বা কাউকে। নবনতারার মধ্যে যেখানে dynamic element পাচ্ছি সেখানেই তার ব্যবহার (behaviour) অস্বাভাবিক এবং এতটাই অস্বাভাবিক মনে হয়েছে যে তখনই তার মুক্ত অস্তিত্বে সন্দিহান হয়ে পড়েছি। সে emancipated নারীর মতই ব্যবহার করছে। (বলা বাহুল্য, আধুনিকতমা স্বাধীনা প্রমদারা ঐ রকম ব্যবহার করেন) এই প্রথা-বিগর্হিত ব্যবহার কিন্তু freedom-এর প্রাপ্তস্তু নয়। তার সংঘর্ষক মাত্র। অর্থাৎ আমার মতে নবনতারা অ-সম্পূর্ণ। এইখানে অমিয়বাবু[3] লিখতে পারেন নি। নবনতারা বাঙলা সাহিত্যে অপূর্ব বলতে সব কথা বলা হল না। অপূর্ব সৃষ্টিটাই আসল। এবং সম্পূর্ণ না হলে অপূর্ব সৃষ্টি কি সম্ভব?

সে যাই হোক, মোদ্দা কথা এই যে 'নীল ত্রুইদা' নতুন ধরনের উপন্যাস এবং এমনিই তার গতি এমনিই তার objectivity যে সেটি তার স্বকীয়তার পূরক, সার্থক ও গরীয়ান। বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে সুলক্ষণের নিদর্শনই।

নতুন লেখকরা নতুন পথ explore করছেন দেখে সত্যিই সুখী হলাম। তা সেটা ইতিহাসের পাতায় হোক, আর Calcutta High Court Bar-এর নথীপত্রেই হোক। শুনছি বেনারীতে একজন ভদ্রলোক একটি অত্যন্ত সুপাঠ্য বই লিখেছেন, পড়েছ? নানা দোষ সত্ত্বেও আমি উপভোগ করলাম। আর অমিয় দাত্তালের 'স্মৃতির অতলে'? কোনটাই history নয়; সবগুলিই কিন্তু human history—নয় কি? একপাশে social realism আর অন্য পাশে দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক, stream of consciousness-এর চোরা পাহাড়। এই দুটো থেকে অব্যাহতি পেলে আমাদের পক্ষে মঙ্গল হয় না।

দুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

---

১ বিমল মুখোপাধ্যায়। ২ রাজেশ্বর মিত্র। ৩ অমিয়শঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রচৈতন্যের উৎস : একটি সূত্র

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এ ধারণা এতদিনে আমাদের অর্জন করা উচিত ছিল যে রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথ নন, তাঁদের চেয়েও স্বতন্ত্র অন্য দু'টি মানুষ রবীন্দ্রচরিত বা রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের গঠনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার ক'রেছিলেন। এঁরা দু'জন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে উজ্জ্বল চেতনা[১]। একজন সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টির সামনে নানাভাবে উদ্ভাসিত, অন্যজন স্পষ্টই অবহেলিত। এ দু'জন মানুষ রবীন্দ্রচৈতন্যকে দু'রকম মালমসলায় গ'ড়ে তুলেছেন এবং এই বৈপরীত্যের যোগফল কোন রকম বড় বিরোধ অথবা বিভ্রান্তির সৃষ্টি না ক'রে, রবীন্দ্রজীবনে প্রায় সর্বতোভাবে কল্যাণপ্রসূ হ'য়েছে বলা চলে। বিদ্যাসাগর চরিত্রকে এককথায় যে আখ্যা দেওয়া যায় তা হ'লো, তিনি জীবনের প্রথম থেকে শেষদিনটি পর্যন্ত 'হিউম্যানিস্ট'। পরিচ্ছন্ন মানবতাই তাঁর জীবনধর্ম ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন জীবনের সর্বত্র আর্টিষ্ট, এবং তাঁর এই শিল্পচেতনাও নানারকম অভিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে শুদ্ধ ছিল।

মানবতার সঙ্গে আর্টের কোন বিরোধ নেই সত্য এবং একথাও অনস্বীকার্য যে উভয়ের সাযুজ্যপূর্ণ মিলন বা সাহচর্য ছাড়া কোন মহৎ কর্ম বা শিল্পের অনুষ্ঠান অসম্ভব; কিন্তু সামাজিক সৎ মানুষ সকল সময় আর্টিষ্ট হয়না অথবা আর্টিষ্ট সকল সময় কর্মজীবনে আর্টস্রষ্টার অধিক অন্য কোন মানবকল্যাণের কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ ক'রতে সমর্থ হয় না। সৎ, একনিষ্ঠ এবং সৃজনপ্রতিভার অসামান্য আর্টিষ্ট বাংলার সাহিত্যজগতে বেশী নেই,

---

১ মানবচৈতন্যের উজ্জ্বলতা আসে সংস্কারমুক্তি থেকে। যে কোন কর্মী বা শিল্পীর জীবনে এই সংস্কারমুক্তি এবং প্রাগ্রসর বুদ্ধচেতনা (রেনেসাঁস) অপরিহার্য। উনবিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বলতম মানুষ হিসেবে আরো দু'জনের নামও এই প্রসঙ্গে মনে আসে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্র।

মাইকেল, অবনীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, এমন কয়েকটি নাম করতেই তালিকা ফুরিয়ে যায়। পরিণত হিউম্যানিষ্ট রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মত এই দেশে ক'জনই বা জন্মেছেন? এ দুয়ের যোগফল তাই একটি মানবজীবনে অধিকতর উজ্জ্বল প্রতিভাত হবে, এমন কথা ভাবতে পারা—রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ আমাদের সামনে না থাকলে—খুব সহজ হ'ত না। কিন্তু এমন ভাবতে পারা যায়, কেননা আমরা 'কবি'-রবীন্দ্রনাথ-কে অনুভব করতে পেরেছি। তাঁর এই 'কবি'-নাম আমি শুধু কবেকহাজার কবিতার রচয়িতাকে মনে রেখেই উচ্চারণ করছি না। এখানে 'কবি' কথাটির অর্থ—তিনি শুদ্ধ চেতনার দ্বারা জীবনবোধ ও শিল্পকর্মের অভিজ্ঞান আহরণ করেন এবং সেই জ্ঞানকে রেনেসাঁস-এর কাজে ব্যয় করেন, তিনিই কবি। রবীন্দ্রনাথ এমনই একজন কবি—জীবনশিল্পী—পরিপূর্ণ মানুষ।

আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় দুটি নামের আলো, রবীন্দ্র-জীবনীর সূত্রে, আমি যত বেশী স্পষ্ট করে অনুভব করি। রামমোহন এবং দেবেন্দ্রনাথ থেকে এঁদের মানসগঠন অনেকাংশে আলাদা। যদিও সংস্কারমুক্তি এবং রেনেসাঁস-এর প্রাথৈশ্বর্যে রামমোহনের মতই এবং হয়ত বা রামমোহনের প্রেরণার দ্বারাই এরাও ধনী। পূর্বসূরীর সঙ্গে এঁদের দুজনেরই মানসগঠনের সবচেয়ে বড় পার্থক্য এখানেই যে এরা কেউ ধার্মিক নন; এঁদের চৈতন্য এবং বিশ্বাস অন্যত্র স্থাপিত। দর্শনতত্ত্বের দিক থেকে রামমোহনের উপরসূরী দিকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; কিন্তু বিদ্যাসাগর রামমোহনের রেনেসাঁস-আন্দোলনকে অন্য সমধিক থেকে চেতনায় গ্রহণ করলেও তাঁর দর্শনতত্ত্ব অথবা ধার্মিক মানসিকতা বিদ্যাসাগরকে সামান্যও প্রভাবিত করে নি। জ্যোতি-রিন্দ্রনাথের শিল্পবোধও এই philosopher অথবা preacher এর ভূমিকা থেকে অনেক দূরে সরিয়েছিল; তিনি যদিওবা ব্যাপক চৈতন্যের ঔদার্যতায় বিশ্বিত হ'তেন, কিন্তু তার উৎস শিল্পে; ধর্মে বা আধ্যাত্মিক অনুশীলনে নয়। রবীন্দ্রনাথও এদিক থেকে রামমোহন থেকে অনেক দূরের মানুষ; এমনকি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করা এবং কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে সর্বত্র উপনিষদের কাছ থেকে প্রেরণা গ্রহণ করা সত্ত্বেও। রবীন্দ্রসাহিত্য যিনিই ভাল করে পাঠ করেছেন, তিনিই স্বীকার দিতে পারবেন, কোন প্রচলিত অথবা নতুন দর্শন তিনি সাহিত্য মারফৎ আমাদের দান করেন নি; বরং তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে

এক দর্শন থেকে অন্য দর্শনে বিচরণ করার অস্থিরতাই অধিক স্পষ্ট। যে কারণে এমন একজন আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন ও যেমত বিচারে কবিতাকে মাপ-জোখ চেষ্টা করেছেন, তার উৎসও রবীন্দ্রনাথের এই অস্থির প্রত্যয়ে; সেটা শিল্পীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কিন্তু দার্শনিকের নয়।২

অবশ্য একথা অস্বীকার করারও উপায় নেই যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মূল্য-চেতনাকে শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত করার প্রচেষ্টায় কখনো কখনো তাঁর উপনিষদ-প্রীতির বন্ধ্যত্বীনতা থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। যে ইতিহাস চেতনায় তাঁর 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী' ও 'রক্তধারা' স্থানে স্থানে অপরূপ ভাস্বর, তা-ই খণ্ডিত হ'য়েছে শেষপর্যন্ত এক আধ্যাত্মিক আশ্রয়ের অহেতুক অন্বেষণে, যা থেকে রবীন্দ্রনাথের মত শিল্পীর মুক্ত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই একটি দায়, যা কবির ওপর চিরা ফেলেছে, রবীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনাকে সমগ্র আচ্ছন্ন করতে পারে নি ও। বিশ্বাসাগর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (এবং মাইকেল মধুসূদন) অনুরূপ বন্ধ্যত্বীনতা থেকে সম্পূর্ণই মুক্ত ছিলেন। রামমোহন থেকে তাঁরা সকল সময় সামনের পথেই অগ্রসর হ'তে পেরেছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অনেকস্থানেই পেছনে হেঁটেছেন। রবীন্দ্রনাথের ওপর তাই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যতটুকুই পড়েছে তার সবটুকুই মঙ্গলদায়ক হয় নি। যেমন 'সোনার তরী'র তুলনায় 'গীতাঞ্জলি' কোন উৎকৃষ্ট রচনা নয়

---

২ এমনকি টলষ্টয়ের মত দার্শনিক-কথাশিল্পীকেও এই অস্থিরতার আবর্তে পড়তে হয়েছে। 'ওয়ার এণ্ড পিস্' এবং 'কুরোজার সোনাটা' এক লেখকের লেখা; এবং যে প্রত্যয় 'ওয়ার এণ্ড পিস্'-এর রচয়িতাকে একজন দার্শনিকের ভূমিকায় স্থাপিত করেছে, 'কুরোজার সোনাটা'র সেই প্রত্যয় শুধু খণ্ডিতই নয়, প্রায় ধূলিসাৎ হ'য়েছে বলা চলে। বর্তমান শতাব্দীর উজ্জ্বলতম কথাশিল্পী হেমিংওয়ের সাহিত্যেও এই শিল্পসংশয়ের দ্বন্দ্ব বর্তমান।

৩ অতুল অন্নদাশঙ্করের রচনা 'বড়দিদির হাট' 'মুহূর্ত' প্রভৃতি উপন্যাসে, সমরেশ বসুর নানা গল্পে, পরিণত বয়সের রচনা 'যোগাযোগ' প্রভৃতি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনা কোথাও খণ্ডিত হয়, এবং কোন আধ্যাত্মিক দর্শনই এই সকল শিল্পকর্মের উপর অহেতুক প্রভাব বিস্তার করে নি।

তেমনি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বচেতনার প্রাথমিক দর্শন সর্বত্র মুক্তকণ্ঠে মানে নি। কিন্তু বিদ্যাসাগর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁকে অনেকাংশে এই ত্রুটি থেকে মুক্ত করেছে।

কিভাবে রামমোহন এবং দেবেন্দ্রনাথের তুলনায় বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রচরিত্রকে বেশী প্রভাবিত করেছেন, এবার দেখা যাক। রামমোহন সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষে ছিলেন সমাজ এবং ধর্মবিপ্লবের প্রচারক। আন্দোলনই ছিল তাঁর এই কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। এদিক থেকে তিনি বুদ্ধ, খৃষ্ট এবং চৈতন্যের সঙ্গে অনেকাংশেই তুলনীয়। তাঁর এই আন্দোলনের দলে (বিদ্যালয় স্থাপনে তাঁর উৎসাহ ও পরিশ্রমকে মনে রেখেও একথা বলা চলে) সংগঠনের কাজ বড় হয়ে ওঠে নি; কোন ধার্মিক বা প্রচারকের কাঁধেই প্রচার বা দলগড়ার তুলনীয় সাংগঠনিক কর্মে আত্মনিয়োগ করার সময় এবং সুযোগ হয়তো তত্টা মেলে না। অন্যত্র, এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবার ফলে, বিদ্যাসাগর তাঁর পরিণত জীবনের প্রথম থেকেই সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বাংলার গ্রামে গ্রামে তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন এবং বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পৌরহিত্য করা সত্ত্বেও তিনিই বর্ণপরিচয় ও বাংলা বাক্যরূপের বই রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যেহেতু সংগঠনের কাজকে বাদ দিয়ে শুধু আন্দোলনের দ্বারাই কখনো রেনেসাঁস-এর আবির্ভাব ঘটানো যায় না, সেহেতু বিদ্যাসাগরের এই সাংগঠনিক মূর্তিটি দুই শতাব্দীব্যাপী রবীন্দ্রনাথের সংস্কারমুক্ত কর্মজীবনের ব্যাখ্যায় আমাদের মনে রাখতেই হবে। যে ঈশ্বরচন্দ্র কোনদিন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিতই ছিলেন না, প্রয়োজনের দিনে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদনা করেন, কেননা তাঁর সময় ঐ পত্রিকাই ছিল সর্বাধিক প্রগতিশীল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সামাজিক কর্তব্য পালনের সময় প্রায় আক্ষরিকভাবে বিদ্যাসাগরকেই অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর চোখের সামনে একদিন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়েছে, কিন্তু তিনি সেদিকেই বিদ্বেষভাবে মাথা না ঘামিয়ে তাঁর সময়কার সর্বাধিক প্রগতিশীল পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদনাতেই বেশী উৎসাহী ছিলেন। অথচ এই পত্রিকার ধর্মিষ্ঠ মহলের সঙ্গে তাঁর যে খুব বেশী আন্তরিক সহযোগীতা ছিল, তা নয়। বিদ্যাসাগরের মতই তিনি 'সহজপাঠ', 'ছুটির পড়া' প্রভৃতি শিশু ও কিশোরপাঠ্য বই লিখেছেন; এবং প্রেরণাও

এসেছে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকেই। এমনকি পুত্র রবীন্দ্রনাথের বিয়ের ব্যাপারেও তিনি যে প্রায় বিদ্যাসাগরের পদাঙ্কই অনুসরণ করেছেন, তা সম্ভবত এখন আর কারুর অবিদিত নেই। বিবাহের জন্য কবির, আন্তরিক কাতরতা—যা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে কিছুটা বিবৃত করেছেন—সেটাই স্মরণ করার এই ক্ষুদ্রম মানুষের সব বহুক্ষেত্রেই একসূত্রে বাঁধা। জীবনের সুদীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের মতই শিশু এবং কিশোরদের শিক্ষার জন্য ভেবেছেন এবং কাজ ক'রে গেছেন। রামমোহন এবং দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজকে চোখের সামনে মৃত হ'য়ে যেতে দেখেও তিনি সাহিত্যদেহের বাইরে বিদ্যাসাগর-প্রদর্শিত পথ থেকে অন্যত্র বিচরণ করেন নি; কেননা তাঁর জীবদ্দশায় রেনেসাঁসে আর ব্রাহ্মধর্মের আশ্রিত ছিল না, ছিলো বিদ্যাসাগর-প্রদর্শিত সমাজকে নূতন করে সংগঠনের কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বলা বাহুল্য, পারিবারিক জীবনযাত্রার থেকে এভাবে দূরে সরে আসায় তিনি যে রামমোহন থেকে বেশী দূরে চলে গিয়েছেন, এমন কথা মোটেই প্রমাণিত হয় না। আমার প্রতিপাদ্য এই যে চরিত্রের দিক থেকে তিনি রামমোহনের উত্তরসূরী ছিলেন না যতটা বিদ্যাসাগরের আত্মীয় ছিলেন। সংস্কারমুক্তিতে তিনজনের ভূমিকা এক হওয়া সত্ত্বেও[৪] রামমোহন ছিলেন সর্বাগ্রে ধার্মিক, বিদ্যাসাগর এবং রবীন্দ্রনাথ সর্বাগ্রে জীবনশিল্পী, সংগঠক। দেবেন্দ্রনাথ এবং আমার মনে হয় রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ তাঁদের সমস্ত সদিচ্ছা সত্ত্বেও রামমোহন থেকে সংস্কারমুক্তির ভূমিকায় কিছুটা পিছনে ছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের

---

[৪] বরং সাহিত্যসৃষ্টির বিচারে রবীন্দ্রনাথ এদিক থেকে কখনো কখনো মাইকেল বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তুলনায় রক্ষণশীল বলেই নিজেকে প্রমাণিত করেছেন। এদিক মনে রেখে যদি রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যায় তা হ'লে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরকে তুলনায় অধিকতর সংস্কারমুক্ত বলা চলে। কিন্তু অভাবের বিয়োগফলের সঙ্গে যদি ভাবের যোগফল যুক্ত করা যায়, তবে বলতেই হবে দু-শতাব্দী ব্যাপী সারা বাংলার রেনেসাঁস আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অদ্বিতীয়, তাঁর দান সর্বাধিক।

সাংগঠনিক প্রতিভার সাহায্যে সর্বদাই সামনে অগ্রসর হয়েছেন। এই কারণে দুই শতাব্দীর রেনেসাঁস আন্দোলনে তাঁদের দান অক্ষয় এবং অতুলনীয়।

এই সূত্রকার প্রবন্ধের ভূমিকাটি এমনভাবে লিখিত যে আলোচনার কোন-খানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মরণ অনিবার্য হয়। রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনায় আমরা বিহারীলালের কথা অনেকদিন ধরে শুনতে পাই। অবশ্যই কবির গীতিকাব্যগুলিতে বিহারীলালের পরিমিত প্রভাব আছে, এবং এই কারণে কবির আলোচনায় বিহারীলালের নামোল্লেখ অনিবার্য হয়। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় আমরা একটি কথা ভুলে যাই যে রবীন্দ্রনাথ শুধু কবিতাই রচনা করেন নি : তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা অন্যত্র স্থানে উদ্ভাসিত। এই প্রতিভা এমনকি সাহিত্য ছাড়িয়ে শিল্প, সংগীত এবং তারপরের জীবনের অন্য সমস্ত সৃষ্টিকার্যে রবীন্দ্রনাথকে বিশিষ্ট করেছে। প্রতিভার এই অফুরন্ত ভাণ্ডার ঊনবিংশ শতাব্দীতে আরেকজনের কাছে মাত্র উন্মুক্ত ছিল, তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা এবং স্বাধিকার চেতনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কে আজীবন প্রেরণা জুগিয়েছে, তার মূলরূপ হয়েছে ঠাকুর-বাড়ীর (এবং উত্তরকালে ঠাকুরবাড়ীর বাইরের) এই নির্জন মানুষটির জীবনে তেমন করে পল্লবিত হয় নি; কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের সকল অলাকল্যই যে রবীন্দ্রনাথের সকল সাফল্যের উৎসরূপ, এ কথা আজ আমাদের চিন্তা করা দরকার। পিতার সংস্কারবিরোধী ধর্মপ্রচারকের প্রভাব থেকে, ব্রাহ্মধর্মের প্রচলিত দর্শন থেকে, অনেক দূরে তিনি ভাইকে নিয়ে গিয়েছিলেন রাজনারায়ণ বসুর রাজনীতির পাঠশালায়। ঠাকুর বাড়িতে তিনিই সর্বপ্রথম প্রথম-শ্রেণীর চিত্রশিল্পী। তিনিই আন্তর্জাতিক সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সর্ব-প্রথম রবীন্দ্রনাথের এবং সমগ্র বাঙালী সমাজের সামনে উন্মুক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার পাশে ঘুরে বেড়াতেন তিনি; পরিবারের সমস্ত সংস্কার থেকে ভাইকে দূরে, অনেক দূরের 'মানুষের একটিই পৃথিবীতে', তিনিই প্রথম নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে দুভাই পরস্পর থেকে আজীবন বিচ্ছিন্ন থাকলেও, একথা মনে করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে যে শিল্পী ও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতেগড়া মানুষ, এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতেই রেনেসাঁস আন্দোলনের অন্তিমে রবীন্দ্রনাথ যে

ধর্মের দিক থেকে সরে এসে রাজনীতি ও সাহিত্যের দিকে ঝুঁকেছিলেন, তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই হস্তক্ষেপের ফল।

একদিক থেকে ঠাকুরবাড়ির ক্রমবর্ধমান সংস্কারপ্রীতির বিরুদ্ধতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথই প্রথম করেছিলেন। কিন্তু তিনি সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ শিল্পীই ছিলেন। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের তুলনায় একদিক থেকে তিনি অনেক বেশী প্রতিভাবান। ঘটনার বিরুদ্ধতায় এবং নীচ পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদের ফলে একদিন সৃষ্টির পথ থেকে ঘুরে মানসিক নির্জনতার ও নিঃসঙ্গতার রাজ্যে তিনি চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তার আগে তিনি ছবি আঁকতেন; এবং পরে সম্পূর্ণই ছবি আঁকা ত্যাগ করে রাতদিন পিয়ানো বাজাতেন। এ আমাদের শোনা কথা, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনচরিতের সঙ্গে এমন কাহিনীর সম্পূর্ণ মিল আছে।

কিন্তু সমস্ত ব্যর্থতার, বঞ্চনায়, নির্জনতার মধ্যে তিনি এমন একজন কবিকে বাংলাদেশে উপহার দিয়ে গেলেন, যিনি কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম নাম। কবির অন্য জীবন, তাঁর ইতিহাস চেতনা এবং সংগঠন চেতনাও প্রথমদিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই সাহচর্যে পুষ্ট, এবং পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্র অনেকদিক থেকেই রবীন্দ্রনাথকে পথ দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এই দু'জন উজ্জ্বল চেতনার প্রায় পরিপূর্ণ বিকাশ।

অমিয় চক্রবর্তী

যে-কোনো

হতে পারত ঐ ঘর, হতে পারত ঐ
ঘুমোনো শিশুকে ঘুলিয়ে গায়ের ঘর—
রাঙা রোদ্দুরে দুটোনো ঘাসের ঘরে
খোলা জানলায় আকাশে পাহাড়,
নরম সূর্য ;
ওকোচ্ছে জামা বাগানের ভারে,
কিচি গায় বোলা হাওয়ায় হাবাব—
হতে পারত ঐ
সবই আমার ॥

ঘুচোখ বিভোর ভাবছে পথিকা
যেতে যেতে তবু সবই তো আমারই—
শীতল পাটিতে রূপ-বিশ্রাম
মধুর ঘুপুরে,
আলনায় পাশে পাতা-খোলা বই,
জড়ানো খেলনা,
ভরা সংসার বুকে নিয়ে গান হওয়া।
দেশে বহুদেশে ছবি আসে তবু ছবি
হতে পারত ঐ,
হতে পারত ঐ ঘর, ডিমের পদোর ॥

উদাসী

যেটা যা-হবার
কোথোথিসই, তার
খোঁজে
যাবে, তবু ও যে
চলে একাকিনী
ফিরে যাবিবার।
সেই ট্রেনে চ'ড়ে
তোলা সে মায়ের
বিদেশী গ্রামের
ছিন্ন কাহিনী ;
সেই যায় দিন
হস হল ভোরে—
সেই ভ্যাকোভিশ ॥

ট্রেন পেছে চ'লে
বেলা সে অতলে,
সে দেশ কোথায়।
হঠাৎ পবন
তবু সে ক্ষণকে—
যদি বা ভোলায়,
বলো সেই, সেই
মুক্ত যে সেই—
পারো যদি মন,
বোঝাও মনকে ॥

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

লোকটিকে ভাখো

ঐ যে লোকটি খাটে দারাক্ষণ সাজানো বাগানে
কাঁজস্থিতে জল দেয়, ধুলো ঝাড়ে, দক্ষিত শাখার
কীটঘ্ন পাতাগুলি ছেঁটে দিয়ে তার দরিবারে
নতুন তারার গুচ্ছ হাতে দিয়ে মাটিতে লাগায়
এবং গোলাপ কিংবা কৃষ্ণচূড়া, চন্দ্রমল্লিকার
উদ্ভাসিত হাসি দেখে সংসারের কপটতা ভুলে
মগ্ন থাকে কিছুক্ষণ তার চেয়ে স্নিগ্ধ সুখী লোক
আর তো দেখিনা কিছুদিন। কর্মপক্ষ তার
আত্মস্থ, সংসারী, বিষয়ী। টাকা দিয়ে যোগ্যতার
যদি পরিমাপ হয় তাহলে এ লোকটির প্রভু
অবশ্যই অবাক মানুষ। সবচেয়ে মজা এই
বাগান করার পর ষোল আনা। যদিও ফুলের
দিটোল সৌন্দর্য তার চোখে আবেষেনা কোনদিন
শিল্পীর জীবনবেদ। শুধুমাত্র যেসে বন্ধুদের
বাহবা কুড়াবে বলে লোকটাকে রেখেছে বাগানে
দু'মুঠো অন্নের বিনিময়ে।

কত অবচ শিল্পীত

অত্যন্ত জীবন এই লোকটির। নির্জন বাগানে
উদয়াস্ত রোজ খাটে। শিরদাঁড়া বেঁকে যায় তবু
কুসুমিত শিল্পশালা তৈরী করে, বর্ণের আহ্বানে
গভীরে তলিয়ে যায় সম্মোহিত প্রেমিকের মত
ফুলের লাবণ্যে চোখ অভিভূত হলে। প্রভু তার
শিল্পোদরপরায়ণ, বন্ধু পত্নী, যাদুকরী কি বন্ধু তন্বী যদি

সজ্জিত বাগানে ঘুরে পরিতৃপ্ত মুখে হাসি এবে
অন্তত একটিবার প্রশংসার পঞ্চমুখ হব
এবং তারিফ করে মালিকের কিছুটা অন্তত
তাহলেই প্রভু খুশী, মূল্য দয় নারীর শরীর
যেহেতু আকাঙ্ক্ষা তার ; অতি মূর্খ মালীটা বরং
বাগানের সংরক্ষণে রাত দিন হুঁশিয়ার থাকুক।

ঐ যে লোকটি খাটে, প্রভু নয়, ভৃত্যই হয়তো,
মমতা, সস্নেহ যত্ন ঢেলে ঢেলে প্রজ্ঞার মাটিতে
ফলগর্ভ চেতনার ধারা আনে তার মতো আর
নিঃস্বার্থ প্রেমিক তুমি দেখবে না এখানে কোথাও।
বৃষ্টিতে ঝরার কিংবা গ্রীষ্মে শীতে ভাবো সর্বদাই
বিরল আকাঙ্ক্ষা তার বুকে আনে সুন্দর সরির
জ্যোৎস্নাসিক্ত পূর্ণিমা নির্ঝর। বিস্মরণে থাকে তার
তিরিশ টাকার বেশী বস্তাহত দুর্বহ সংসার।

বিনীত উপায়ে

তবু নেই। বিনীত হয়েই আমি থেকে যাবো।
বিনীত হয়েই আমি তন্ত্রতাবে কঠিন উপায়ে
শুধাবো দিনের ক্ষণ, অতুল প্রসাদ।

বিনীত হয়েই আমি তোমাদের অন্ত হিরেটাকে
প্রতিদানে ফেরে দেবো
যেমন বর্ষিত হলে তীক্ষ্ণ হিম মাথার উপরে
অবোধ প্রান্তরে সারারাত
প্রান্ত বৃক্ষ সব করে, উত্তোলিত রাখে দীর্ঘশ্বাস।

বিনীত হয়েই আমি থেকে যাবো।
কোনো অন্ধ অভ্যাসের রোষে
হবো না শাপদ কিংবা বিষধর প্রাণী।

কিন্তু যদি শাপদের মতো স্বভাবহ
কেউ হয়! বিনীত হয়েই একবার
দেখবো সে বাঁচে কিনা অত্যন্তভাবে কঠিন উপায়ে।

কালি, বর্ণ, গম্ভীরতা

কালি বর্ণ গম্ভীরতা নিয়ে বেঁচে আছে
সংসর্গের কড়ো দিনে উষাবু জীবন।
এখানে ওখানে ঘুলো, স্মৃতির কাঁপিতে
দূরন্ত পুতুলগুলো খোঁজে আত্মজন
নিরেকী বিষাদ। সন্ধ্যার গোপনে আলো দিতে
ক্রমশ মিলিয়ে যায় ক্ষণিকু যৌবন।

কালি বর্ণ গম্ভীরতা নিয়ে বেঁচে আছে
উষাবু জীবন। ক্রমশ সঙ্কীর্ণতর ঘরের চৌকাটে
প্রতীক্ষার দীর্ঘ ছায়া। প্রত্যহ আলোর কাছে
যদিও প্রার্থনা করে প্রথম প্রেমিক
এবং উজ্জ্বল বর্ণে আলোকিত হবে চতুর্দিক
তবু হিংস্র আশুদার মুতীক্ষ্ণ থাবায়
প্রত্যাশাকে অন্ধকারে দীর্ণ করে ঠিক।

দীর্ণ করে, তবু দীর্ণ হয় না জীবন।
এবং কোথাও হিংস্র অন্ধকার গাঢ়তর হ'লে
অন্ধকারে বুক রেখে মৌলিক আশ্বাসে

রক্তের বদলে শিল্প সাজায় যৌবন ;
অন্ধকার শুঁড়ো হয়ে মোমাছির মতো ওঠে জ্বলে'।

যদি বর্ণ গভীরতা জীবনের প্রতি রোমকূপে
অহরহ দাড়া আনে, আনে হাওয়া শিলায়িত তূণে ॥

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নীলমণি

(মহাভারত, বিরাটপর্ব। উত্তরার শয়নঘর। মধ্যরাত্রি)

বৃহন্নলা ॥ কথা রাখাও ! গোধের কুয়াশার
অবচেতন আলোর নির্ঘোষ
অন্নদী কথা ! শ্বেতপাথরে শুয়ে
রাখতে বেঁধে রাখবো তাকে ঘুমে।

সৌরন্ধ্রী ॥ কেন তুমি এমন হ'লে ? কেন
দারুণ রাহু তোমার মহারাশি
লয়ে ছিল ? নারীকে ফেলে তুমি
বুকের মধ্যে পোষ বিষাদ, বুক
শয়নঘরের পাষাণে বিঁধে, পুরুষ !

বৃহন্নলা ॥ ছুঁয়োনা তুমি রমণী। দেহ নীল
সাপের বিষে। এলো না তুমি কাছে···
হিংস্র পশু রাখিতে পর্দার।

সৌরিন্ধ্রী ॥ ভয় তুমি, ঘুমাও ! আমি বুক
রেখেছি খুলে মায়ের মত ; ঠোঁট
ঘুমাও স্থির জ্যোতিষী ফুলে। মাটি
গ্রহের তাপে পুড়ুক ; তুমি পুরুষ।

বৃহন্নলা। এ আচরণে কোথাও ক্ষমা নেই…
রক্তমুখী নীলার বক্ষমা
আনেনা মুখে রক্ত। আরোগ্যের
মুখোস পরা প্রেতেরা সব যোনী
শুধু দেখায় নারীর দেহ, নারী—
পতঙ্গ যাকে টেনেছে অনলে!

সৌরিন্ধ্রী। শুধুতো বুকে প্রথম মমতার
উৎস আমি। আমাকে তারা নখে
ছিঁড়েছে; তারা পাবের শীতে পিষে
গিয়েছে পদিয়াটির অসহায়
কমল। শুধু তোমারই আমি ধরী,
জুড়াবে তুমি, তুমি আমার পুরুষ।

বৃহন্নলা। অনলে অনলে মগ্ন; আমি পুরুষ!
হিংস্র পশু রাশিতে পর্জায়!
উরু দেখায় দুর্যোধন, কীচক
হালে তোমায় অনের বাস ছিঁড়ে।
আমি পুরুষ, আমি তোমার পুরুষ
কেমন বাটি উত্তরার ঘরে!

সৌরিন্ধ্রী। তুমি আমার পুরুষ। তমসার
সামনে কিছু যায় না দেখা…তুমি
দর্পমাশ দেখেছো। আর আমি
এখন বুক খুলেছি, ছুঁয়ে দেখ,
তোমার নীলমণি। আজ প্রণয়
বাইরে, তুমি আমার মুখে দেখ।

বৃহন্নলা। আমি চাইতে পারি না। আজ চোখ

খুললে আমি নরক দেখি। তুমি
নষ্ট শীত। ভীষণ সেই স্মৃতি
আমাকে মারে···যেন দারুণ পণ্ড
তোমার বুকে এখনো শুবে। আমি
ঘৃণায় অদি উত্তরার ঘরে।

সৌরিন্দ্রী। এসো, তোমার পোষাক দিই খুলে···
শারীর বেশে এখনি হব পুরুষ।
ক্লান্ত তুমি, আমাকে দাও বুকে—
আমি তোমার, তোমার নীলমণি।

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

অন্ধকারে বয়ে যাচ্ছে নদী

শীতরাত্রি। অন্ধকারে বয়ে যাচ্ছে ঠাণ্ডা কালো বৈতরণী নদী :
বৃষ্টি পড়ছে। খেয়া বন্ধ। গাছতলায় আমরা কটি বিপন্ন মানুষ
পরস্পরের মুখ দেখছি আগুনের আঁচে, কিংবা কিছুই দেখছি না,
মূক হয়ে দুশ্চিন্তায় ডুবে আছি। দুশ্চিন্তার শেষ্টকো অবধি।
ওপারে আগুন জ্বলছে অয়ণো কি ধান খেতে, ঘুম এসে ; ক্ষীণা
নদী যেন কালিন্দী কি কংসাবতী ! আর আমরা চিন্তার কানুন
ওড়াই নিজের মনে। বুঝিনাতো দুশ্চিন্তাই নদী হয় কিনা !

যুবক, বালক, বৃদ্ধ—সহযাত্রী তিনজনের তিনটি ভিন্ন মনে
হিম হাওয়া, মন কালো ছায়া—যেন পদ্মপাশে ঢেকেছে আকাশ।
দিশা নেই। ভেজস্কিন রশ্মিজালে আমরা বদ্ধ ? এ যুগের লোক।
প্রৌঢ়টি জীবন দিয়ে জীবনের গায়ে ঢেলে ঢেলে কী কারণে
বিফল, ভিনদেশ আজ ; রেখাঙ্কিত মুখে তার মনের আভাস।
যুবকটি আসিই, বুকে দুই কত পুষে রেখে বৃদ্ধে দিই তোক—
কাল্পনিক ছবি আঁকি শুনে তীব্র যৌবনের স্বপ্নের হিল্লোল।

তিনি তো অনেক দিন দেখেছেন, মন্দিরে মঙ্গলশঙ্খ বাজি
শুনেছেন, শুনে খুশি হয়েছেন, পায়তোজনের স্পৃহা নেই।
তথাপি কর্পূর গন্ধ, অথবা কস্তুরীআণ মনে লেগে আছে।
অমূল্য প্রস্তার ঘট, প্রেমের কদম নেই; তুমি সেখানেই!
আর আমি অকূলে একা। নামা চিন্তা। ক্লান্তি। তবু চিত্ত দূরগামী
অলকার কথা ভাবি, যন্ত্রণার ঘর দেখি: অর্থ সন্ধানেই
যদিও সময় শীর্ণ। প্রৌঢ়টি উদাস, স্থিতি ভ্রষ্ট হয় পাছে।

বৃত্তের অধ্যায় চিন্তা? অথবা শিবের কর্ম? কিন্তু অপরাহ্ণ
যদিও উদগ্র, তাবছি প্রজাবতী পৃথিবী কি দায়মিক্ততায়
রক্ষা পাবে! আমাদের প্রেম, নিষ্ঠা, সংহতি কি বাঁচবে তার প্রাণে!
ঈশ্বর, ঈশ্বর যদি থাকেন, পারবেন তুলে নিতে অপচ্ছায়া।
আমার মনের: আমি হালকা বুক হ'তে চাই। প্রৌঢ় আগুনটায়
কাঠ দিয়ে খোঁচালো। ঠাণ্ডা ঝনঝনে নদীর হাওয়া হু হু করে আসে।
প্রত্যেকে স্বগত ভাবছি: ঠাণ্ডা বুকটা কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চায়।

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

লোকটি

নির্জনে ঘরের কোণে খুতনিতে হাত রেখে, দাড়ি
উস্কখুস্ক মাথাভর্তি চুল নিয়ে বাপু বসে থাকে।
কী ভাবছে রাতদিন সেই আমে পাতে দুখ হাঁড়ি।

ঘৃণা নিন্দা কটূক্তিতে হলমুল কাঁপছে সারা বাড়ি।
একটু অন্তরে ঢুকে গেলে করবে আশ্চর্য তোমাকে,
তারপরে নৈরাত্মমগ্ন এক অন্ত-অতিকর্ষ তাকে

কিঞ্চিৎ মৈরাজ্যলোকে ঘিরে রেখেছে। সেই অন্ধকার।
তথাপি সংশয়মুক্ত দেখবে নিয়ালোক শুধু কাজে
ত্রুটিহীন আচরণে লেখনীর অদ্ভুত মেজাজে

দুশ্চিন্তার মিছিলও মনে আছে টেনে রাখবার।
চারপাশ থেকে ইট কড়িবর্গা অস্থির আওয়াজে
কাটছে, স্বপ্নেপহীন শুধু লোকটি তথাপ্রিত প্রাণ।

অরুণ ভট্টাচার্য

সকাল সন্ধ্যার কবিতা

আমার মনে একটি ঘর, আমার
চারিদিকের সংসারের ভীড়ে
যাবার সময় রইবে শুধু ঘৃণা,
ফিরে যাবোনা আবার কোলাহলে
যদি না আসে নিপুণ অপরাহ্ণে
দীঘিজলে, ধবল কাকজ্যোৎস্নায়
প্রহরী কেউ আসবে আমার ঘরে।

আমার ঘরে আসবে রৌদ্র, চুমি
করে তোমার মুখ দেখবো যখন
সেউজি পারে ঈষৎ শ্যামলিমা,
তখন স্নিগ্ধ আলোর আলিঙ্গনায়
দীপিমা তার পোষাকে। তবু ভয়,
চিনি না যারে সে কি আমার প্রেম
নয় তো ঈর্ষা : বলবো কাকে নিয়ে!

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

শীতের প্রথম প্রহরে

দূরের কাছে লয় হ'য়ে যাবার
মতো রোদ্দুর—স্নিগ্ধ, কোমল ষোড়শীর গ্রীবার মতো
হেলানো, আলিঙ্গনব্রতী—তোমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে
প্রায় নির্লজ্জ অট্টহাসীর মতো দিবাস্বপ্নের
আজ্ঞর আরামে শয্যাসঙ্গিনী হতে চাইবে—

শীতের প্রথম কয়েকটা দিন এইভাবে
কাটবে : সুতরাং তোমার আহ্বান, এক বর্ণ থেকে
আর এক বর্ণের সোজা পথে নিষ্ক্রান্ত ; দুঃখ
ক'রো না। সমস্ত আরামের অবসান
ঈশ্বর-কথিত নিয়মের মতই সাধারণ, আর
তুমিই আমার একান্ত আশ্রয়।

অরুণানন্দ মুখোপাধ্যায়

কয়েকটি কবিতা

প্রত্যাহ্নিক

কেন অন্ধকার থেকে উঠে এলে, স্মৃতি তুমি বিমূঢ় প্রহিক,
কয়লার ভেতরে কে হীরা খুঁজে দেখেছিল কবে···
গাঢ় পিপাসার ঘরে মাথাধরা রোদ কাঁপে প্রৌঢ় চরাচরে
শরীরে আগুন জ্বলে, আর কিছু পড়ে না চোখে—

তখনই দ্বারের স্পর্শে উঠে আসে অনির্বচনীয়
কমনীয় সেই চিন্তা আরাধ্যা যা ছিল সহচর,

আমি কিশোর প্রেমের কথাটুকু ভাবতে ভাবতে ব্যর্থতার মাঝে
যেন কী ফুলের মালা খুঁজে পেয়ে চারিদিকে চাই।...

শপথ

কাল বিকেলের আগে মৃত্যু এসে দাঁড়াবে না ঘরে...
ঐ প্রিয় তৈলচিত্রে মুখ হাসি অনিন্দ্য সতীর
পার্শ্ববর্তী সময়ের অপঘাত মুহূর্তে সরাবে,
এবং পর্দার হাওয়া আন্দোলিত পাখি গান গাবে সমস্বরে...
দরজার চৌকাঠে আমি ছুঁয়ে রাখি মনের বিশ্বাস
যুগান্তর মৃচ্ছাবে এতক্ষণ উজ্জ্বল আলোক—
কাল বিকেলের আগে মৃত্যু এসে দাঁড়াবে না ঘরে।...

পরিধি

প্রমাণ কিছুই আর দেওয়া যেতে পারে থাকো, এখন বিশ্বাস
নদীর চরের চিহ্নে, শোনা কথা কাছুরের গোনার কুঠারে,
তোরঙ্গে বিয়ের পত্তে, চিঠিপত্রে, যাযাবরী সংসার
অপরূপ স্পর্শে নিয়ে দাঁড়িয়েছে এখনো দিবিড়—

অনেকে হারিয়ে যাচ্ছে অতল সতীর ছায়াতলে...
বনস্পতি উঠে গেল স্পর্শ পেতে আকাশের চুলে,
উদাসী মাঠের বুকে বৈরাগী করুণ হাওয়া বয়...
অন্তরঙ্গতার যেন কত ক্লান্ত, নষ্ট, ভ্রষ্ট, রুক্ষ হাহাকার...
অলিখিত বিশ্বাসের ছায়াচ্ছন্ন বিস্তৃত পরিধি।

তবু কেউ কেউ...

অবশ্যই বোকা তাই এই আশা সঞ্চারিত করে—
মানুষ ফিরিয়ে দেয় সন্তানের প্রখ্যাত সত্তায়,
ফুলের বাগান এই জীবনের মুহূর্তের ঘরে
ছায়ার মতন ক'টি শব্দ মাত্র হেঁটে চলে যায়...

আশ্চর্য, কেবল যেন মাকড়সার জালের গভীরে
নিজেই বন্দীর রূপে বিরাজিত, কেউ কেউ তবু ধীরে ধীরে
প্রজাপতি হয়ে যায় উড়ে যায় শেষ বিকেলের রাঙা তীরে। ··

শোভন সোম

মালী

তোমার দুটি চোখের জন্যে
আমি দিনের পর দিন বয়ে
ফুল কোটাই।
ওদের ছিঁড়তে বুকে বড়ো লাগে
তবু নির্মম আমার আঙুল···

মালীর হাত একে কোটাবে বলে ওকে ছিঁড়ে
কেন একে ছিঁড়ে অত ফুল কোটাব।

মানস রায়চৌধুরী

ছিন্ন কবিতাবলী

সপ্তপদী

ভূকায় তবুও ওরা মেঘে আসে পাহাড়তলীতে।
শিরডির হাতে ছিল জলধারা, শিখরে কর্পূর
পাথরের মুখ বইছে। বন্দনার এই ব্যবহার
দেবতারা জেনেছিল বহু আগে, তাছাড়া এ স্রোত অবারিত
পৃথিবী পেরিয়ে যায় ব্রহ্মাণ্ডরে, ওরা কেন মানে সমতলে,

তবে কি বিলীন মেঘদূর্গ থেকে প্রেয়সী তোমার
ফেরানো মুখের অভিমান ওরা রেখেছে সহসা?

প্রতিবাদী

অরুতী আমার দুঃখ মহাশূন্যে তারকার ঢেকে রাখা মুখ।
কেউ আসবেনা এই পল্লবের বক্ষলায় হয়ে থাকা কেন,
'উড়ে যেতে চায় না সে' এমন সংলাপ শুনে বেলা যেন আজো
নীলিমার আমন্ত্রণ ফেরাতে হয়েছে আরো আরেক কাজের কথা বলে,
মাধুরী বিলীন দুঃখনাথে যদি অমৃত বাতাস বয় ধীর।

কেন ডানা দিয়েছিলে যদি না আমাকে দিলে সুব্যবহারের
লক্ষিত সামর্থ্য হতে জিজ্ঞাসা আমার অমারৃত
শিখরের কেন্দ্রমুখী তীব্র আলো, পৌঁছায় ক্রমতা ছায়াপথে
যেখানে প্রান্তর খোলা সভাগৃহে সম্রাট প্রাচীন সিংহাসনে।

অমাবস্য প্রবাহিত কতুর খেয়ালে যেন জলের প্রপাত
তাকায় না কারো দিকে, আমি কি এমনই রবো মূক ডানাভাঙা
হেমন্ত অতীত কোনো বাগানের শিউলিফুলের ডাল ঘেঁষে
কই হাত নেমে আসে মুঠোয় আগ্রহে যেন শীততাপনিয়ন্ত্রিত সিমাসের বন্ধ
দাবনা, তুমি কি জানো পাহাড়ের পাশে চাদু চা বাগানে চিনার পলাশ।

যাবার বেলায়

১

তবে কি একাকী যাবে দেশান্তরে, বিমানচালক অনায়াসে
যেমন বিছিন্ন করে এই মাটি, শিকড়ের অমৃত আতুল ?
অতিক্রান্ত আলিঙ্গন, ফুলিঙ্গের পরবর্তী বিপুল আঁধার কাকে ডাকে
কার রক্তহীন সিঁথি প্রহতারকার দিতে অনায় মশাল
জ্বলেনি। পুকুরে শুধু ডুবে যায় রক্তাভামিনীর
মূক ঘন্টা, অলিন্দে একদিন কণিক বিস্ফোভ।

২

অদূরে ঘণ্টার শব্দ। শহর বন্দর সব ছুটির নির্দেশে
গৃহমুখী কিশোরের ছুটির পায়ের খুশি, দোকানে রঙিন
কাদম্বের আয়োজিত উৎসব মিশাস, কিন্তু আমার কি তাতে ?
আমি যাই দূর থেকে দূর অগোচরে
যেখানে প্রাচীন বুকে যাজালে প্রহর যেন গাঙর গম্ভীর
অনাহূত শব্দপুঞ্জ, দূর থেকে বোঝা যায় মহুর যাতাস।

৩

আমি এই অরের ভিতরে আছি বলে
সব অশ্রুময়, সব স্বজনহারানো বিপর্যয়ে
অযুত শিশুর মত জলভরা চোখ,
ওই যে রক্তাক্ত স্বর্গ যাগানে পেয়েছে অভিশাপ
তাকেও ভীষণ দুঃখী মনে হয় আজ,
অথচ কোথাও নেই কষ্ট কিম্বা অগোচরে লুণ্ঠিত মরণ
আমি অনাদৃতা রাত্রে বাড়ি ফেরে চলে গেলে একা
অন্তত একটি দরজা খুলে রেখো যেখানে আমার
দুঃখবহ গতজন্ম লুটে উঠেছিল অন্ধ জননীর বুকে।

প্রিয়তম, বিচ্ছেদ কি আমারেও অজানা ?
যখন মাতুলে কাঁপে জ্যোৎস্নারাত, গঙ্গাতীরে একা
বিচ্ছিন্ন মুহূর্তে আর্ত বিদায় সংকেত
তখনও কি উত্তর কপালে রাখো গতজন্ম উদাসীন বিষাদ !

মৃত্যু

সাধারণভাবে দেখা যেতে পারতো তাতো আমি
একইভাবে দেখতে দেখতে বেলা চলে গেলো
ওই তো তার লাল ধোঁয়া স্বর্গের ইঞ্জিন ছেড়ে পশ্চিমগামিনী।

একইভাবে দৃষ্টি রেখে সেই বিন্দু, একটি অন্তত আজীবন
পাটভাঙা ছেঁড়াদুলে অথবা শীবির পাশে অনুচ্চার দাগে
হায় যায় বাড়িয়েছে, যেন লক্ষ অকৃতদারের গুপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসের
শব্দ হলো চোখ তুলে। একি সেই শেষ ঘন্টা বাজাবোর পর? জ্যোতির্বিদ
এই বিমলক্ষণ খুঁজি লিখে রেখেছিলো ঊর্ধ্বে, আমার জন্মের বহু আগে।

ভীষণ হাসির তোড়ে নিরতির বুক দুলে ওঠে—
আমার প্রেমের পাশে মেঘমন্দ্র উপহাস বাজে ঘনঘটা।
বেলা গেলে অন্ধকারে প্রবল অদৃশ্য তেজে দীপ্ত এরিয়াল
স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, লোহিত পতাকা কিংবা বিপ্লবের রক্ত স্নান করে
আজকে জানিবে গেল, দুচোখ দুকোটি চোখ,
তার চেয়ে বিশালতা সোনদীপ যক্ষত্রে কোথৈনি।

প্রকৃতি ভট্টাচার্য

মাঝে মাঝে এখানে এসো

নির্বাক বিস্ময়ে আজ আবার এখানে দাঁড়ালাম
সমুদ্র নীলিমা ঘুরে, বহুবিধ দৃশ্যকাব্য, রঙ
সারাদিকে ছড়িয়েছে, জলের সংসারে কত খেলা।
মিলনে মিরত অন্ত এক স্বাদ এখানে এসো না?
অনত্যন্ত ভয়ে কেন তোমার শরীর কাঁপছিল
আমি না জলের ভয়ে? অথচ সংসারে বীরগাথা
আমরা সবাই শুনি।

বড় জোর সমুদ্রের কথা;
কাব্যে কিংবা চিত্রে দেখ। অরণ্যে, সমুদ্রে কিংবা কোন
মাতামর খেলা দেখে জলে দিও জলে দিও মন
আমার তোমার আর তোমার বন্ধুর অহংকার।

'ঘরে-ফেরার দিন'

আমরা যখন পৌঁছলাম, অন্ধকার প্রায় সেব ঘরে ভোরের আলোয়
মিশে যাচ্ছে : শুকতারা তখন উজ্জ্বল, আভাস আকাশে প্রস্ফুটিত বেব।
এত ভোরে গাঙশালিখের ডাক, নদীতে জেলের জাল ছুঁড়ে দেওয়ার
শব্দ, পথগুলো সব ঘাসে ঢেকে গেছে—শবের মায়ার
আজ আর কারুর আসক্তি নেই
তবিও, তবু এই সব মায়া এখনো ছড়ানো চারিদিকে ;
সবই সহজ কত। তবু বেখ আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শীরা সেই
কেউ, যেনো ছিল না কখনো এমন। শুধু সন্ধ্যাবেলাকার
অন্তরঙ্গ অন্ধকারে
আমি আর আমার চোখের জলে সিক্ত দেশ, অন্তরে
অন্তরে অঙ্গীকৃত।

মিহিরকুমার গুপ্ত

জন্ম : ১৯৩৪

পাহাড়ী পাঁজর কিংবা পাঁজরের পাহাড়ের তীরে
কালো জলে সীমা টানা কোনো এক দীপের বেবালে,
ঘুণ ধরা ঘুলো আর
ঘুলো ধরা ঘুণে,
অনেক অনেক নীচে
দীপের মাটির মনে,
কিংবা কোনো
কোনো এক
পাথুরে চাকা বনের নিঃশ্বাসে

কঠিন সাদাটে আর চোখহীন গালবসা মুখে
ঠোঁটহীন মুখ যেন উঠেছিলো ন'ড়ে।

আমার জানালা খোলা ছিলো।
ঘুলোহীন শালির গা'র
হাড়ে-ভরা দিন আসে যায়।
অগাধ কুয়াসা নামে
সোনালী বাদামী চুলে
সোনালী বাদামী চোখে
এ যীশুর দেয়ালে পাথরে।
আমার জানালা দিয়ে কুয়াসা পারলি কোন পথে—
অনেক অনেক পাতলা কাঁচ
মেয়েদের সোনার মতন—
তবুও কুয়াসা কিনে গেছে।
অফুরন্ত অন্ধকার রাস্তার এ মোড়ে ও মোড়ে,
গ্যাসের হলদে আলো কুয়াসায় পারলি তো চিন,
পাথরের খুটপাতে দুটো উঁচু জুতোর আওয়াজ
ভেসে আসে আলগোছে,
তারপর থেমে যায়
থামে অকস্মাৎ।
ওপারের ফুটপাত থেকে
একজোড়া নীচু জুতো পীচঢালা কালোপথে পা বাড়াল' বুঝি,
এ পারে গলির মোড়ে
কুয়াসার বুকের নিঃশ্বাসে
পেলব সাদাটে দেহ যীশু চোখ মুখে
দুটো লাল ঠোঁট বুঝি উঠল.বা ন'ড়ে।

একদিন সূর্য উঠেছিলো।
জানালার কাচ দুটো তুলে

সামনে বাড়ীর মেয়ে
সদর দরজা দিয়ে সোজা এলো রাজপথে নেমে।
ক্লান্ত আমার মনে আলস্য ঘনিয়ে এলো ক্রমে।
পায়ের আওয়াজ তার ক্ষীণ হ'লো,
হয়ত' বা থেমে গেলো
থেমে গেলো মাদুরে—
কিংবা কোনো ভাইবিনের পাশে
সকাল বেলার কেনা খবরের পাতাগুলো
অনেক যত্নে ফেলে দিলো।
অলস আমার মন সকালের দিকে ফিরে যায়:
মাটির নীচের ট্রেন টিউবের বুক চিরে চলে—
জানালায় মুখ কাছে
দেওয়ালের অন্ধকারে
অসতর্কে ভুল ক'রে
আমার প্রবাসী মন চেয়েছিলো একফালি নীলাভ আকাশ।

অরুণকুমার সিকদার

একটি সনেট : আত্ম-সমালোচনা

আমার কবিতা নিয়ে ভুল-চেরা সমালোচনার
মিশ্চিত দেখাতে পারো সুন্দরের অমিন্দ্য বিভূতি
নিষাত বিকল্প কোনো যোগব্যায় নিমগ্ন কাব্যার
সমর্থ হয়নি দিতে উমা-প্রেম অভিমর্ত্য দ্যুতি।
সহস্রে বা মধুমার কোমোকালে যে-আলো ছিলো না
সে আলো বহন করা নয় তার ললাট লিখন;
মানস সুন্দরীসহ অপার্থিব কলতান শোনা
তরল অনলে ভেলে ঘুরলোকে সাগাহ-যাপন—

ভাগ্যের বাক্সর তার অধিকার করেনি ঘোষাই
এ সকল কোনো কিছুতেই। গভীরত্ব তার সীমা।
যে-টুকু প্রত্যক্ষ জলে তা ছাড়াও বিম্ব অগাধ
সে তাকে পাবে না জেনে চন্দ্রে হাত বাড়াব কি, তাই
সামান্য সাবধ্য দিবে সত্তে ভালোবাসার প্রতিমা।
প্রত্যেক বিনীত পংক্তি সবই তার অর্চনার ফুল।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

একটি সনেট

মিছরি চাইনে তবে। এই ভালো, অন্ধকার ঘরে
দু হাঁটুর মাঝখানে মনে থাকব একা মুখ গুঁজে।
কান্নার পাথর হয়ে তবে থাক বুকের উপরে
বিলীন নক্ষত্রপুঞ্জ। প্রভাতের সুনীল গম্বুজে
তীক্ষ্ণ-চঞ্চু রৌদ্র-পক্ষ আসে রোজ দুর্বার উল্লাস,
তার প্রান্ত হব আমি : উঁচু হবে হাতের পাহাড় :
পুষ্ট হবে রক্তনদী ; গর্হিত পাপের কোলাহল
ক্লান্ত হবে : মিলবে এই সন্তাপের অতল আধার।

আমাকে ডেকো না কেউ। বরং শোনার চেষ্টা করো
কোথায় সমস্ত দেহ ভেঙে পড়ে যাদের গভীরে,
ভেঙে পড়ে সিঁড়িগুলো। নিজেদের মগজের খড়ও
মধ্যে মধ্যে খাওয়া ভালো। দূর সব অন্যায় তিমিরে।

অনাহূত, অবাঞ্ছীয়—এ পরবাসে কে রুখে হায়!
ঘাটকের পক্ষঘাতে দিবজিত আমি নিরুপায়।

যতেশ্বরঞ্জন দত্ত

মানুষের মৃত্যুর আগে : বাঁচবার প্রার্থনা

(৫ই পৌষ ১৩৬৮ স্মরণে)

আমাকে একটা মই কলের আসন দিও।
খুঁতে আলেন, আঙুর না খাও, পেয়ারা কিংবা পলায় অন্তঃ,—
কারোর অমিষ্ট করব না।

আর যে কটা দিন আছি রে বাঁচতে,
যে কটা দিন আরো দুঃখ পেতে বেঁচে আছি,
পোড়া চোখে জল ফেলতে রয়েছি সংসারে,
একটু আসন দিও ঘরে অন্ধ কোনে।

কারোর অমিষ্টে আমি নই,
বরং তোমাদের দুঃখ সুখের কথায় কিছু
স্মৃতি রোমন্থন করতে পারি, শৈশবের অনেক গল্প তো
এখনো স্পষ্টই মনে, অমিলন সহজ এখনো।
না, সে সব মনের না কিছু, তোমাদের সঙ্গে তার মধ্যেই অমিল,
সংঘাত ঘটতে পারে, আজ কাল-পাত্র ব্যবধানে,
এ দরজা নিত্যদিন থাকবে তোদের কলতানে,
নদীর উচ্ছ্বাসে স্থির থাকবেই,
তোদের হাওয়ায় পাকা ধানের মেরুদণ্ডটা শিরশির করে উঠবে, যদি কি।
তাতে আমার দুঃখ কি ?
কারণ, আমি তো আর বিজয় কিছুই নই, কিছুই হব না।
তোমাদের সুখের সংসার, সপুত্র-কন্যার ঘরে দুঃখ হবে সব,
বরং প্রীতি, ভালবাসা। ভালবাসা হয়ে থাকবো আর যে কটা দিন…।

২

পদু আর ঢেকে রাখবো। চোখের জল ফেলবো না,
না দীর্ঘশ্বাস নয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলবো না,
পাছে তোমার সংসারে অমঙ্গল ওঠে,
দেয়ালগুলো জলে যাচ্ছে মনে করো,
পাখরগুলো কেঁপে উঠছে মনে করো,
পাছে তোমার মুখের গ্রাস গলায় আটকে আসে,
তোমার জন্ম মন্দ হবার উপক্রম হয়।
পাছে মনে করো।
তোমার তরিঘতের কচি হাতে আমার অমঙ্গলের ছোঁয়া
ছুকতে উঠবে।
দুঃখের বীজ মাটিতে পড়ার আগে।
চোখে জল আসবে না। বুকে দীর্ঘশ্বাসও নয়।
খুশী হবে। শুধু সুখী হবে তোমাদের হাসি দেখে, মুখে সাহস দেখলে।

আমাকে একটা নয় হলের আসন দিও,
আর যে কটা দিন আছি বে বাঁচতে,
থাকতে দিও সংসারের এক কোনে।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

অভিজাত বসন্ত

১

হঠাৎ অন্ধকার সরে যেতেই
মৃত্যু তাকে আলোর উৎসে পৌঁছে দিলো।
তখনো তোর হতে বাকি।
ফুয়াদার ধূসর চাদরটা দরজাতে দরজাতে
স্বর্গ আবার অবাক হয়েছিল :

মাসি বাড়িউলীর বারো ঘর এক উঠোন বাড়িটা
শীতের কাঁথা তুলে তখনও ভালো করে চোখ খুলতে পারেনি ;
দু'চোখ লাল রাগে ফুলতে ফুলতে
আলিপুরের দুরন্ত ট্রাম
শীতকে অভিশাপ দিতে দিতে তখনও যোবিনপুরে এসে পৌঁছয় নি।

২

অথচ তৎক্ষণে হাত জিরজিরে গাহাদের সুরবালা
দু' হাতে ডিমটে বালতি নিয়ে মল্লিক বৌয়ের
প্রাক্তন পাশাপিসির জবাব দিতে এসেছে কর্পোরেশনের কলে।
কল থেকে তখনও জল পড়বে কি পড়বে না
ভাবছিল।
ঈষদ্ভিন্ন আইবুড়ো সুরবালা কলে বালতি পাততে পাততে
ও পাশের গাছ থেকে ঝরে-পড়া কয়েকটি শীর্ণ পাতা দেখে
হঠাৎ-ই অবাক হয়।
কী-এক আশ্চর্য আদরে ইতি-উতি দু' চোখের তারায়
বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে :
বুকের সর্বশেষ নির্ভরতাটুকু যেন কিসের শিথিল তীব্রতা !
শিশিরে-ভেজা একটা শুকনো পাতা মুঠো করে ধরে
ছুটে পালিয়ে যাব সে। হঠাৎ, হঠাৎ-ই।
তারপর দরোজা বন্ধ করে বাকি মেয়েমানুষী কাজ সেরেছিল।

অথচ কেউ কিছু জানবার আগে তখনো সকাল হয়নি।

৩

সুরবালার আবার নতুন করে যখন ঘুম ভাঙলো
জানালা দিয়ে সূর্য ততক্ষণে দিব্যি হেসে খেলে বেড়াচ্ছে !

হাতের মুঠো থেকে
শুকনো পাতাটা গুঁড়ো করতে করতে

অতঃপর সুরবালা ব্যথিত, ব্যাকুল হয়ে উঠলো :
প্রত্যাশার প্রার্থনায় আবার সবুজ কিশলয় মেখা দেবে গাছে।
আশ্চর্য শীর্ণ বারোয়ারী গাছটা হয়তো আবার ফলবতী হয়ে উঠবে।

কুয়াশা হাতড়ি দিয়ে চৌকাঠ পেরোতে না পেরোতেই
সোনার আলপনায় ছবি ছবি আলোর মুখোমুখি দাঁড়াতেই
বিদিন্ন প্রভাতের ব্যর্থ অভিমানের হাহাকার
কুকঁড়ে থাকা অজগরের মতো নিজেকে হাল্কা করতে
এ-হাত থেকে ও-হাতে আখাসকে ধরে রাখে।

৪

এ কথা কী সুরবালার মনে হয়নি আগে। হয়তো হয়েছে।
(গাঙে দু' বছর আগে যে লোকটা কথার নির্ভর কথামালা
আখাসের আশ্চর্য সুতোয় গাঁথতে গাঁথতে
আজো ফিরে আসেনি। হয়তো বা আসতে পারে। হয়তো না।)
সূর্য আর একটু উত্তাপ দিতেই যারো ধর এক উঠোনের
হাত জিরজিরে বুড়ো গাছটার কচি কচি পাতাগুলি
মাথা নাড়িয়ে হাততালি দিতে থাকে। সাত সকালে
দু' একটা কাক এসেও হাজির।

৫

ঘরে পিঠে রোদ মাখতে মাখতে তার সে বুকে যেন
পলাশের খুশি ক'রে পড়লো। দু' একটা শালিখ কি চড়ুই
চোখ ভ্যাবভ্যাব করে উঠোনের এ-পাশ থেকে
ও-পাশ ঘুরঘুর করতে থাকে।...

দক্ষিণের ঘরের পাজির-পা-ঝাড়া হরিহর বাইতি
ব্যাগম ব্যাগ হাতে চৌকাঠের কালীর কটকে পেন্নাম করতে করতে
এ রোদকে তাকাতে আজও ভুল করে না।

উঠোনের উপেক্ষিত গাছটির দিকে দু'চোখ তুলে
কাউকে কিছু একটা শোনাতে গিয়ে ইশারায় নাকি বলেছিল,
বসন্ত এসেছে।
দীর্ঘ দু'হাতের ফেটোয় অতঃপর মুখ লুকিয়ে ছিল দুরন্তপনা।
পাখিরাও নাকি কানাকানি করেছিল
ও-পাশের উঠোনের দিকটায়
গাছটায় ঘুরে, ডালটায় দুঁয়ে : নাকি বসন্ত এসেছে।

আশিস সান্যাল

জন্মের প্রার্থনা

সবাই বিদর্গে যাবে। আমি শুধু অক্ষর চিহ্নিরে
ভেসে যাবো অন্তপথে নিষ্ঠুর বেলায়।
রক্তের বেহালা ছুঁয়ে নিঃশ্বাসের মত কোলাহলে
মিশে যাবো শব্দহীন। হায়, আনন্দ তোমার
তরঙ্গের মতো একা স্পর্শ করে সহজ সোপান
সাজানো তোমের শান্তি জন্মান্তের অঙ্কিত কলসে।

আমাকে ডেকোনা তবে, হে বন্ধু বিদায়।
জলের সুতীব্র বেগে ক্রমাগত বিশুদ্ধ সমীরে
ভেসে যাবো দিগন্তহীন। বিগত বেলায়
আদিম ঐশ্বর্যে বলো কে তুমর জাগাবে আবার ?
স্বাভাবিক ঝরে যাবো। দিগন্তে আমার
পদরেখা চিহ্ন করো হে জীবন আগত শৈশবে।

শিশুর মতন একা জন্মে প্রতিজন্মে
ব্যস্তহস্ত পৃথিবীর ধূসর ধুলোয়
বেঁচে আছি প্রতিদিন। অন্ধকার

কঠিন আঘাতে হাসে। তবু অন্ধকারে
আলোর রহস্যে ভাসে মানুষের মৃত্যুহীন জন্মের ভেতরে।

নিদর্গে যাবো না তবে। একা এই অক্ষুণ্ণ তিমিরে
ভেসে যাবো অন্তপথে সিন্ধুর ভেলায়।
রক্তের বেদনা ছুঁয়ে দিনান্তের মন্ত্র কোলাহলে
মিশে যাবো শব্দহীন। হায়, আমার তোমার
ওমরখৈয়ের মতো একা স্পর্শ করে সহজ সোমার
সাজানো ভোরের পাখি, জন্মান্তের অঙ্কিত কপালে।

শিবশম্ভু পাল

প্রার্থিত অপ্রার্থিত

কি হবে, সমর, তব করুণার উদার প্রান্তরে
আমারে দাঁড়ায়ে রেখে কি হবে সম্মুখে কোথা ছুঁয়ে সুবাতাস
মাতায়ে তটিনী, এই বালুবেলা, চিত্রিত বাগান ;
সকলি মিলায় শুধু পশ্চাতের পানে। আমি চাহি না বিশ্রাম।
শুধু শূন্য বিপ্রহর : রৌদ্র দিবানিদ্রার আবেশে
বিস্তৃত ছুটির বেলা দীন লাগে, স্পন্দহীন যেন
অপমানে হীনপ্রভ এইসব দিনগুলি, বিমর্ষ প্রহর।
আর কেহ নয় শত্রু, তুমিই সে আত্মদ্রুহ, দাতা ও গ্রহীতা!

অথচ প্রার্থিত ছিল মুক্তি কোন দেশান্তরে, অভিরাম কোন
প্রশান্ত দুখের দ্বারে সমাজের বিষলোকে বাঁচার নিঃশ্বাস
বাতাসে ছড়িয়ে দেব, আর তুমি মাঝেমাঝে তব
ব্যক্তিগত দুখের দয়া দান করে পুরাও সে বাসনা প্রবল।

একী তীব্র অপমান! শূন্য হৃদে ভূলুণ্ঠিত প্রেম

বালিখণ্ডা বেরাদের মধ্যে দেখি বিরক্ত পরিজন।
এরই 'পরে ফেলে যাব রৌদ্রছায়া, সকলই তোমার।
অন্তত পৃথিবীও লবে গেল বলে যেন। একী ধৃষ্টতা!

অথচ মুমূর্ষা ঘোরে অহরহ হাসিছে আঘাত
অথচ প্রতিটি ক্ষণে তোমার বিপুল অস্ত্র মৃত্যুহীন ধারে
আমারে বিচূর্ণ করে; শ্রেষ্ঠতম শয়তান, দাতার মুখোস
মাঝে মাঝে ধর করো, যুগপৎ দাতা ও গ্রহীতা!

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

সনেট

কারা বলে আছো ঘাটে মৃত্তিকলসের মতো একা?
তোমরা সুরের যাত্রী, কতকাল প্রতীক্ষায় রবে?
সূর্যাস্ত বনান্তে ডুবে যাবে সব পথরেখা,
অবশেষ প্রেতদল মত্ত হবে কুটিল উৎসবে।
কারা বসে আছো তবু বিশ্বাসের মোহন শিখরে
তপ্ত তরণীর স্মৃতি বুকে লয়ে···অনন্ত তৃষ্ণায়।
শীত সমাসন্ন, কাঁপে বৃক্ষকুল মুহুর্মুহু ত্রাসে
আসন্ন অস্তিমে কেন অন্তহীন এই আলোবাসা?

তোমরা সুরের যাত্রী, ঐশ্বরিক আমার আলোকে
পার হয়ে যাবে চড়ে বিচূর্ণ তরণী সুরদেশে।
আমি প্রেত, অনুচর শয়তানের, আমি প্রেতলোকে
তরণী আমার তার অক্ষমতা আমার উদ্দেশে।
কারা বসে আছো ঘাটে মোহমুক্ত পরিচয়হীন?
মোহতারে মত জাগো, আত্মঘাতী ঈশ্বর প্রবীণ।

দিব্যেন্দু পালিত

ভোরের প্রার্থনা

না এই রাত্রির কথা ভুলবো না কখনো ;
তুমি জেনো।
এই রাত্রিটিকে আমি রেখেছি আমার ভুল দন্তার আঁধারে—
যেমন শস্যের ভ্রাণ থেকে যায় সৎকারেরও পরে
বাতাসে : আগুন : তার বীজ শাঁস ম'রে গেলে তবুও উত্তাপ।
এবং মজ্জার ক্ষেদ ম'রে যায় প্রতি মুহূর্তেই :
যতো তাকে ঢেকে রাখি, উৎসারিত আমার দক্ষিণে
কে আসে ছায়ার মতো, ফুটফুটে কণ্ঠের জোরে উচ্চ কেঁদে ওঠে।
তাই ভুলে যাবো ; কিন্তু, রক্তের কলুষ বড়ো অবিশ্বাসী হয়।
গোপন নখর মেলে দর্পণ দেখার রোজ পুরাবো রহস্য—
দুঃস্বপনে জেগে উঠি। সহিষ্ণু ক্ষমার দোষে ভুলগুলি ফোটে।

ভুলবো না, শপথ। তবু দিতে যদি একটি ভোরবেলা!

অসিত দত্ত

বন্দীশালার কবিতা

চতুর্দিকে কাঁচ ঘেরা স্বচ্ছ আলো ভরা দেওয়াল।
মনে হয় বন্দী আছি এই মৌন ঘরে দীর্ঘদিন,
বন্দী থেকে বন্দী থেকে বন্দী থেকে থেকে থেকে, কল্পলোক যদিও বুঝিনা
ভুলে গেছি সব কথা বহুদিন যাদ ভরা সাল।

পূর্বের দেওয়ালে সূর্য স্মিতমুখ বাড়ায় কৌতুকে।

নিরুদ্যম যেহেতু তাই এইখানে প্রবেশ নিষেধ
সরাসরি কোন আলো, যন্ত্রণা বিষাদ দুঃখ বেদ
এখানের অধিবাসী। সুতরাং আলো কাঁচে পরিক্রত পরিক্রত হয়ে
উত্তাপবিহীন, শুধু রৌদ্র লয়ে নির্ভুল সবুজে
ঘাসদল সেই অবয়ব, রৌদ্রের শরীর যার, চুলে বুকে মুখে
উজ্জ্বল আলোর স্বাদ। এই ত সময়, বলল, চল যাই এখন দুজনা
সবুজ রোদ্দুর ঘাসে, নারিকেল গাছ বেয়া, দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাস
রৌদ্রে যাবে বলেছিলে, মেলে তার দুই চোখে আলোর আশ্বাস।
রেশিনা, কোথায় রৌদ্র, এই শীতে কখন যাব না।

পশ্চিম দেওয়ালে ক্রমে হলুদ পাখির মতো ম্লান
আলো মেলে এলো নারী, চুল যার ধানগুচ্ছ সোনা
ঠোঁটে গালে হেমন্তের রঙ, বলল, এখন চল না
এই ত সময় চল, যাই, মৃদু হাওয়া অগ্রাণ ফসলের মাঠে, জান ?
তুমি যাবে বলেছিলে।
লোলো, মাঠ কতদূর, রাত্রি হবে এখন যাব না।

দক্ষিণে মৌসুমী হাওয়া (যুকলাম আন্দোলিত গাছপালা ডালে)
বৃষ্টি এল এক্ষুণি আমার কাঁচের থেকে দূর,
বৃত্তের দেওয়াল থেকে দূর মুছে দিয়ে অনুভব
মেলে রইল নির্নিমেষ দুই চোখে দক্ষিণ দেওয়ালে,
প্রথম সন্ধ্যার তারা, অপূর্ব আকাশ, বলল, এই ত সময়
নদীর নির্জনে যাবে বলেছিলে বৃষ্টির বেলায়।
একাই যা দুই লোটি, অকস্মাৎ বৃষ্টি যদি নেমে যায়, এই ভয় হয়।

বরফের রাত্রি এল ধীরে ধীরে উত্তর বাতাসে।
কাঁচে ছাওয়া বরফের মতো সাদা শীর্ণ হাত মেলে, শুভ্র শুচি
নারী, ঠোঁটে ঘাড়ে বুকে জলের ফেনার মতো হালকা সাদা কুচি
বলল, হিমরাত ঘরে নিরন্ন সাহোড়ে ওই, চল, আমাদের বুক করে

এই দিন চলে যাবে নদী, কাল ভোরে উঠে দেখব আশেপাশে
কুয়াশা কেমন করে নরম নরম পায় হেঁটে যায় জলের ওপরে।
দিনান্তে বলেছিলে যাবে এইক্ষণে দিই পাড়ি,
হাত ধর, এই পথ আমার একান্ত চেনা-জানা।
মানি কথা কর, ভোরে যদি কেউ সূর্য ওঠে, এই রাত্রে কোথাও যাবনা।
কল্পলোকে থাকা সব, বরফ রোদ্দুর বৃষ্টি মাঠ, সারিদারি
নারিকেল গাছ, ঘাস, পাহাড়, কদল হলুদ পাখির আলো,
নির্জন কুয়াশা নদী।

পরাজিতা রমণীরা কোথায় হারাল!

চতুর্দিকে কাঁচ ঘেরা স্বচ্ছ আলো তরল দেওয়াল।
মনে হয় বন্দী আছি এই মৌন ঘরে দীর্ঘদিন,
বন্দী থেকে বন্দী থেকে বন্দী থেকে থেকে থেকে, কল্পলোক যদিও রঙিন,
ভুলে গেছি শব্দ ধ্বনি বহুদিন যাদ তবু সাদ।

পরিমল চক্রবর্তী

শিমুলতলায়

মুগ্ধতায় ছবি দেখ এই মুগ্ধ শিমুলতলার।
কী-বিচিত্র প্রসন্নতা, কী-গভীর স্থির নির্জনতা
এখানে বেঁধেছে ঘর সেই কোন্ যুগান্তের থেকে!
ঘুরের পাহাড়, বেণু, প্রান্তরের অমেয় বিস্তার
হাতছানি দিয়ে ডাকে; অরণ্যের দীপ্ত আরনায়
আদিম ইশারা দোলে। হৃদয়ের একতম কথা
বিদ্যুতের মতো জ্বলে ওঠে; ঘুরে-ঘুরে যেঁকে
উটুমীহু পথগুলো মিশে যায় আঁধারে অপার।

শুকনো কর্ণার জলে দাঁওতাল যুবতীর দল

স্নান করে, করে খেলা ; অমার্জিত সোনালি শরীর
হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা জাগে যৌবনের। স্টেশনের পাশে
সাইডিংয়ে অংহরা রেলের ইঞ্জিন। কী-বিস্তর
বিষণ্ণতা ছেয়ে থাকে চতুর্দিক !

জোনাকির ভীড়
জমে যেতে, অন্ধকারে সব কিছু আবছা হয়ে আসে ॥

দেবপ্রসাদ ঘোষ

দুঃসময়

অপহৃত, রিক্তমুখ, প্রস্রাব পায়ে না নড়লে
তবুও মাতাল আমি দুরদুরে আকণ্ঠ গরলে।
তোর সেই বহুশ্রুতি কামে কামে গূঢ় মনোছাদে
বঞ্চিত করিল তুই পিতৃত্বের গূঢ় অধিকারে।
(যে তীব্র নেশায় বুঝি ঈশ্বরও অন্ধ হয়ে জলে)
তোর সে গুণাত্র থেকে,—শিয়রাদ্ধ বধূদের ওম
কাঙ্ক্ষিত হলোনা কেন—(যে রহস্যে ঈশ্বর বিভ্রম
দুঃসময় বল্ তুই, তুই ছাড়া এমন কে পারে !)

যে ঘরে আহুত আমি ওতে তোর-ই ব্যঙ্গার বৈভব।
একবার বল্ দেখি দুঃসময় কিসের সৌরভ
এমন মাতাল করে ; —ঈশ্বরও যেখানে প্রতিযোগী
এমন মজেছি যেথে হতে চায় উপরম্ভভোগী।
বিনা পানে ও গরল বল্ আর কি সেবা সম্ভব
দুচোখে বৈশাখ, আর মনে মনে এমন আষাঢ়।

সঞ্জয় মজুমদার

অমিত নির্দেশ

সব খেলা ভেঙে দিয়ে—তাস, দাবা, তবু গুলতানি
একটা গম্ভীর ঘণ্টা কাল পেতে শুনতে পায় নগর।
দাবার বিপুল কিস্তি যে দিয়েছে একটু আগেও
সভয়ে তাকিয়ে তার চোখে পড়ে রাজার ভলানি।

কমুটাটি-স্ট্রীটের গলি যে-পেক্ষলো রাজপথ দিয়েছে
এবং মেজাজী উকি যে ওয়ালো হিস্তির হোঁয়াচে
তারা সব একলা হবে অন্ধকারে ফিরিয়েছে মুখ,
'কোন পথে যাত্রী যাব, কোন্ দিকে ?' পায়না কেউ ভেবে।

কেমনা গহন শব্দ সব শক্তি করেছে নিঃশেষ।
অকস্মাৎ চোখগুলি পরিচিত পথের ঠিকানা
ভুল করে, দেখতে পায় আজন্মের পথ, মুক্ত নদী,
অন্ধকারে টেনে আনে কোথা থেকে অমিত নির্দেশ।

প্রত্যেকের মনে পড়ে—শৈশবের উত্তোলিত বাহু,
কৈশোরের কোন্ ঘাটে কে হারালো আঙুটি কতগুলো ?
কাউকে শিকার করে পাহাড়ের মন্ত্র শিখা, যম ;
নিয়ত টানের কাকে শরীরের রক্তে লোভা রাহু !

এমনই ঘণ্টা বাজে মাঝে মাঝে স্তব্ধ আঁধারে।
মুহূর্তের দৃশ্যলীলা ভুলে ওঠে পুরনো বাতাসে,
হাতের আঙুলগুলি খুলে দেয় নির্জন কপাট,
অধির চোখের তারা কড়া নাড়ে স্তিমিত দুয়ারে।

কমল বিশ্বাস

হে সখি প্রিয়বেশে

হে সখি প্রিয়বেশে, ধূসরাকারে আলোয় এ-মৃত্যু—
ঘুরে ঘুরে আসে কের দু'চোখের বিষণ্ণ আকাশে
(যদিও একথা জানি) মূল্যহীন এ সব সান্ত্বনা—
মনের দর্পণে আঁকি যে কথার রঙীন বিলাসে

কণ্ঠনল অশ্রুর চিকণ স্যাতায়
নিশ্চিহ্ন ভূমিকায় সব বিয়োগান্ত রেখা
অন্ধকার নামী করে ; সূর্য তার সমূহ উত্তাপে
সামান্য বিশ্বাস স্মৃতি একযোগে বলে :
প্রতিবাদী আলো-স্বপ্ন অযাচিত এ তন্ত্র সান্ত্বনা
চিরাবর্ত হয়ে রবে শর্বরীর অতল যন্ত্রণা ।

বিনোদ বেরা

আমি হ'ব চন্দার মত

যন্ত্রণার মাতৃধামে তুমি
ফুটে আছ শ্বেতপদ্ম হয়ে,
বেদনার সজল যৌবনী
তোমাকে ঘিরিয়ে আছ বয়ে,
তুমি আছো, আমার আকাশ
তাইত এমন গাঢ় নীল,
দুখের আভাস প্রতিভাষ
নানা রং এ করে ঝিলমিল ।

আমি হই তুমি, তুমি আমি
বলো সে কেমন করে হয় ?
এই কথা ভেবেই সংগ্রামী
দিনগুলো হয়েছে বিষময় ।
আমি হবো চম্পার মত
পায়ল মেয়ের অনুগত ।

হারাৎ মামুদ

প্রার্থনা

রাতিগুলো সব মিশিয়ে দাও । আহা,
একমুঠ অন্ধকারে একটু হাত রাখি ।

জ্যোৎস্নার মাঠে প্রেতযোনিরা
ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে—
রাতিগুলো একে একে ভেঙে ফেল ।
না হলে মিশিয়ে দাও ।

মনে আসে না,
চোখে ভাসে না, অনেক কিছু
আমি ভুলে ফেলি, আমি মেখে ফেলি ।
অন্ধকারে ভয় করে না, আমার আলোকেই যত ভয় ।

রাতিগুলো তবে ভেঙে ফেল, মিশিয়ে দাও ।
তাহলে, অন্ধকার আকাশে একটু দাঁড়িয়ে
বুকভরে যাওয়া, আঘ্রাণ, কিছু স্বপ্ন ;
একমুঠ অন্ধকারে, অন্তত একবার,
আমি মৃত্তিকার শিশু হই,
আর অমৃতের পুত্র ।

বাংলাকে খুঁজে পাবো

এই তো বাংলা দেশ : বিস্তৃত ভূগোলে
যদিও অনেক নদী, সবুজ-হরিৎ
এবং আরো অনন্ত বহু কিছু মিলে
মৃন্ময় বর্ণ গন্ধ এবং সংগীত ;
তবু যে কী ব্যর্থতায় ধায় বার কাঁপি।

শুধু যদি, তীক্ষ্ণ কোন স্পর্শের আঘাতে
হাসল সমুদ্র এক ধরোধরো কাঁপে,
একটি আদর শুধু ইমন-রূপদে
আলো হেস, ছাওয়া আসে ; হবতো কে জানে,
বাংলাকে খুঁজে পাবো বুকের কটিরে।

সুবন্ধু ভট্টাচার্য

কোনো রমণীর উদ্দেশে

ক্ষয়ে যাচ্ছি, ক্ষয়ে যাবো, পতনের অতলান্ত স্রোতে
ভেসে যাবো আসবাব খড়কুটোর মতই এবং
নিশ্চিত অকাল-মৃত্যু (জ্যোতিষীরা বৃথা আশা দেয় !)
কালচক্রে গুড়ো হবে ক্ষণস্থায়ী জীবন-যৌবন।

তখন যাবোনা আমি, হে রমণী, তোমার নিকটে
বন্ধদ্বারে প্রেমিকের করাঘাত হবেনা ধ্বনিত।
পুনিশিল যষ্টি থেকে ঝরে যাবে প্রেম মোহ কাম,
চৈত্ররিণী স্মৃতির তারে আর ক্লান্ত হবে না হৃদয়।

আমি আজ অতি অল্প, কক্ষচ্যুত তারকার মত
খসে পড়বো অজান্তেই ; বিস্মৃতির সহজ শিকার ।
শ্মশানযাত্রীর মত তাকাবোনা কখনও পিছনে
পশ্চাতে জ্বলছে আমি আমারই এ-যৌবনের চিতা ।

মৃত্যু হলে, হে রমণী, অশ্রুজলে বিভ্রান্ত করোনা
পার তো আমার নামে কিছু চাটুকা কুৎসা রটিও ।

রণবীর মহাপাত্র

জলের ধারে

তেমা ঘাট ডুবে গেছে কালো জলে, তেমা মাঠ
হারিয়েছে অমোঘ আঁধারে ; কী আশ্বাসে থাকে তবে
প্রাচীন জলের ধারে ?
এই ব'লে, শশিমীর মতো তেমা
জটিল আঁধারে দোলে প্রবীণ বটের জটা, ঘুমন্ত দু'হাত সেইখানে
আকাশিতে নক্ষত্রের আলোতে বাড়িয়ে, হে ভ্রমর, ফিরাতে চেয়েছো ।

তবু ভাখো, আবার এসেছি বলে তেমা এই জলের কিনারে
মাঘের বাতাসে, পা ছড়িয়ে শীতার্ত কঠিন পাথরে ;
দীপ জ্বালি রমণীতে এ আঁধারে ; চোখ রাখি স্থির জলে,—
কে জানে ও জলে রক্ত জলে থাকি,—মৃত পাখ উঠে আসে যদি,
দেখে যদি যেতে পারি নিজেরই বিগত মুখ তারা-ফুল জলে :
জলের অঞ্জলি তুলি, যদি মেলে দীর্ঘ বুকে হারানো পাঁজর ।

হু হু হাওয়া থেকে থেকে লুটায় আবার অস্থিতে, জলে—
ঘুম ভেঙে জেগে উঠে, অশরীরী হঠাৎ শরীর পেয়ে শরীর হারাবে যেন—
বাতাস কি আজও বহে গন্ধ কোন অবিস্মরণীয় চিতার ধোঁয়ায় ?

যবতার আলো যত হৃদয়-বিকৃতে-অদা, সব দিতে যাব নাকি
শ্যাম-অন্ধার দিতে মেলে ? শুধু পুরাতন জল ঢেকে দিতে
পারে নাকি হর্ষর স্মৃতিকে ? আর চোখ রেখে কালো জলে,
দেখি আমি বসে আছি, সুবাস্তাসে, দীপ্র এক আশ্চর্য্য সকালে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বার্মিংহামের বুড়ো

"ফুলেও সুগন্ধ নেই। অন্তত আমার
যৌবনবয়সে ছিল যতখানি, আজ তার অর্ধেক পাই না।
এখন আকাশ পাংশু, গায়ের ওড়ার বাস
অর্ধেক সবুজ, নদী নীল নয়। তা ছাড়া দেখুন
ট্রেন্ড্রি ডিম্বাল, মাংস রবারের মত শক্ত। ভীষণ সেয়ানা
গরুগুলি। দানতি ভরে দুধ
দেয় বটে, কিন্তু দুধ ঘোলো দুধ। নির্বোধ শস্তও
দুধের ঘনতা আজ চুরি করে কী অহমীলাভ।
এদিকে মদও প্রায় জলবৎ। আগে
দু-তিনটে বিয়ার টেনে অক্লেশে মাতাল হওয়া যেত।
ইদানীং কম করেও পাঁচ বোতল লাগে।"

বার্মিংহামের সেই বুড়োটার লাগে। যে দেদিন
ফুল নদী ঘাস মেঘ আকাশ ট্রেন্ড্রি
মাংস দুধ ইত্যাদির বিরুদ্ধে ভীষণ
অভিযোগ তুলেছিল। যার
বিকৃত মুখের ভাঁজে তিলমাত্র করুণা ছিল না,
উদরে সক্রিয় ছিল পাঁচ বোতল ঘোলাটে বিয়ার।

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

নদীর দেশ থেকে

তুমি আর আমি এসেছি নদীর দেশ থেকে। তাই ভুলতে পারলাম না, কেউ কাউকে না, আমাদের সব ছেলেবেলার কেনা। পুবে যেখানে সূর্য উঠত, মহাদেবের জটা থেকে নদী নেমে এসেছিল সেখানে আমাদের বুকের নীচে রেখেছে আমি জলের শব্দ।

ওখানে পশ্চিম কূলে একদিন মস্ত আগুন হল, তিলে মৌকোর গন্ধ পড়ন্ত আলোর মাখামাখি, সূর্য ডুবছে, আকাশে নববধূর মুখের সিঁদুর। তারপর আঁধার ঘনিয়ে এল। আমরা চলে এলাম আর ফিরবনা বলে। সেই চেনা অশত্থটা বর্ষা ভেজা বেয়ার মত বাতাসে নিঃশ্বাসিত হ'ল কেবল। এখনও আমাদের সেই নদীর কূলের স্বপ্নমুহূর্তগুলি, দুচোখ মেলে আছি যেখানে আমাদের মা খুঁজতে পেছেন সেই সন্ধ্যাবেলায়, যেন এখনি তাঁর হাতের প্রদীপ আলোকিত হবে।

অরুণকুমার সরকার

পরিস্থিতি

যেমনি তো কাটা হয়ে উপড়ে গেল পেটকাটি ঘুড়িটা
মরলো কার্নিক হটকে মরুপথিও,
পৌত্ত মেরে নিজেরই মাথা ফেটে বেল একবগ্গা দুধলোড়া
ভয়ে ভয়ে গুটিয়ে নিল শতরঞ্জি নিজেকে হঠাৎ।
যেতনি সবুজ শাদা একে একে অন্তর্হিত হলে
মোরো আকাশটায় একমেবাদ্বিতীয় হলুদ
লেজঝোলা লালমুখো এক অহংকারে উড়ু দেখিয়ে
নাচতে থাকল।

সেদিন অনেকে খুব যাত্রা দিচ্ছে,
ঝমঝমে আবহাওয়া।
আমরা আকাশতরা বহুবর্ণ প্রাণ ভালোবাসি।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

তোমার চোখের দিকে চেয়ে

মন যেন অসহায় শ্রাবণের মেঘ
ঠাণ্ডা বাতাস দিলেই
তার সমস্ত পুঞ্জীভূত আবদ্ধ বেদনা
হাসি আর কান্না
ঝরিয়ে দিতে বাধ্য হয়।
তারপর হালকা শরীরে ভাসে
সূর্য তার উপর রঙ ফলায়
বাতাস তাকে বেলুনের মতো ফুলোয় ফাঁপায়
—সে তখন অন্যের হাতে খেলার জিনিস।

কিন্তু এ খেলা সে ভালোবাসে না
ঝিনু-ঝিনু করে সঞ্চিত হয় তার প্রাণ-স্পন্দন
ধীরে ধীরে সে গম্ভীর হয়ে ওঠে
হয়ে ওঠে ঝমঝমে
হঠাৎ তার শরীর হয় বিদ্যুৎময়
তখন তার ভ্রূকুটিতে পৃথিবী আকাশ কাঁপে
তার ফুলে তখন মধু
কটাক্ষে সর্বনাশা বিদ্যুৎ।

এই সব কথা
ভাবনায় চকিত তোমার চোখের দিকে চেয়ে
আমি, আকর্ষ মেঘে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

বর্ষার আকাশ হতে

বর্ষার আকাশ হতে জল ঝরে স্মৃতি ঝরে মন হতে তাই
অতীত দিনের সুরভির
মদির গভীর
গন্ধ যেন পাই।
জল ঝরে আর স্মৃতি ঝরে
শৈশব কৈশোর নমে পড়ে
মনে পড়ে রূপকথাগুলো একে একে
ঘুমোব যে রাজকন্যা কে কে
আসে ছবি চোখের উপর
যৌবনে তাদের সঙ্গে বেঁধেছি যে ঘর
মনে পড়ে সে ফুলন্ত দিন
বৃষ্টি ঝরে স্মৃতি ঝরে বিরামবিহীন।

২৩শে শ্রাবণ ১৩৬৮

অমিয় চক্রবর্তীর সাম্প্রতিক কবিতা

অরুণ ভট্টাচার্য

এক

কবি ইয়েটস্ The Tower কবিতাগুচ্ছের উপক্রমণিকাতেই ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন

And therefore I have sailed the seas and come
To the holy city of Byzantium.

অমিয় চক্রবর্তীর কাছে পবিত্র শহর তার নিজস্ব ঘর, সেখানে ফিরবার অবশ্য বাসনা বুকে নিয়ে তিনি বিমযান অপেক্ষা করে আছেন

পৌঁছতে হবেই বাড়ি
কেনাবেচা শেষ ক'রে
গানি কণ্ঠে ভ'রে
ঘরে ফেরা দিনক্ষণে
দিয়ো পাড়ি।
দীপ জ্বলে ঘরের আঙনে। (কংসো নদীর ধারে)

প্রকৃতপক্ষে 'ঘুরঘাবী' বা 'অভিজ্ঞান বসন্ত'র কবি 'পারাপার' থেকে এক নিজস্ব ঘুরে এক কক্ষাবর্তে পরিভ্রমণ করছেন। সে কক্ষাবর্ত তাঁর নিজের ঘর। এই ঘর যে বাংলাদেশেই তা নয়, এই ঘর ওহায়োর ম্যারামী সুন্দরী নদীতে অথবা বষ্টন বা কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আলোর অযুত অবসরে', ক্যাফেটারিয়ার গন্ধে, কাঁচা চামড়ের ব্যস্ত টুং টাং শব্দে ককির গন্ধে সিগারেটে, অযুত ছুটো তিনটে পাতা ঘরে পড়ছে সেই সকল দিনযামে, চকল হুর্তে, ট্রেনে, এমনকি রাস্তার দ্রুত অবসরে। বস্তুত, আমি বেঁচে আছি—সারাক্ষণ আমার অস্তিত্ব দিয়ে এ বিশ্বসংসারের সকল ক্ষেত্রে আমার অনাবাস পদচারণা —এমন একটি বিশ্বাসে অমিয় চক্রবর্তীর কাব্য হয়ত বা অস্তিত্ববাদের প্রায় সমধর্মী বলা চলে। অবশ্য এই অস্তিত্ববাদের পেছনে পশ্চিমী দর্শন ততটা কাজ করেনি যতটা করেছে ভারতীয় ঐতিহ্য, রবীন্দ্রনাথের

পথ অনুসরণ করে যে জীবনদর্শে প্রগাঢ় আস্থা তিনি লাভ করেছেন এ তারই প্রতিফলন মাত্র। আবার যখন তিনি মানুষের কথা বলেন সে হয়ত বা বাংলা দেশের 'ক্লান্ত অক্ষিন-কেরানী দরেন' এর কথা—কিন্তু শুধু দরেনের কথাই নয়। স্যাইবেরিয়ার অধিবাসী কোন আধুনিক মানুষের কথা—যার দুঃখ, সুখের বা সমবেদনা সম্পূর্ণই দেশকালের গণ্ডির সীমানা ছাড়িয়ে। কেননা, অমিয় চক্রবর্তী বর্তমান কালের আধারে সবচেয়ে আন্তর্জাতিক কবি —শুধুমাত্র ভৌগোলিক ব্যাখ্যায় নয়, মানবিক চেতনায়ও বটে। তাঁর অভিজ্ঞতার সীমানা যেমন বিস্তীর্ণ, আন্তরিকতা তেমনি তর্কাতীত। অর্থাৎ এই আন্তরিক অভিজ্ঞতাই তাঁর কবিতার প্রথম উপাদান। 'শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী'কে একদা রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে মনস্তত্ত্বের কৌতূহল চরিতার্থ করা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কাজ। সেই বুদ্ধিতে মাংসাশির অসংলগ্ন এলোমেলো অসংযম এবং সপ্রমন্থ আনন্দের গভীরতা প্রায় সমান আসন পায়। কিন্তু আনন্দসম্ভোগে স্বভাবতই মানুষের বাছবিচার আছে। কখনও কখনও অতিতৃপ্তির অবাস্তব ঘটলে মানুষ এই সহজ কথাটা ভুলতে ভুলতে করে। তখন সে বিরক্ত হয়ে সুধার সঙ্গে বুপথ্য দিয়ে মুখ বদলাতে চায়। কুপথ্যের স্বাদ বেশী, তাই মুখ যখন নড়ে তখন তাকেই মনে হয় ভোজের চরম আয়োজন। কিন্তু মন একদা সুস্থ হয়, মানুষের চিরকালের স্বভাব ফিরে আসে, আবার আসে সহজ সম্ভোগের দিন, তখনকার সাহিত্য ক্ষণিক আধুনিকতার তন্দ্রিমা ত্যাগ করে চিরকালীন সাহিত্যের সঙ্গে সরলভাবে মিশে যায় (৮ই আশ্বিন, ১৩৪৩)। তিনি গুরুদেবের এই বাক্য ভাবের দিক থেকে পুরোপুরি মেনে-ছিলেন বলা চলে, এ পর্বতকাল অমিয় চক্রবর্তী যত কবিতা লিখেছেন রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শের সঙ্গে তার মূল সুরের সহজ আত্মীয়তা আছে; এমন যে, কবিতার মৌলিক উপাদান সম্পর্কে রবীন্দ্র-চেতনায় যা যা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর কবিতায়, অতি-আধুনিকতার স্পষ্ট আকর থাকলেও, আদর্শের দিক থেকে তা বিন্দুমাত্র পরস্পর হয়নি। তার মানে এই নয় যে রবীন্দ্রকাব্যের বা কাব্যাদর্শের সার্থক অনুসরণ মাত্র এই কবিতা। মোটেই নয়, বরং রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ট সহচর হয়েও তিনিই একদা নতুন পথে, নতুন আঙ্গিকে চলবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সে স্বাতন্ত্র্য এখনো পর্যন্ত তাঁর সকল কবিতায় লক্ষণীয়ভাবে উপস্থিত। বিদ্রোহ না করেও তিনি নিজের পথে চলতে পেরেছিলেন—

একেই বলা যেতে পারে ঐতিহ্যের মিলন। ব্যক্তি ও সমষ্টি চেতনায় এক শিল্পী নিজের ভাবনা আদর্শ খুঁজে নেয়ে পথ চলতে পারছেন স্বচ্ছন্দে।

ভৌগোলিক অর্থে তিনি আন্তর্জাতিক; সমস্ত পৃথিবী তার ঘর, সকল দেশের ঘর বাড়ী গ্রাম নদী তাঁর নিজের দেশের মত-আত্মীয়তার আত্মীয়—এ তথ্য দুরুক্তিত নয়। তাঁর নতুন কাব্যগ্রন্থ 'ঘরে-ফেরার দিন'-এ 'অন্তরা' পর্বে আমোদর, কংসো নদী, সান্টা মারিয়া দ্বীপ, মানস-সরোবর, সান্টা টেরেসা ক্রান্, কাবেরীর তীর, ক্যালিফিয়ান সাগর, শিকাগো, অথবা 'অনুভা' পর্বের সাহারা, গিয়ামা এবং সূত্রধর-সংবাদের অরিগন, কাশ্মীরের হিমালয়ের মালাবার বা প্যাসিফিকের শ্যামল বনস্পতির ইঙ্গিত কি নাকা নেয়! যিনি নিজের ঘর ছেড়ে সকল দেশকে তাঁর ঘর করেছেন, সকল দেশের মানুষ যাঁর আত্মীয়, নানা দেশের রূপবৈচিত্র্যের চিত্র, প্রকৃতির অপর্যাপ্ত সম্ভারে যাঁর আনন্দ

ওগো নারকল, সারি নারকল একাকী সিন্ধুতীরে।
দিগন্ত ধরে দেখছো আমরা, এলেম এখন কূলে
তখনো স্বপ্নে চারু নীল ঢেউ মর্মরে রাশি রাশি
সেই প্রেমাভিসে, দ্বীপ প্রেমাভিসে, মুগ্ধ তোমার দিঠে,
ওগো নারকল, একাকী সিন্ধুতীরে।

তাঁর মত আন্তর্জাতিক কবি পরিচিতি কার! একটু দুঃসাহস হলেও একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই রবীন্দ্রনাথও এমন অকুণ্ঠভাবে সমস্ত দেশ, তার প্রকৃতিকে তাঁর আত্মস্থ করেন নি—বার বার তাঁর বর্ণনায় বাংলা দেশেরই পথ ঘাট আবৃত রয়েছে। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় বাংলা বা ভারতের প্রতি দুর্নিবার পিছুটান হয়ত সহজেই লক্ষ্যণীয়, কিন্তু বিদেশও তার কাছে একই সমচেতনার উজ্জ্বল। এ চেতনা হয়ত মনস্টালজিয়ার সামান্তর, কিন্তু ভাবের ও আদর্শের দিক থেকে এ চেতনা আরও মহৎ ব্যঞ্জনার সাক্ষ্য দেয়। [একটি প্রসঙ্গ বিচার্য। যে সকল দেশের চিত্র তাঁর কবিতায় বার বারে ফিরে আসে তার মধ্যে সকল মহাদেশেরই চিত্র রয়েছে, অথচ ইউরোপ বিশেষভাবে অনুপস্থিত। এ কথা কি তাঁর মনে এসেছে যে ভাবজগতে বা মনের ঐশ্বর্যলোকে ইউরোপ বর্তমানে মেউলিয়া? হয়ত বা তীব্র যন্ত্রণায় বিষজর্জর? আর তাই কি ইউরোপের স্নিগ্ধ চিত্র তাঁর কাব্যের পরিধিতে প্রায় অনুপস্থিত?]

কিন্তু ভৌগোলিক অর্থের চেয়েও আরো গভীরতর অর্থ রয়েছে তাঁর

আন্তর্জাতিকতার। সেই আন্তর্জাতিকতা পরিচ্ছন্ন মানবচৈতন্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আজকের দিনে যখন সমস্ত পৃথিবী ঘরের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে, সীমারেখা বিলুপ্তপ্রায়, তখন শুধুমাত্র বিদ্বেষ রাজনীতিই বোধহয় মানুষকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে করে রেখেছে। বস্তুত আত্মীয়তার দিক থেকে তারা সবাই ঘনিষ্ঠ। মা মোর শিশু বৃদ্ধ—এদের একই রূপ সর্বদেশে কালে, তাহলে সাহারার ওপারে

হঠাৎ মাটির ঘরে ছায়া-রং মানুষের দেশে
পৌঁছেছি, এখানে এ কী তুমি এসে ঘুচেছো সংসার

এবং সেই সংসারে তিনি 'সর্বজয়ী প্রেম' এর ঘর দেখেছেন, দেখতে পেয়েছেন

চকিতে সোনের মুখ, মা'র ব্যস্ত ত্রস্ত কোমলতা
দুটি ঘুকে নিবে তিনি ঈশ্বরিত মানুষের কথা।

মহামানবের সংসারে এই মিলন ঘটেছে ভাবলোকে, সুতরাং বর্তমান শতকের ত্রাসি ঈর্ষার মোহজাল বিস্তার করেছে যে ষড় জাতীয়তাবাদ অথবা কৃষ্ণবর্ণ আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদ তাও একদিন শুদ্ধ মানবচৈতন্যে উজ্জ্বল হবে। থাকবে শান্ত সুখী পরিবার, ছোট ছোট সংসারের মহৎ চেতনার স্বাক্ষর, ভালবাসার বেদনার মূর্তিতে মুছমান প্রকৃতির ঐশ্বর্যে বিস্তৃত মনের আনন্দে স্নাত নারী ও ভারতী গ্রামের পরিবারের অখণ্ড আত্মীয়তা। 'ক্রাম্ ১৯৫৫' একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা যেখানে তিনি সর্বদেশের সর্বকালের মানুষকে এক অচ্ছেদ গ্রন্থিতে বেঁধেছেন। কবিতাটি সম্পূর্ণই তুলে ধরতে ইচ্ছে করে, কেননা যে অনুপম স্নিগ্ধ মাধুরী কবিতাটির প্রতিটি শব্দে, সরল অনুভূতির ব্যঞ্জনায় তা আশ্চর্য শিল্পরূপে উত্তীর্ণ। যে 'শাদা চুলছায়াতলে মুখে লাবণ্য আজও মাধুরী' তিনি দেখেছেন, কবিতাটিতেও সেই ভাব রূপান্তরিত হয়েছে সার্থকভাবে :

প্রৌঢ়া ঐ নারী, স্নিগ্ধ স্নাত
আলগা হাত রেখে শীত রোদ্দিরে শাড়ির ভরে আজ
সংসার উঠোনে রেখে সাদাহ আলোর হেলেবেরে
সিঁড়ির ওপরে খেলে, দাক দেয়, খুশি তারা মাতি মাৎসি
মধীর মতুস বাঁকে।

এবং উক্ত প্রৌঢ়া স্নাত নারী 'করুণার নত অঙ্গে মনে দিব-দিব মঙ্গল প্রদীপ ধরে আছে', এবং যাঁর 'অভ্যাসের স্নেহযোগ ছিন্ন হয়নি।' কবিতাটির দ্বিতীয়

অবশ্যে শুধুই ছবি, 'ফল-বাগানের বেড়া লাল আপেলের গুচ্ছ, মোটা কালো ঘণ্টা গরু চরে কটি ঘাসে মুখ ডোবা, পাশে ছোট-রঙা ছোটো বাড়ি'—সেখানে তিনি দেখলেন

বৃহৎ চলৎ কালে দু-দণ্ডের দৈব চাওয়া ছুতে
কাদের সংসার এই,.....

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা মূলত চিত্রধর্মী, কিন্তু সবকটি কবিতায় মৌল আবেদন হৃদয়ের। বিশেষ দর্শনে যদি একে চিহ্নিত করতে হয় তবে তা প্রদীপ্ত মানবিকতার সম্পর্কে। জীবনানন্দ যে শুভ্র মানবিকতার স্বপ্ন দেখেছেন, সুধীন্দ্রনাথ আধুনিক মানুষের যে নিরাসক্ত ভূমিকা লক্ষ্য করে সংশয়াকুল হয়েছেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র এক অস্থির চঞ্চল আবেগময় জীবনে মানবতার আশীর্বাদ খুঁজে পেয়েছেন এবং বিষ্ণু দে যখন মানবচৈতন্যের শুভ-অশুভ দ্বন্দ্বকে বিশ্লিষ্ট করে নতুন সমাজ-বিপ্লবের মধ্যে তার নিশ্চিত ভবিষ্যৎ খুঁজেছেন তখন অমিয় চক্রবর্তী চিরন্তন মানবিকতার স্নিগ্ধ মঙ্গল আলোকের অবিচ্ছিন্ন বর্তিকা নিয়ে মনুষ্যত্বের প্রতি সতত আস্থা রেখেছেন, প্রাতিষ্বিক চেতনার সমকালীন বিশ্বকে অন্তরঙ্গ করেছেন—দেশকালের ভূমিকা তাঁর কাছে বিলুপ্ত হয়েছে। 'সংসার' কথাটি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় এক বিশেষ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। সমস্ত বিশ্বকে তিনি এক সংসারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, সকল মানবগোষ্ঠী এক বৃহৎ পরিবার-ভুক্ত—যুগোস্লাভ রমণী বা কাবেরীর তীরে উটের সারি এক বৃহৎ জগতের একই সংসারের অবিচ্ছিন্ন সত্তা, মানস সরোবর বা কংগোর তীর একই মানচিত্রে অবস্থিত। তিনি একস্থানে 'মিশিত সংসার' এর প্রতীক উপস্থাপিত করেছেন। বস্তুত বিগত মিশ বৎসরের কাব্যসাধনার পর অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যচেতনা নতুন দিগন্তে এসে পৌঁছেছে যখন তিনি এক সহজ অনাড়ম্বর আন্তর্জাতিক মানবতাবোধে নিজের চিন্তাকে উত্তীর্ণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

দুই

বর্তমান শতকের গোড়াতে এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে আফ্রিকায় উপনিবেশবাদের লাঞ্ছনায় মনুষ্যত্বেরই অপমান সূচিত হয়েছে। এশিয়ার সে গ্লানি অনেকাংশে অপসারিত হয়েছে কিন্তু আফ্রিকাকে কেন্দ্র করে গত দুই যুগ ধরে পশ্চিমী সভ্যতার নগ্ন মুখোশ বারবার খুলে যাচ্ছে। মানবতার ঐশ্বর্য ও শক্তি ধূলিলুণ্ঠিত

হয়েছে লোভ ও হিংসার কাছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে নীরব থাকেন নি। তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল একদা। অমিয় চক্রবর্তী তাঁর সর্বপ্রথম গ্রন্থে প্রথমেই সেই মহাদেশের এক নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন—সহিষ্ণু ধরিত্রীর মত এই বিরাট মহাদেশও স্তব্ধ মূক। অরণ্যসঙ্কুলিত কলো তীরে 'স্তব্ধ কথা সম্পূর্ণ অমাপি ধ্বনি', 'কোথাও তিমিত রৌদ্র, চক্রাক সন্ধ্যার'। এই পরিবেশে তিনি জীবন ও জগৎ এর যথাবর্তী চেতনার দ্বারে এসে এর বিরাটত্বকে অনুভব করবার চেষ্টা করেছেন

দাহ ধরিত্রীর মূঢ় লৌহ জল সংস্করণে
দক্ষিণ সাহারা প্রান্তে ওঠে ঘন একতা
উচ্চারিত ক্রমে আখে ম্যাসিবক শিরতের ক্ষেতে,
দারুণ পতঙ্গ পাখা কুমিরে প্রাণের দামামায়
আফ্রি নহ বিশ্বসৃষ্টিকর্ণী। অন্ধ ভাষা নেই।

এই বাক্যই রেখেছে আফ্রিকা কবির ধ্যানমন্ত্রে। প্রাচীন কবির শ্লোকে যে এই বিশ্বকে বন্দনা করা হয়েছে, গাঢ় রৌদ্র জলধারায় পৃথিবীকে যেভাবে মন্ত্রঃপূত করা হয়েছে অমিয় চক্রবর্তী যেন প্রায় সেই সুরেই সেই স্তব্ধতার বাণীকে কবিতায় রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন। অথচ সেখানে মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনার কথা সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। 'দাস ব্যবসায়ী সাম্রাজ্যেশী' লোক চিরকাল আফ্রিকায়

সুপ্তির সঞ্চিত পাপে বুক করে তীব্র বর্বরেষ।

শুধু যে লোভ লালসা হিংসাই পররাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য তাই নয়, এমন একটি মহাদেশকে বর্ণবিদ্বেষে তারা পঙ্গিল করে তুলেছে। কিন্তু একথা তাঁর প্রত্যয়ে রয়েছে যে এ অন্যায় চিরকাল প্রকৃতি সহ্য করেনা। আফ্রিকা তার নিজস্ব চরিত্রের অম্লান বাক্য রাখবে মহাপৃথিবীর বুকে। 'তীক্ষ্ণ তীব্র শান্ত কথা' মানুষকে একদিন শুনতে হবে। এই কবিতাই সম্পূর্ণ বই এর ভূমিকা—এই মনুষ্যত্ববোধে ও মানবপ্রত্যয়ে বর্তমান গ্রন্থটি সমুজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বর্তমান কবির পার্থক্য এই যে রবীন্দ্র চেতনায় শুধুই তথাকথিত পশ্চিমী সভ্যতার লোভ লালসার উদ্ধত রবি ফুটে উঠেছে—আফ্রিকা সেখানে নীরব, অপমানিতা লাঞ্ছিতা, তার গোপন অন্তঃপুর বিশ্বের কাছে চির অপরিচিতা। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর কাছে আফ্রিকা তার গোপন ঐশ্বর্যে প্রাণবন্ত—সে শুধু

প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে মণ্ডিত সবশ্যামতি-ঘেরা মহাদেশ ঘর, তার স্নিগ্ধ শান্ত রূপ মানুষকে ঘনিষ্ঠ করে, কংগো নদীর ধারে সমগ্র বিশ্বের মানবকে টেনে এনে সে আপন করে নেয়—নদীর শান্ত খেয়াঘাটে পথিককে বাড়ীর কথা মনে করিয়ে দেয়। তার কাছে পর্তুগীজ অত্যাচারের ছবিটি যেমন সত্য, প্রত্যহিক সত্য

যদি থাকতো একটি ভূগ, মরুধ্যানে কোথাও বিস্তৃত
শ্যামরক্ত চিহ্নটুকু,
তাকেই নির্ঘাসে তপ্ত আপোলার কবিতা দোলাতে
জাগাতেম মিশ্রিত উপমা।

তিন

মানবভাবোধের এই মূল ঘর থেকেই তিনি জীবনকে নানাভাবে চিনেছেন। প্রতিমুহূর্তের বেঁচে থাকার আঘাত তিনি সমস্ত চেতনা দিয়ে উপভোগ করেছেন, পথ-চলতি জীবনকে আপন সংসারে টেনে এনে এক আত্মমগ্নতায় ভরে রেখেছেন। 'কংগো নদীর ধারে' কবিতাটিতে এই বিশ্বপথিক কবির পরিক্রমা শেষ করে বাড়ী-ফেরার কথা ধ্বনিত হয়েছে। শেষ স্তবকটি এক অনন্ত মাধুর্যে ভরে দিয়েছেন যখন ঘরের আঙিনায় প্রদীপ জ্বলবার স্মৃতিতে তাঁর মন মায়া-আয়াসুর, অন্তহীনক পথ চলায় তাঁর জীবন তন্দ্রাচ্ছন্ন। 'চলতি' কবিতাগুচ্ছের চিত্রগুলি স্মৃতিগন্ধবহ, যেখানে

ঘর থেকে সেই কাছের কোমল
মাথায় চুলে রেণুর করণ
বুকের স্পর্শ

অথচ যা প্রতিমুহূর্তেই আবার হারিয়ে যায়, মিলিয়ে যায় দিগন্তরে—শুধুমাত্র 'স্মৃতির যাওয়া' হয়েই বেঁচে থাকে কবিতায়। রাত্রির বা সকালের প্লেন থেকে দেখা পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনকে মহাসুতের সঙ্গে, বিশ্বের বিচিত্র বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি মিলিয়েছেন; বস্তুত ক্ষুদ্র বৃহৎ বা বিরাটের ব্যবধান মুহূর্তেই লুপ্ত হয় এমন একটি চেতনার জন্ম হয়, যতই ইচ্ছে হয় সমস্ত পৃথিবীকে একটি সুন্দর নিখুঁত চিত্ররূপে কল্পনা করতে। 'চলতি' কবিতাগুচ্ছের ছোট ছোট স্তবক-গুলিতে সেই বিস্ময়ের, অমলিন চিত্ররূপের নিগূঢ় সংকেত রয়েছে। যে

জীবন প্রতিমুহূর্তেই দূরে সরে যায়, যার দৃশ্যপট বদলাতে থাকে অনবরত, চঞ্চলা নদীর মতই যা পরিবর্তনময় অথচ অস্থির তার সঙ্গে কবির আত্মীয়তার সূত্রেই এই কবিতাগুচ্ছের জন্ম। 'যে যায় পথে' 'এক্বায়', 'আয়রিক' 'পথ' প্রভৃতি ছোট ছোট কবিতাগুলির আবেদন তাই আমার কাছে দুরন্ত আশায় ; কবিতাগুলিতে জীবনের ছোট ছোট মুহূর্তগুলিকে চিরন্তন করে ধরে রাখা হয়েছে এবং সর্বশেষে তাকে দেশকাল ও সময়ের গণ্ডী থেকে উত্তীর্ণ করে' এক ব্যাপক বিশ্বচেতনার মধ্যে পুনরায় বিলীন করে দেওয়া হয়েছে। কতগুলি উদাহরণ যথাক্রমে :

(১) পাথরে বসেছে গাঙচিল ;
প্রজাপতীপের ধাঁজে সূর্যের সংকেতে
খুঁজে নামে মিহু-মাক প্রেম, বিষু নীল
আদিঅন্তহীন প্যাসিফিকে
ঘর্-ঘর্ একটু ভাঙা কি ও।

(২) পাকল পুলিত পথে শাখা প্রজাপতি
চলেছে একটি শুভ্র মুহূর্ত মেলায়,
ফেরার সময় নেই ॥

(৩) জগৎযাত্রী, গাছের তলায় ব'সে
ভেবে দেখে যায় ছোটো পুকুরের জলে—
সারা ভুবনের ভ্রমণের মন মিরে ॥

(৪) এবারের হাটে
রঙিন পুঁথির ছায় বিশ্বমেলা থেকে হ'লো কেনা—
আবার তাকেই হাতে ঘুরিয়ে দেখছি তারা-ভরে,

(৫) আমি এই বৃত্তে ঘেরা, তবু ঘর আমি
এই চলচ্ছবি ধরে নাট্যের সমস্ত জগৎ
ছড়িয়েছি বহুপাত্রে—
ভূমিকা আকাশী,
শরীরে সর্বাঙ্গ ধরা,
তবু খাঁচা নই ॥

যদিচ মেরেডিথের earth philosophy-র সঙ্গে এই ভূমিকার মিল

বিস্তারই সামান্য, তথাপি স্বীকার করতে বাধা নেই অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় এই নিগূঢ় সংযোগের চিন্তা ক্রমশ দানা বাঁধছে, পর পর প্রকাশিত গ্রন্থগুলিতে স্পষ্টতই একটি বিশেষ চেতনা রূপ পরিগ্রহ করছে যখন মনুষ্যসংসারে এই বিশ্বপ্রকৃতির ভূমিকা আর গৌণ থাকবেনা। এক বিরাট আত্মরূপ শক্তি হিসেবে মানবসত্তার মূল কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হবে। মাটির সঙ্গে মানবজীবনের অন্তর্গূঢ় সম্পর্ক চিরকালীন, আলোচ্য কবির কবিতায় এই মাটি প্রকৃতির বৃহৎ-সংসারে রূপান্তরিত হয়েছে।

মিলেছি মাটির চ'লে-যাওয়া মন্দিরে—
ওগো বারকল, একা বারকল সারি গো সিন্ধুতীরে॥

সৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে একটি বৃহৎ চলচ্চিত্রের মত এই বিশ্বসংসারকে তিনি দেখেছেন যখন ছোট ছোট চিত্র ও আলেখ্যের ছবি এক দৃশ্যকাব্যের পটভূমিকায় পরিণত হয়েছে। 'দাহ ধরিত্রীর গূঢ় গৌর জল' এর কথা তিনি যখন বলেন, দক্ষিণ সাহারা প্রান্তের বর্ণনা করেন, অথবা 'সাহারের শুভ্র সারি দূর-মরা' প্রভৃতি চিত্রে এই দৃশ্যকাব্য শুধুমাত্র নিসর্গ বর্ণনায় শেষ হয় না। একটি মহা-চৈতন্যের আভাস আসে, নূতন দৃষ্টি ঘনিষ্ঠ হয় এবং প্রকৃতি ও মানবজীবন বিরাট সংসারের অন্তর্ভূক্ত হয়ে একটি সামগ্রিক অস্তিত্বে রূপান্তরিত হয়। এবং সেই সঙ্গে কবির মনে রয়েছে অজ্ঞান, 'কল্পলোকে' কবির ধ্যানযাত্রা বিশ্ব-সংসারকে অতিক্রম করেও কি আরো দূরে পৌঁছোতে চায়?

সময়ের আলো-অন্ধকারে মুক্ত তুমি
যেখানে রয়েছো স্তব্ধ স্থির,
সেই পূর্ণতায়
পৌঁছে দেবো আমারো আকাশ,
আর হারাবেনা॥

এই সব চেতনা আরো কয়েকটি কবিতায় বিধৃত আছে। উল্লিখিত কবিতা 'পরিধি'র মতই 'ঘুঘুরে' কবিতাতেও অনেকটা একই সুর বাজছে—যেখানে মর্ত্তের সংসারকে অতিক্রম করে এই বিরাট ব্যাপ্ত বিশ্বসংসারের কল্পনা করছেন, আকাশ, নক্ষত্রপুঞ্জ এবং বর্তমান মানবসংসারের এক গ্রন্থিসূত্রে তিনি একটি অনুপম ছবি দেখতে পাচ্ছেন,

উদ্ভাসিত দূরে দূরে অনন্ত যাদব

যেন সেই দীর্ঘ কল্পনালোকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে আছে। এই সব কবিতায় একটা বিস্মিত, অস্পষ্ট, রহস্যময় চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

চার

যেমন পরিশুদ্ধ মানবসত্তার কথা তাঁর কবিতায় বার বার এসেছে তেমনি বিশুদ্ধ কবিতার চেতনাও তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু বলে বিবেচিত হয়েছে। অথবা কিছু কিছু কবিতা এমন দাবি রাখে যে তার ভাবসমষ্টিতায় বিশুদ্ধ কবিতার রূপই যেন পরিগ্রহ করেছে, অন্য কিছু নয়। অর্থাৎ শুধুমাত্র প্রকৃতি-চেতনার গভীর আনন্দে তিনি মগ্ন; কোন বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে তাকে না দেখে বিশ্লিষ্ট না করে নিছক রূপ ও রূপাতীতের অন্বয়সাধনে আত্মমগ্ন। চোখ কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের স্পর্শকাতরতায় নিসর্গরূপকে ধরবার চেষ্টা করেছেন সর্বত্রই—'দোতোলায় উঠে সেই কবিতার কাছাকাছি একা' তিনি থাকতে চেয়েছেন। 'কত যে আর্দ্র ছিল বুক, কথা বন্ধ হয়ার মত'—এমনতর রোমান্টিক মনোভাবনার থেকে কিছু বিশুদ্ধ কাব্যের ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছেন আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে। বস্তুত 'ঘরে-ফেরার দিন' অমিয় চক্রবর্তীর একটি অসামান্য কাব্যগ্রন্থ যেখানে ধ্বনি বর্ণ রূপ সব মিলে একটি গোপন যাদুমন্ত্রে যেন শরীরী সুষমা লাভ করেছে। সে-ব্যঞ্জনা সহজে তোলবার নয়।

উদ্ধৃতি দিলে স্পষ্ট হবে—

অরণ্যতট ঘ'রে আছে যেমনা পারে
অথবা প্রীষ্ম নদী ঝিরিঝিরি পৃথিবী সেরেছি বহুক্ষণ
অথবা শুন্ শুন্ দাবাদিন, বাহিরের রৌদ্র হীরে-ঝরা
ঝাঁকের কর্মীরা ওড়ে পবন পাখায় নীল-দোলা
সাঁতার সূর্যের ঢেউয়ে, পৌঁছে বারবার পরদূরে
ফিরে আসে ইন্দ্রিয়ের কম্পন কুহকে জীব-ঘরে।

বিশিষ্ট শব্দের নিজস্ব ব্যঞ্জনা আছে—কিন্তু বিশেষ বিশেষ শব্দের সান্নিধ্যে অন্যতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়, কাব্য প্রাণবন্ত হয় অন্য মাত্রে। এ কৌশল সকল কবির আয়ত্তে নেই। 'পর্যবসিত' কবিতায় যে পরিপূর্ণ চিত্রটি ধরা পড়েছে তা শুধু যে জীবজগতের একটি সুন্দর সংসারের চিত্র তাই নয়, উপরোক্ত ব্যঞ্জনায় উত্তীর্ণ হয়েছে বলেই কবিতাটি বিশুদ্ধ কাব্যরূপে উপস্থিত হয়েছে।

উজ্জ্বলতর হয়েছে কবিতার পটভূমি। আবার কোথাও তিনি বর্ণনাকে সংহত করে এক ঘনত্ব অর্জন করতে পেরেছেন। একটি পূর্ণাঙ্গ ছোট কবিতা, যেমন 'শিরশেষ'

দুঃখাগ্রকে ছল মেরা বরফ অমিয়ে,
সেই শুভ্রতায় জ্যোৎস্না ধরা।
—রাত্রে তাই চেয়ে দেখা।

বিশিষ্ট চিত্ররূপ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে সংহত হয়েছে এক অপরূপ ব্যঞ্জনায়। দৃশ্যবাসিতা থেকে জীবন-দর্শন এ পৌঁছুবার এই অনন্য রীতিটি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় যেমন সার্থক রূপ পরিগ্রহ করেছে তেমন বাংলা কাব্যে আর সচরাচর চোখে পড়ে না। সংক্ষিপ্ত টুকরো টুকরো জীবনের অগণ্য অসংখ্য শিল্পবস্তুকে সাজিয়ে তিনি সব সময়েই একটি মালিকা রচনা করেন। সেই মালিকা বিশুদ্ধ কাব্যরসে প্রাণবন্ত, গভীর মানবিক মমতায় কখনো বা উজ্জ্বল, গ্রামাবাসের দিনপঞ্জী থেকে সংগৃহীত নির্জনতা অথবা কোলাহলের নানা বিপরীত চিত্রের সমন্বয়ে সার্থক। 'ঘরে-ফেরার দিন' কাব্যগ্রন্থের 'অনুমা' গ্রন্থের 'একই ছবি' কবিতাটি লক্ষণীয়। এই কারণে যে সম্পূর্ণ বইটি পাঠান্তে কাব্যরসিকের মনে হবে যেন বহু বিশেষ সূত্রে এসেছেন তিনি—নদী নালা মরুভূমি পর্বত অরণ্য নগর গ্রাম—নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তার মন, কিন্তু সবই প্রকৃতপক্ষে সেই এক ছবির অন্তর্গত—চিরকাল মানুষ যে ছবি দেখবার বাসনায় অনন্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মানবলোকে পরিভ্রমণ করেছে, সব তার প্রতিফলন মাত্র। কল্পনায় যা এতকাল লালন করেছে সেই অনির্দিষ্ট 'বহু কাব্যে লেখা':

এসেছি, দেখেছি, আমি খুলেছে সে দ্বার
সমুদ্রপারের ডাকে, আলো দিবে কোলে
চাবি হাতে নামে সেই, অতিথির শেষ বেলা হ'লে॥

এই রহস্যের চাবিকাঠি কবির হাতেই আছে, আর কারু কাছে নেই।

কাব্যগ্রন্থটির শুরু রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কবিতায় 'জ্যোতির আবাসে পৃথিবীতে তাঁর এই কাব্য দীপ্তিধারণার' এবং শেষ 'ভুলে গড়লো কালের সোনা শুনে বাঁশির সুর' এমনতর স্বীকৃতিতে। অর্থাৎ কাব্যচর্চার প্রথম উন্মেষ ও শেষ অভিঘাত বইটির সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ কাব্যে বিধৃত হয়েছে, মধ্যপর্বে সর্বত্র রয়েছে সেই কাব্যধারণার অজস্র উপমা।

কিরণশংকর সেনগুপ্ত-র কবিতা

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

চল্লিশের কবিদের মধ্যে একটি বহুপরিচিত নাম কিরণশংকর সেনগুপ্ত; তাঁর রচনার পরিমাণ যথেষ্ট—এবং বাংলার সমাজ ও কাব্যজীবনের একটি ক্রান্তিকালের ছাপ বারবার তাঁর রচনার মধ্যে দেখা যায়। তাঁর কবিতায় আদিম সারল্য (pristine glory), সহজ ও অনায়াস বিন্যাস এবং ভাষার এক সুচারু সুমিত প্রকাশ (যা আমরা মধ্যবিত্ত-মননের ফলশ্রুতি বলতে পারি এবং যে-গুণ পাশ্চাত্যমানের কবিতায় সহজলভ্য বলে আমাদের মনে হয়) ও আরো অনেক কিছু আমাদের মনোযোগী দৃষ্টি আকর্ষণের দাবী রাখে।

অন্যান্য অনেকের মতই কিরণশংকরকে বাঙালী পাঠকের কাছে পরিচিত করিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কবিতা' পত্রিকা, এবং অংশত সেকালের 'পরিচয়' পত্রিকা ('কবিতা'র মুক্তি বছর-প্রসঙ্গে কিরণশংকরের চিঠি—কবিতা ২য় সংখ্যা, ১৩৬২)। কিরণশংকর যে সময়ে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন (১৯৩৬-৩৭) সেটা আধুনিক কাব্যকর্মের দ্বিতীয় পর্যায়। তখন তিরিশের কবিরা উজ্জ্বল সোপালী ফসল নিয়ে সমুপস্থিত, শেষবেলার রবীন্দ্রনাথ তখনো দ্যুতিমান। স্বভাবতই কিরণশংকরের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্ন-কামনা'য় তিরিশের কবিদের কিছু কিছু ছায়া পড়েছে—কিন্তু ছায়া থাকলেও তা অস্পষ্ট ছায়া, এবং আমরা আমি "যিনিই যারই হোক তাকে উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করে যদি রচনার পৃথক সিদ্ধি পাওয়া যায় তাহলে শিল্পীর উপায় নিয়ে প্রশ্ন করার কোনো মূল্য নেই।" ('অসমাপ্ত আলোচনা', কবিতার কথা, জীবনানন্দ দাশ)। তিরিশের ঐতিহ্যে দীক্ষিত হয়েছিলেন বলেই তিরিশের কবিদের দর্শন ও প্রকরণগত ভাবনাবলী তাঁর মধ্যে দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এতৎসত্ত্বেও এই কাব্যে তিরিশের কিরণশংকরকে চেনা যায়—এক স্পষ্ট উচ্চারণে, আবেগের পরিমিতিবোধে, চিন্তার গভীর সঞ্চারে এবং অভিজ্ঞতার অকপট

অমর। এই বইয়ের বহু-প্রশংসিত কবিতা 'হে ললিতা কেরাও নয়ন' আবেগপ্রবণতায় আজও চিত্তহারী। এই কবিতাটি প্রসঙ্গে ভূমিকায় জীবনানন্দ লিখেছেন: "আবেগের আন্তরিকতা অনেকেই বোধ করেন; কিন্তু হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতর চিন্তা ও অভিজ্ঞতার যে মতন সারবত্তা তাকে কাব্যে পরিণত করে, আমার মনে হয় এ কবিতাটির ভিতর সে-সবের প্রায় সম্পূর্ণ সফলতা আমি ছাড়া আরো কেউ কেউ উপলব্ধি করতে পারবেন।"

কিরণশংকরের মধ্যে তিরিশের কবিদের মতই 'সৌন্দর্যানুভূতি' ছাপ ফেলেছিল (এই শব্দটি বুদ্ধদেব বসু ব্যবহার করেছেন তিরিশের সব বোঝাবার জন্যে—'নরেশ সেন: কয়েকটি কবিতা', কালের পুতুল, পৃঃ ৫৮ নতুন সংস্করণ) যেমন, তাঁর স্বকীয়তার প্রসন্ন মূর্তি দেখা যাবে নীচের কাব্যাংশগুলিতে:—

(১) হে ললিতা, ফেরাও নয়ন!
যদি শুভ্র স্নিগ্ধদেহের স্বাদ
আর নৈশ আশ্লেষ-শয়ন
মুক্তিস্নান এনেছে জীবনে,
ঘুরে থাক লোক-পরিবাদ···('হে ললিতা, ফেরাও নয়ন')

(২) "ওই শুধু কুমারীর কমনীয় দেহ
একদিন লভিবে তো কেহ?
কিংবা ক্রুর কালচক্রে অকস্মাৎ কোন একদিন
শুধু স্নিগ্ধ তনুজ্যোতি বিনিঃশেষে হবে তো বিলীন?
অনাগত দিবসের ওই সব কথা
মনে মনে ভেবো একবার:
দেখিবে তোমারও দেহে মোর সব হৃদয়ের ব্যথা
ললিতা উঠিছে বার-বার।" ('আমি নহি স্বর্গের দেবতা')

(৩) সুলোচনা হে ললিতা শোনো,
একথা কি ভেবেছো কখনো
ধূলিরুক্ষ রাতাবন-তলে
আমাদের উদ্দাম প্রণয়
জাগত রাখিবে কোন্ ছলে? ('স্বয়-কামনা')

'হে ললিতা কেঁদোনা মরম' বাংলা কাব্যের একটি স্মরণীয় কবিতা। 'ললিতা' ও সৌন্দর্যেরই প্রতীক যে-সৌন্দর্য তখন দেখেছিলেন (তাঁর শাইমারা-য়), এ্যালান পো দেখেছিলেন (তাঁর হেলেন-এ), কিংবা জীবনানন্দ দেখেছিলেন (বনলতা সেন-এ)। মূল ভাবটির প্রতীকধর্মিতায় এই কবিতাটি প্রাণোজ্জ্বল। দেহের মধ্যনাম যেমন তিরিশের কবি খুঁজে পাওয়া যায় এর মধ্যে, তেমনি পিতামহ রবীন্দ্রনাথের পদলতার দেখা যাবে 'লজ্জা-অপমান-শঙ্কা হায়ো' ইত্যাদি পদ-রচনায়।১ আমার এর মধ্যে কিরণশংকরকে চিনতে কষ্ট হয় না; তাঁর পরিশীলিত শব্দ-ব্যবহার, সুমিত সুচারু দেহসুষমা প্রশিধানযোগ্য। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে এই সুন্দর রোম্যান্টিক কবিতাটিকে আমরা এক নিপুণ ক্লাসিকাল গড়নের মধ্যে পাচ্ছি। পয়ারের অত্যন্ত সীমিত পরিসরে এই দীর্ঘ কবিতাটি লিখিত হয়েছে, কিন্তু পড়তে কোথাও ক্লান্তিবোধ হয় না। মনে হয়, সুন্দর একটি ক্লাসিকাল 'Ode' পড়ছি। স্তবক-রচনায় পংক্তিতে পংক্তিতে পরস্পর সংশ্লিষ্ট যে স্রোতধারা (enjambement) যা পরবর্তীকালে কিরণশংকরের রচনায় নিপুণভাবে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়, তারও সূত্রপাত এখানে।

জীবনানন্দ লিখেছিলেন, "আমার মনে হয়—'হে ললিতা' পড়ে—যে, গদ্য কবিতায় কিরণশংকর যে সফলতা ও শক্তি দেখিয়েছেন তা তাঁর পরিচ্ছন্ন চেতনায় না হোক, অবচেতন মনে তাঁর নিজের জন্য অনাদি ট্রাডিশনের দেশে একটা পথ কেটে রাখছে হয়তো।" পয়ারের এই ৬।৬ মাত্রার মধ্যে যে বজ্র-নির্ঘোষ উক্ত কবিতায় তাকেই স্বাগত জানিয়েছেন জীবনানন্দ, কিংবা

---

১ বস্তুত তিরিশের কবিরা যখন রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করেও রবীন্দ্রনাথকে ভুলতে পারছিলেন না, চল্লিশের কবিরা তখন আদৌ রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করেননি, অকারণ দুঃসাহস দেখাননি। চল্লিশের কবিদের মধ্যে সমর সেন ও কামাক্ষীপ্রসাদ সত্ত হৃদ্য একরূপে, মণীন্দ্র রায়ের স্পষ্ট উচ্চারণে, কিরণশংকর সেনগুপ্তর প্রেমের আবেগে, এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ, নরেশ গুহ, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও সমসাময়িক আরো কয়েকজন কবির রচনাবলীতে কখনো স্পষ্ট, কখনো প্রচ্ছন্নভাবে রবীন্দ্রনাথের ছায়া খুঁজে নিতে পারি।

'আমি নহি স্বর্গের দেবতা' ইত্যাদি কবিতার মধ্যে ভাঙা পয়ারের বিভিন্ন মাত্রার যে বিচিত্র সমাবেশ তার প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন তিনি।

'কোকিল' কবিতাটিও একটি উজ্জ্বল প্রতীকী কবিতা বলে মনে হয়। 'রূপকথা', 'অন্যায়', 'মৃত্যু' প্রভৃতি কয়েকটি গদ্যকবিতাও এই বইটিতে আছে। গদ্যকবিতায় রীতি তখনও রবীন্দ্রানুসারীই ছিল, তার প্রমাণ এগুলিতে পাওয়া যাবে। আমার এরই মধ্যে চল্লিশের চেতনার সুর ধ্বনিত হয়েছে—বহির্বিশ্বী সেই চেতনার সঞ্চার হয়েছে এখানেই—

"প্রেম আজ পলাতক! পৃথিবীর মৃত্যুহীন গান
অতীত মোহার আর জাগায় না মোর মরলোকে,—
সমুদ্র শুকায়ে গেছে, শুধু তার অন্তিম আহ্বান
বিক্ষোভের বহ্নি-জ্বালা জ্বালে আজো রক্তস্পর্শ চোখে।" ('জাতিস্মর')

এরপরেই শুরু হল ইতিহাসের এক বিভ্রান্তিকর সময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ইতালুবেশন, রাজনৈতিক আন্দোলন, মন্বন্তর, দেশবিভাগ, মধ্যবিত্ত জীবনের অসহায়তা সব মিলে জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক ভিন্নতর অভিশাপের চিহ্ন রেখে গেছে। এই সময় কিরণশংকর সমাজের দিকে গভীর, গভীরতর মুখ ফিরিয়েছেন। তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'ঘর ও অন্যান্য কবিতা'য় এই জীবনের ছবি একের পর এক দেখা যাবে। 'ঘর' বাংলা কাব্যের এক আশ্চর্য কবিতা। মধ্যবিত্ত সমাজের এক অন্তরিকর পরিবেশ দেখা যাচ্ছে এখানে।

'ঘর' কবিতাটি পড়তে পড়তে বারবার এলিয়টের 'প্রুফ্রকের' কথা মনে আসে। এই কবিতাটিতে বিভিন্ন ধরণের কথোপকথন ও প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে একটা কাঁপা সমাজের পুরো ইতিহাস যেন মেলে ধরা হয়েছে। এর কথোপ-কথনের ভঙ্গিতেই নাট্যগুণের আভাস রয়েছে, এবং কিছু চরিত্র সৃষ্টি করে কবি ইচ্ছা করলে এটিকে একটি কাব্যনাট্যে রূপায়িত করতে পারতেন। এক আশ্চর্য প্রতীকী এই 'ঘর' এবং সে-ঘরের ওজন আছে কারণ সেটা বলগলে। এই একটি বিশেষণ, বিষয়বিরিক্ত একটি গুণের ওপর বিস্ময়ের আরোপ, নিশ্চয়ই অনুমন্ধের দাবী রাখে। এবং ঘুরেফিরে গানের ঘুরোর (refrain) মত 'নটবাবু ইহলোকে নেই—যে লোকটি এসেছিলো এ-খবর দিয়ে গেলো সে-ই' সমস্ত কবিতাটির আবহ-রচনার সহায়তা করেছে। এই কবিতাটি একটি সফল 'ইম্প্রেশনিস্টিক' কবিতা যার স্পষ্ট উচ্চারণে একটি যুগের চিত্ররচনায়

যথেষ্ট কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন কিরণশংকর। পয়ারের বিভিন্ন মাত্রার বিচিত্র ব্যবহারে কিরণশংকরের যে দাক্ষিণ্য তার সূত্রপাত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কথা-কামনা'র দেখা গিয়েছিল। এখন আধিকের পুঁজিটি তাঁর করতলগত।

সে-যুগের সমাজ সচেতন কবিতা এখনো যথেষ্ট ভালো লাগে। 'মুখোমুখি' কবিতার ইতানুসেশনের সংকেত, 'ব্ল্যাক আউট সেই' কবিতার তৎকালীন আর একটি ছবি আজো আমাদের কৌতূহল জাগায়। সে-যুগের ব্যঙ্গ ও শ্লেষাত্মক যে-কবিতা লিখিত হচ্ছিল, এবং কয়েকজন কবির মধ্যে সেই গুণটাই যখন বিশিষ্ট মান অর্জন করেছিল, তখন কিরণশংকরও সেই কাব্যধারায় কবিতা রচনা করেছিলেন। 'গলিত নখ' সেইরকমের একটি সৃষ্টি। 'পিতের গন্ধে পিপাসা মেটাই বিদেশী স্কুলের। চায়ের দোকানে ভিড় না থাকলে থাকিতে কিনি।' তিন-মাত্রার সকল প্রয়োগ দেখা যাবে এই কবিতায়। কিন্তু এই তির্যক যুক্তিদীপ্ত ধারা কিরণশংকরের স্বভাবধর্মে ছিল না তাই এদিকে তাঁকে মুখ ফিরোতে দেখি না। সত্তার গভীরে যাওয়ার মধ্যে কিরণশংকরের যে স্বভাবধর্ম প্রকাশিত, প্রকৃতির মধ্যে, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শান্তিকে পাওয়ার যে-প্রয়াস দেখতে পাই—সব কিছু মিলে যে পরিমিতিবোধ ও সুচারুতা চোখে পড়ে তাই কিরণশংকরের কবি-স্বরূপ। রোম্যান্টিক চেতনার কবি হয়েও তাঁর পরিমিতিবোধের জন্যে, তাঁর যুক্তির পারম্পর্যিক বিন্যাসে ক্লাসিকাল আদর্শের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রকৃতির দিকে, জীবনের গভীরতম সত্তার দিকে মুখ-ফিরোনোর কবিতা 'এই চাঁদ', একচক্ষু' ইত্যাদি। বাংলাদেশে চাঁদ-কে নিয়ে অনেক ভালো কবিতা রচিত হয়েছে—এবং এই কবিতাটিও তাদের মতই সুন্দর। চাঁদ যে আমাদের জীবনে এক সর্বব্যাপী আস্তিত্ব নিয়ে বিরাজিত, তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন কবি। একটিকে একটি 'ইমেজিস্ট' কবিতা বলে চিনে নিতে ভুল হয় না, বিশেষত এ কটি পংক্তিতে 'ইমেজিসম্' সুন্দর রূপে প্রতিভাত :

মাঠপারে ছবিপাড়া সেখানেও চাঁদ
দাঁড়িয়েছে এসে
হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদের বেশে,...।

'একচক্ষু' কবিতায় প্রকৃতির সুগভীর সত্তার সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছেন কবি কারণ তিনি জানেন 'অপমৃত্যু ডেকে আনে একচক্ষু যত হরিণেই'। এক আশ্চর্য

সৌন্দর্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে চান তিনি যে-সৌন্দর্য জীবনের আশে-পাশে-চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। এই কবিতাটির স্তবকে স্তবকে সুর একটি অর্কেস্ট্রার সুর ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে।

কয়েকটি সুন্দর চতুর্দশপদীর মধ্যে উত্তরকালের কিরণশংকরকে খুঁজে পাওয়া যায়। 'সুখ', 'আজ বসন্তে', 'এখানে' কয়েকটি সুন্দর কবিতা। উদ্ধৃত কাব্যাংশে কিরণশংকরের স্পষ্টতা, চেতনার তীক্ষ্ণতা দেখা যাবে।

(১) "মহিম জানে না,
তুমি জানো, আমি জানি, জানে তো সবাই
এ জীবন কী ভীষণ ফাঁকা! (স্বর)

(২) অন্ধকারে যেন কার ভারী কণ্ঠস্বর।
কার স্বর!
পাষাণে অরূপ শাখা, স্তব্ধ পাথর
অকস্মাৎ খলখলে স্বর। (ঐ)

(৩) শব্দ শোনো দুর্গকাশে ভীত ইঁদুরের।
শকুনিরা আকাশে উদ্যত—
কী ভীষণ পরিণাম! এ যুগের রথচক্রতলে আমরাও
ইঁদুরের মতো। ('স্বরণী')

(৪) রাত্রির সঙ্গীত শেষে রক্তস্নাত দিন এসে
দাঁড়ালে আবার কাল ভোরে:
পরমাণু নেই তবু বেঁচেই যে আছি
সেটা কোন্ জোরে? ('রাত্রির সঙ্গীত')

সমকালজর্জর এই পরিবেশ থেকে বেঁচে-ওঠার ইংগিতও আছে তাঁর কবিতায়— একরকম গ্রামীণ সারল্য ও মৈসর্গিক সংবেদন তাঁকে সেই স্পষ্টতার কাছাকাছি এনেছে যার কথা জীবনানন্দ বলেছেন, "যে সব কবি বিষয়কে কবিতাসত্তার দাঁড় করানো সম্বন্ধে কোনো মতামত ব্যক্ত করেন নি তাঁদের কবিতা পড়ে দেখলে বোঝা যাবে যে বিজ্ঞান দর্শন এমন কি ধর্মেরও পরিণত মীমাংসার চেয়ে আলাদা এক নির্মলতা রয়েছে কবিতায়; ভিন্ন ধরণের এক অব্যর্থ (বলা যাক একে) পদ্ধতির ফলে এই স্পষ্টতা সম্ভব হয়েছে।" ('বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ', কবিতার কথা)।

(১) হে হৃদয়
মৃত্যুতুল্য অন্ধকার নয়,
সন্ধ্যার গভীরে আনো চৈতন্যের মাঙ্গলিক শ্রান্তি,
আনো অনুভূতি
আহত ইন্দ্রিয় 'পরে পুষ্পগন্ধে লক্ষ্যহারা প্রদোষবায়ুর ;
('নির্জন মুহূর্তের প্রার্থনা')

(২) দীর্ঘপথে ধূসরক্ষেতে
কণ্টকিত সংসারের পথে যেতে যেতে
মিছিলের সিদ্ধান্তের মতো
এই সেই চাঁদ। (এই চাঁদ)

(৩) বাড়িয়ে সেখানে যাও তীব্র ক্ষেদ, দহনের সুর,
এদুপের লক্ষ্মী মূর্ছাতুর ;
• • •
এখনো যে ভালবাসি, এখনো যে আকর্ষণ আছে,
—কী প্রত্যাশা পৃথিবীর কাছে !
উন্মোচিত হৃদয়কে মেলে দিতে চাই
তৃণদলে, বৃষ্টিকার কাছে। ('এখনো')

এরপরে কিরণশংকরের আর কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি, যদিও অনেক সাময়িকপত্রে প্রায়ই তাঁর কবিতা দেখা যায়। এই সময়ে অনেক চমৎকার কবিতা লিখেছেন তিনি, আবার অনেক সাদাসিধেও। বস্তুত এই সময়টায় তাঁর প্রধান আঙ্গিক চতুর্দশপদী। বন্ধন ও মুক্তির সংশ্লেষের এই প্রকরণটি তাঁর সরল, ঋজু ও দৃঢ় চিন্তা-প্রকাশের পক্ষে খুবই উপযোগী। পঞ্চাশের বৈচিত্র্যময় পরীক্ষানিরীক্ষার ভিড়ে তাঁর এই শান্ত সাধনাটি সহজে চোখে পড়ে নি। এই যুগের অনেক কবিতায়, বিশেষত চতুর্দশপদীতে মনে হয় কিরণশংকর একটা কথাই অনেক সময় ঘুরেফিরে বলেছেন, একটা বক্তব্যই বারবার বিভিন্ন রেখায়, রূপকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। মধ্যবিত্ত সমাজ যে একটা ভিত্তিচ্যুত নিরাশ্রয় অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার জীবন যে ত্রিশঙ্কুর মত, এবং একটা কীট মুক্তোয় আলম্বিত, সে কথা তিনি কখনো ভোলেন নি। সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের একটা ইচ্ছা বারবার প্রকাশ পেয়েছে—

কখনো প্রেমকে, কখনো শিল্পকে অবলম্বন করে মুক্তি পেতে চাইছেন তিনি। এই সময়ে 'হৃদয়ের শান্তি' 'উত্তো তর্ক', 'কথা', ইত্যাদি কতকগুলি সরলীয় চতুর্দশপদী, এবং 'দিনযাপন' যুদ্ধোত্তরকালীন মধ্যবিত্তের একটি সুন্দর ছবি—যে-মধ্যবিত্ত 'দীর্ণপ্রাণ' 'ছা-পোষা মানুষ'। এখানে কিরণশংকরের সামাজিকতা সুচারুরূপে ফুটে উঠেছে। উচ্চস্বরের কোন প্রতিবাদ নেই, আক্ষেপ নেই—আছে চাপা কান্না, স্তবক-রচনায় যে-নিপুণতা দেখা গিয়েছিল আগে, সেই স্তবকের ভঙ্গি এখানে সমস্ত কবিতায় ছড়িয়ে গেছে। এর অন্ত্যানুপ্রাসের নৈপুণ্যে ও মাধুর্যে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কাহিনীকাব্যের মতই যেন কোন কাহিনীকাব্য পড়ছি। 'জোৎস্নাস্নাত অজ্ঞাত যাত্রা', 'কল্পান্তের মক্ষুসন্ধান', 'ক্লান্তি তার ক্রুদ্ধ বর্শা', 'আকাশের নীল তারা', 'বিস্মৃত প্রাণের পাত্র' ইত্যাদি অনেক সুন্দর সুন্দর অর্থবহ শব্দসমষ্টি দেখা যাবে এই কবিতায়। এখন এ এক নির্জীবতা যার সঙ্গে তুলনা চলে না উনিশ শতকের উচ্ছ্বসিত প্রাণচঞ্চল মধ্যবিত্তের, কিংবা 'কল্লোল' যুগের কিছু আগে বা পরের মধ্যবিত্তের। এখন মধ্যবিত্ত অত্যন্ত 'mediocre', কিন্তু যুদ্ধের আগে তিরিশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও সেকালের মধ্যবিত্ত-জীবনে প্রাণের এক আশ্চর্য স্ফূর্তি ছিল। সেকালের এই সময়ে দাঁড়িয়ে কিরণশংকরের অন্বেষা আজও শেষ হয় নি। উদ্যম, উদ্যোগ, আশা, সাড়া, বিস্ময়, ইচ্ছা, নাড়া, সকরুণ, আকাঙ্ক্ষা, ইশারা ইত্যাদি শব্দগুলির বারংবার ব্যবহারে প্রতীয়মান হয় যে তিনি নিরন্তর তাঁর এক অধিষ্টের প্রতি মুখ তুলে আছেন—সে অধিষ্ট প্রেম, শিল্প, পূর্ণতা :

(১) গন্ধমুক্তা হাতে নেই কণ্ঠে নেই হীরকের মালা,
বিচিত্র উদ্যম হাতে অপারোহী প্রাণের পিপাসা ;
একচক্ষু অস্বীকারে মিটবে কি নিভৃত দুরাশা
দুর্যোগে তোমাকে দিই হৃদয়ের যত অন্তর্বাসা। (পদাবলী)

(২) কী তবে আমার কাজ : অবিরাম উদ্বাসপতনে
বিদীর্ণ করান্ত কাঁপে, মধ্যবিত্ত ছা-পোষা মানুষ
আরো অনেকের মত আমিও ছুটেছি প্রাণপণে
নারী, স্বর্গ, গান ঘর, লুপ্তপ্রায় বস্তির সন্ধানে
পথে ঘাটে তেপান্তরে ; পথক্লান্ত প্রায় দীর্ণপ্রাণ। ('দিনযাপন')

বিদেশী কবিতা

শেক্সপীয়র

(সনেট : ১) : From fairest creatures we desire increase

রূপে যে অতুলনীয় তারই বৃদ্ধি চাই তো সকলে—
সৌন্দর্য গোলাপ যাতে কোনোকালে না-ঝরে মাটিতে :
অবশ্য সুপক্ক আয়ু একদিন মৃত্যুতেই চলে ।
তাই উত্তরাধিকারী খুঁজি নিত্য বৃদ্ধি ফেলে দিতে ।
কিন্তু তুমি, সংহত যে শুধু দীপ্ত নয়নে তোমার,
স্বকীয় আভার অগ্নি আত্মকারী সমিধে জ্বালাও,
প্রাচুর্যের রাজ্যে তুমি দুর্ভিক্ষের আনো হাহাকার ।
আপনি আপন বৈরী, আপনারই সর্বনাশ চাও ।
যে-তুমি রয়েছ আজ জগতের কুসুমভূষণ,
প্রাণোজ্জ্বল বসন্তের মুকুলিত প্রথম নিশ্বাস ;
নিজেরই কুঁড়ির বুকে মগ্ন রাখ যা কিছু আপন,
তবু-কি সে-কৃপণতা অপচিত করে না সঞ্চয় ?
কৃপা কর এ বিশ্বকে, নিজ যে যা তার প্রাপ্য নয় ;
হিংসা তার কালগ্রাসে যুচে যাবে কবরে তুমিও ॥

(সনেট : ২৩) : As an imperfect actor on the stage

যেমন অদক্ষ কোনো অভিনেতা মঞ্চের উপরে
ভয়ের প্রাবল্যে তার ভূমিকাকে করে বেবাক্যাস,
কিম্বা কোনো হিংস্র প্রাণী উৎপাদিত ক্রোধের শিখরে
আপন শক্তির তেজে আপনি সে হয় কম্পমান ;
তেমনি, অজ্ঞান আমি, কী-বলতে-কী-বলে-বসি ভবে

প্রেমের বচনগুলি উচ্চারণে হ'য়ে যায় ত্রুটি,
অথচ আবেগদাহে ঝিকিমিকি জ্বলি আত্মভবে
নিজেরই প্রেমের তাপে দিলে যেন ভূমিতলে মুষ্টি।
ওগো, তাই বলি শোনো, আমার দৃষ্টিই হোক বাণী,
বাক্যর মনের বোবা অভিলাষ দেখ দু'নয়নে,
প্রেমের প্রার্থনা যার সব ত্রুটি তোমাতে সন্ধানী,
জিহ্বার মূক-চিত্র নৈত্র থেকে নেয় একটি ঈক্ষণে।
ওগো, তাই পড় তুমি, শুদ্ধ প্রেমে যে-লিখন আছে!
চক্ষুতে যে শোনে, জেনো, বিদগ্ধ সে প্রেমিক সমাজে॥

(সনেট : ৪৩) : When most I wink, then do mine eyes best see

যখনি মুদোই আঁখি, দৃষ্টি যেন দেখে ভালো ছাড়ে,
কেননা সমস্ত দিন নির্বিশেষ বস্তু ভালো চোখে,
কিন্তু তন্দ্রাঘোরে তারা স্বপ্নে শুধু নিয়ত তোমাতে
অন্ধকারে রুদ্ধজ্যোতি, জ্যোতির্ময় থাকে নিষ্পলকে।
তাহলে তোমার ছায়া, ছায়াকে যা করে জ্যোতিষ্মান,
কী রূপে সে ছায়া-রূপ রূপায়িত হবে-সে নির্ভুল
যখন দিনের আলো তোমার আলোতে হবে দান।—
মোদানো মুদোখে শুধু সেই ছায়া জ্যোতিষ্কে অতুল।
বলো তো কী করে তবে আমার মুদোখে খুশি জাগে
যখন জীবন্ত দিনে তোমার ও-মুখে চেয়ে থাকি :
মৃত রাত্রি তব ছায়া অসম্পূর্ণ রূপের সংরাগে
গভীর তন্দ্রায় ঘোরে দৃষ্টিহীন স্বপ্নে দুই আঁখি।
যদি-বা তোমাকে দেখি দিনগুলি রাত্রি যে আমার ;
রাত্রিগুলি দিন, যদি স্বপ্নে দেখি তব অভিসার॥

(সনেট : ৪৪) : So shall I live, supposing thou art true

তাহলে এ ভাবে বাঁচি, এই ভেবে—তুমি প্রেমবতী,
যেমন কল্পনা করে প্রতারিত স্বামী : ওই মুখ

মনে হবে প্রেমময়, ঘটে গেছে যদিও অন্যথা,
দুচোখ এখানে কিন্তু হৃদয় সে অন্যত্র উৎসুক।
যেহেতু ও-দুটি কোনো ঘৃণা হ'তে হয় না আমিল,
পরিবর্তনের রূপ আমি তাই বুঝি না কখনো।
কতো লোক আছে যার চোখে ফোটে মনের বিভ্রম
দামী তামরঙ্গের রক্তজলের রেখায় যখন;
কিন্তু বিধি গড়েছিল তোমাকে যে এমন কৌশলে
যেন চিত্ত ভালবাসা থাকে শুধু ও-মুখে তোমার,
হৃদয়ে যা কিছু থাক চিন্তা থাক যেদিকেই চলে
দৃষ্টিতে কেবলই যেন ঝরে পড়ে মাধুর্যসম্ভার।
সাধ্য তোমার নিত্য তিলোত্তমা, যাতে ক্ষণে ক্ষণে,
মলিন সন্দীহ ছায়া ফেলে না সে রূপের দর্পণে।

(সনেট : ১৪২) : Love is my sin, and thy dear virtue hate

প্রেমই আমার দোষ, তোমার বিশেষ গুণ ঘৃণা :
ঘৃণা কর দোষ তবে, তিক্তি যার দুষিত এ প্রেমে।
শুনো, শুধু ভেবে দেখ, তুমি ঠিক সেখানে স্বাধীনা
তার তুলনায় এই দোষারোপ যাবে নাকি মেনে!
কিংবা তা না যায় যদি, বানাব কি তোমার ও-মুখে,
যেখানে প্রবাস দুটি কতোবার হয়েছে গর্হিত,
এবং অলীক সেতু প্রণয়ের বেঁধেছে কৌতুকে—
কতো-না শয্যায় তারা রাজত্বও করেছে দুষিত।
তাহলে নির্দোষ হোক আমার এ প্রেম, তুমি যথা
দুচোখে লক্ষিত কর অন্যকে, আমারই প্রতিবাসে।
হৃদয়ে যখন কর করুণা, যাতে সে ভ্রান্তমতা
তোমারই করুণা দিয়ে বিশ্বের করুণাধারা আসে।
কিন্তু আত্মপ্রসাদের যা আছে তাকেই চাও যদি,
তোমারই দৃষ্টান্তে বুঝি পাবে শুধু না-পাওয়ার ক্ষতি।

অনুবাদ : মণীন্দ্র রায়

তিনটি রুশ কবিতা

গিরিচূড়ায়

মিহাইল লের্মন্তফ

একদা রজনীতে সোনালি মেষ এক পথে যেতে
বিরাম লভিল সে বিশালকায় কোনো গিরিবুকে ;
প্রভাতে পরদিন তরুণী ধনী মেয় মনোসুখে
পলাশো আকাশের পুনীল পরশিতে যাচে মেতে ।

তবু সে দুর্গম গিরিচূড়ায় কিছু রয়ে গেল
রহিল এককণা জ্যোতির লেশ, কিছু ভালোলাগা :
রহিল একা এক দৈত্য, ভাবনার আলো লাগা,
ভাসে সে, হাওয়া হায় স্নিগ্ধ কেন, দিন হয়ে গেল ।

ঝুমোতলা চেরিশাখার দোলন

আলেক্সি তলস্তয়

ঝুমোতলা, চেরিশাখার দোলন ।
একটি মেয়ের খালি পায়ের ছাপ ।
পাশেপাশেই আরও একটি চলন—
কাঁটা মারা মুটফুতোর মাপ ।

মিলন বেলা বয়ে গেল যে কবেই ;
কেউ কোথা নেই, তবু শুনছে কান—
সেই ফিসফাস, সোহাগবচন দহই,
কলসী ফেলে পালিয়ে-যাওয়া-গান ।

মিত্তিরি গো, মিত্তিরি

আলেক্সি টলস্টয়

—মিত্তিরি গো, মিত্তিরি, শাদা পিরাণ গায়ে,
পাথর কেটে বানাচ্ছ কী ? কার লেগে ?
—এই, ঘরে যা, আস্তাবলে কো, গড়তে হবে ঠিক্-ঠিকই।
কয়েদখানা গড়তে হবে, তার লেগে।

—মিত্তিরি গো, মিত্তিরি ওলন-বত্তি হাতে,
এ নহরে কে পচবে,—কেউ কয়না কো ?
—ও বাবু-ভাই, নওকো তুমি, নওকো তোমার ভাই-বেরাদার ;
চুরিটিকে শিখতে তোমার হয় না কো।

—মিত্তিরি গো, মিত্তিরি, বলতো কে জেগে
চোখের জলে কাটাবে রাত এইখানে ?
—আমার পুতি আমার নাতি, আমার মত মিত্তিরি
এমনি ভাগ্য মোদের যে ভাই সবখানে।

—মিত্তিরি গো, মিত্তিরি, সেই কয়েদী তোমার,
কারিগরকে করবে স্মরণ, হুঁশ রাখো ?
—এই হুঁশিয়ার, বাপের ভায়া এ-কথা কইবে না কো।
সবই মোদের আছে আসা। চুপ থাকো।

অনুবাদ : মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

জাপানী প্রেমের কবিতা

স্মরণ

সে যদি বলতো :
—'ভুলে যাব',
তা হ'লে মন কী যে অভিহত
হ'ত !
বেদনা আকাশের রক্তের মতো।
কিন্তু,
সে যদি কখনো,
বলে,
—'ভুলবো না, কখনো না'
তা হ'লে ?
উঃ, কী সে যন্ত্রণা !
ব্যথায় ? না।
আনন্দের জন্মের বেদনা।

চিহ্ন

বালির পাহাড়।
ভাখো, ভাখো, পদচিহ্ন !
—কার ?
ওর,
আমার ?
চলে,
যাওয়ার ?
—যা কি—
ভালোবাসার
শব্দ, স্থির
হাওয়ায়, বালির।

অনুসরণে : বটকৃষ্ণ দে

কয়েকটি সমাধিলিপি

আর্টিফিলোস অক্ বাইজান্টিয়াম

কাল যত্ন যেমে যাবে
কাল আমি বন্দরের নিরাপদে পৌঁছব
আগামীকাল
আমি বললাম :
আর মৃত্যুও
মৃদুস্বরে উত্তর করল :
সমুদ্র তো চুম্বনেই ভরপুর।
হে পথিকবর
তরণী বাহকই ভাগ্যগণনা করে :
তোমার ঐ দুঃসাহসী কণ্ঠকে আমাও যেন উচ্চারণ না করে
আগামীকাল !

অনুবাদ : অনন্ত দাশ

শাদা ফুল

জি, এইচ, লরেন্স

কি অদ্ভুত শাদা আর অল্প এই চাঁদ : যেন একটি ডুমুরফুল মাত্র ;
আমাদার ধারে আলুসোদে হেলে পড়েছে
নিরুত্তাপ নিশীথ নিষুপ্তির উপরে :
তার লেবু-ফুলের মত তরলতা : স্বচ্ছদৃষ্টি জলের মত নগ্ন সৌন্দর্য,
সে জানছে, জানছে আমার প্রথম প্রেমের শুভ্রতা : কেমন।
নিরাবেগ যৌবনেই আমি ব্যর্থ প্রেম নিয়ে ফিরেছিলাম।

অনুবাদ : শঙ্কর রায়

ভাস্কো প্রাটোলিনি

সব হাসের পালক সাদা নয়। লেখক মাত্রই একভাবে লেখেন না, একই ছাঁচ ব্যবহার করেন না। আমরাও প্রত্যাশা করি না, শিল্পী যত্ন হোক, তার সৃষ্টি অন্যের রচনার পুনরাবৃত্তি হোক। যদি সব রাখাল একই মাঠে গিয়ে বসত তবে সেই মাঠের সীমা হত ছোট হত। জীবন নিশ্চল অত ছোট সঙ্কীর্ণ সীমিতস্বর। যাঁরা সীমানার মধ্যে না মিশ না জীবন। এর কোন নির্দিষ্ট কক্ষ নেই, নির্ধারিত ছক নেই। অঙ্কের নিয়ম, ধারাপাতের নামতা দিয়ে যদি জীবনকে ছক কাটা ঘরে ভাগ করা চলত তবে সাহিত্য এতকালে ফুরিয়ে যেত, তার নিত্য সন্ধানের সমাপ্তি হত।

আমার কাছে কোনো কোনো লেখক বিশেষ প্রিয় হলেও সব সময় এঁরাই একমাত্র লেখক এ আমি মনে করি না। পাঠকের ব্যক্তিগত স্বভাব, মনের টান, অনেক সময় তাকে খোঁড়া করে তোলে। সাহিত্যের দুই বিপরীত ধ্রুবতে দাঁড়িয়ে দুজনই হয়ত সমান কৃতিত্বের অধিকারী, কিন্তু পাঠকের খোঁড়ামি অনেক সময় উভয়কে গ্রহণ করে না। এর দ্বারা অন্য ক্ষতি কি হয় জানি না, তবে আমরা একটির স্বাদ যেমন গ্রহণ করি তেমনি অন্যটির স্বাদ সম্পূর্ণভাবে হারাই। অন্য সমস্ত খোঁড়ামির মতন সাহিত্যপাঠের খোঁড়ামিও খুব লক্ষণ নয়।

আমার এমন দৃষ্টান্তও প্রচুর, ভিন্ন পথের—ভিন্ন ধারার দুই লেখক পাঠককে সমাদরভাবে তৃপ্ত করেছে। এর কারণ বোধ হয় এই, আমরা, যারা সাহিত্যে জ্ঞাত অজ্ঞাত অনুভূত ও অননুভূত জীবনের স্বাদ প্রত্যাশা করি তারা উভয়ের কাছ থেকেই কিছু না কিছু পাই। সাহিত্যে সমগোত্র কি অসমগোত্রে কিছু যায় আসে না, একমাত্র বিবেচ্য প্রাপ্তি।

আমি পাকা পড়ুয়া নই। আমার বই পড়া খুব অগোছালো। লেখকের কুলজী বেঁধে নিয়ে উত্তম সহায় বিচার করে যাঁরা বই পড়তে পারেন তাঁদের

কথা আলাদা ; আমি অনেক সময় অন্ধের মতন ঘুঘো ঘোড়ে ঢিল ছুঁড়ি। কখনও আশাতীত পুরস্কার পেয়ে যাই, অনেক সময় অনুশোচনা করতে হয়।

ভাস্কো প্রাটোলিনি (Vasco Pratolini) নামক লেখকটিকে এই ভাবে আমি আবিষ্কার করেছিলাম। একেবারে আচমকা। সস্তা সংস্করণের বর্তমান লেখকের একটি বই কেনার সময় এর নামও আমার শোনা ছিল না। বইটি কেনার সময় লেখকপরিচিতি থেকে মাত্র এইটুকু জানতে পেরেছিলাম, ইনি ইটালির একজন ক্ষমতাশালী আধুনিক লেখক।

বইয়ের মলাটে প্রায় সব লেখকই 'ক্ষমতাশালী' এবং 'আধুনিক'। মলাটকে বিশ্বাস করে ঠকতে হয়েছে বহুবার, কাজেই ওই দু চারটি কথায় খুব আশ্বাস পেয়েছিলাম পরে, বইটি পড়ার পর।

'এ হিরো অফ্ আওয়ার টাইম' প্রাটোলিনির প্রথম বই যা আমি পড়েছি ; পরে পড়েছি তাঁর 'দি নেকেড্ স্ট্রীটস্'।১

বাঙালী পাঠক মহলে প্রাটোলিনির লেখার কদর হয়েছে বলে জানি না। হবার কথাও নয়। তিনি বিদেশে ভাষান্তরে অনূদিত হলেও প্রকাশকরা তাঁর বই নিয়ে কখনও মাতামাতি বোধ হয় করতে পারেন নি, মোরাভিয়ার বেলায় যেমন দেখেছেন। কিন্তু আমার ধারণা, প্রাটোলিনি শুধু উত্তম শ্রেণীর লেখক নন, তাঁর রচনা নানা কারণে পাঠকের মনোযোগ দাবী করে।

প্রাটোলিনি ইটালির একটি সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। 'নিও-রিয়ালিজম্' যদি ইটালির সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে আসন পেয়ে থাকে, প্রাটোলিনিকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান না দিয়ে উপায় নেই। 'নিও-রিয়ালিজম্' কি, তার কোনো যথাযথ ব্যাখ্যা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। আমি

---

১ প্রাটোলিনির বই আমেরিকা এবং ইংলণ্ড উভয় দেশেই অনূদিত হয়েছে ; রাজসংস্করণ এবং দীন সংস্করণ দুইই বেরিয়েছে। হয় প্রকাশক, না হয় অনুবাদক একই বইয়ের নাম নিজের নিজের প্রকাশকালে বদলে নিয়েছেন ; 'এ হিরো অফ্ আওয়ার টাইম' বিলেতে 'এ হিরো অফ্ টুডে' নামে প্রকাশিত। 'দি নেকেড্ স্ট্রীটস্'-এর রাজ সংস্করণের নাম 'এ টেল অফ্ সান্টা ক্রোচে।'

অভাবধি এই শিল্প-তত্ত্বটির সম্পর্কে কিছু পড়িনি। কিন্তু প্রাটোলিনির লেখা থেকে অনুমান করতে পারি।

সম্ভবত যুদ্ধোত্তর ইটালির বিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে এর উদ্ভব। দৈন্য এবং দুঃখতা, মানুষের অসহায় অবস্থা এবং তার পশুসুলভ প্রাণের তাপ থেকে এর সূত্রগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে বলে মনে হয়। নিও-রিয়ালিজমের আদর্শ বোধ হয় বাস্তবকে যথাযথ প্রতিফলন করা নয়। এমন কি একদা যে স্বাভাবিকতার চল হয়েছিল সাহিত্যে শিল্পে সেই উগ্র স্বাভাবিকতাও নয়। প্রাটোলিনির লেখা কোথাও উগ্র স্বাভাবিকতায় শ্রমপুষ্ট নয়, কখনও মনে হয় না তিনি বস্তুজগতের কাছ সাগিয়ে দুঃসহ করে দেখেছেন এবং পাঠককে পরিবেশন করছেন।

লেখকরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মায়াজালে জড়ান। বস্তুজগতের প্রতি দুর্বলতা বশত কেউ কেউ অতি বাস্তব; বাস্তব-রহিত হলে অতি কল্পনা। নিও-রিয়ালিজম্ এই দুই শিবিরকেই ত্যাগ করেছে। লেখক কোথাও মায়া-জালে জড়াবে না, না বস্তুতে না অতি-কল্পনায়। তার আদর্শ 'ডকুমেন্টারী' হওয়া নয়, বাস্তবের প্রতি অতি আসক্ত হওয়া নয়, সমাজের হয়ে চাঁদা সংগ্রহ দুর্বিনীতের চরিত্র সংশোধনের জন্যে আশ্রম খোলা, বিপ্লবের ভেরী বাজানোও নয়। এমন কি বুদ্ধির নিশানা শানিত করে বর্তমান জগত ও মানব অবস্থার কোনো দার্শনিক তত্ত্ব আবিষ্কারও নিও-রিয়ালিস্টের আদর্শ নয়।

তবে আদর্শ কি? আমি যা। অনুমান করি, এরা মানব-আচরণকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে চান। মোহকে বর্জন করেন। বাস্তবের মোহ এক দিদিস, বাস্তবের দর্শক হওয়া অন্য দিদিস। সাধারণত শিল্পীর পক্ষে পক্ষপাতিত্ব, এ-প্রান্তে কি ও প্রান্তে, পরিমাণে কম বেশী, অবশ্যম্ভাবী। এঁরা—নিও-রিয়ালিস্টরা এই পক্ষপাতিত্বের প্রলোভন থেকে মুক্ত থাকতে চান। বস্তুত জগৎ কিংবা মানুষের হৃদে আত্মপ্রকাশে বিরত থাকাকে এঁরা শিল্পীর ধর্ম বলে মনে করেন। জীবনের বিচিত্র রূপকে এই সংসারের অন্যতম স্বাভাবিক প্রবাহ বলে স্বীকার করলে সেই প্রবাহে শিল্পীর নিরুদ্বেগ উপস্থিতিই সত্যকে পরিস্ফুট করে, অসত্যকে নয়।

'এ হিরো অফ আওয়ার টাইম' লিখিত ইটালির অসাধারণ চিত্র। আমরা, যারা গত যুদ্ধের সময় থেকে এ-যাবৎ বর্তমান তারুণ্য থেকে যৌবনে উপনীত

হওয়ার দিকে সবিস্ময়ে ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি, এই বাংলা ছেলেই, 'এ হিরো অফ আওয়ার টাইম' যেন তারই সমগোত্রীয় চিত্র। পাঠক হিসেবে, ইটালির এই যুগধর্মের নায়ককে দেখে আমি বিভ্রান্ত বোধ করেছি। যাকে পর তাষায় যথার্থ 'হীরো' বলে, আমরা বলি 'নায়ক'—তেমন নায়ক এই গ্রন্থের নায়ক। অপরার্থ অশিক্ষিত অমার্জিত এক তরুণ এবং জনৈক যুবতী বিধবার প্রেমকে যদিও এই উপন্যাসের উপজীব্য করা হয়েছে, তবু প্রেমই এই উপন্যাসের প্রধান বিষয় নয়। বরং নায়কের চতুর খল মন, কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, পাশবিক আসক্তি, নীতিবোধের সুপ্ততা অবর্ণনীয় নির্মমতাই এ যুগের নায়ককে পূর্ণাঙ্গ চরিত্র দিয়েছে। এমন চরিত্র কল্পনাতীত। কিন্তু সত্য। তার কাছে বিবেক, প্রেম, মানসিক দুর্বলতার প্রশ্ন নেই। মনে হয়, সমস্ত ইটালি থেকে যেন এই সব স্বাভাবিক মানবগুণ আজ অন্তর্হিত, পশুর মতন কিছু দুর্ধর্ষ বালক বেড়ে উঠেছে—যারা এই যুগের নায়ক, আমাদের নতুন সংসদের।

ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণকে হয়ত এখানে দেখা যায়। অনুশোচনা করা সহজ হয়। দারিদ্র্যে অশিক্ষায় দুঃখের পোড়া-জমিতে যারা বর্ধিত হচ্ছে আগাছার মতন তারা অভিযোগ করে। মানব নীতির কোনো মূল্যবোধ এই যুগকে কাতর করে না। তার কি যেন নেই। পশুসম এক প্রাণ এদের মধ্যে ভীষণ জাগছে, যে-প্রাণে আদিমতার লক্ষণ প্রকট, যার ক্ষুধা স্বাভাবিক মানুষের মত।

আমি সবিনয়ে স্বীকার করব, এমন নায়কের জীবনের প্রতি আমার সহানুভূতি এসেছে। কেন এসেছে আমি না, হয়ত এই দুর্বলতা বোধ করবি যে, এই ছেলেটি অন্তত একটিবার তার বিবেকের মুখোমুখি হোক। অন্তত শেষ পাতায় এসে দেখতে চেয়েছি সেই ফাঁকা পার্কে অসহায় বিধবা যুবতীর প্রতি—সেই প্রেমের প্রতি নায়ক একটু সৎ হোক, মানবোচিত গুণের প্রকাশ ঘটুক। আমার প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি। শয়তান বিন্দুমাত্র করুণা করে নি, বিবেককে পথ আগলে দাঁড়াতে দেয় নি, পার্কের লোহার শিকলের কলায় যুবতী বিধবাকে হলদায় ঝুলিয়ে এসে হত্যা করেছে দুঃশাসনের মতন। এমন অভিজ্ঞতা ভয়াবহ। কিন্তু স্বীকার করব, নায়কের চরিত্র এত বীভৎস হওয়া সত্ত্বেও যথার্থ। যথার্থ মনে হয় এই কারণে যে, সে তার স্বধর্মে চালিত হয়েছে। লেখক কোথাও শয়তানকে মানুষ করার চেষ্টা করেন নি। কিংবা তার চেয়েও সত্য হল, লেখক সম্পূর্ণ নিরাসক্তের মতন একটি শয়তানকে তার মতন করে

বেড়ে উঠতে দিয়েছেন। এর দ্বারা আর কি প্রমাণিত হয় আমি জানি না, কিন্তু শিবগাছের ডাল থেকে গাছ হলে সেই গাছ যে তিক্ত নিমবৃক্ষ হবে এই সত্য এবং যুক্তি প্রমাণিত হয়।

অনেকবার আমি ভেবেছি, লেখক কি এত অকরুণ হতে? তার মন কি এত নৈর্ব্যক্তিক হতে পারে? সম্ভবতঃ পারে। জীবনকে দেখার নয়ন দৃষ্টিকে স্বচ্ছ এবং মোহহীন করতে পারলে বস্তুজগৎকে তৃতীয় পক্ষ হয়ে দেখা যায়। সাধারণতঃ যা আমরা করি না।

'দি সেকেণ্ড ষ্ট্রীট' লেখকের নিজের খুব প্রিয় বই। প্রিয়, কেননা—উপন্যাসের আখ্যানে লেখকের নিজের কৈশোর কালের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা রয়ে গেছে। ফ্লোরেন্সের এক দীন অঞ্চল এই কাহিনীর পটভূমিকা। পাত্র পাত্রীরা সকলেই 'অপ্রাপ্তবয়স্ক', কেউ কিশোর কেউ বা তরুণ। ওদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওই এলাকার সমবয়সী কিশোরীরা। ফ্লোরেন্সের সেই এলাকাই এদের জগৎ, তার বাইরে কি আছে কারা আছে তাদের জানা নেই। না থাক জানা, দুঃখও কেউ করে না। করার অবকাশ কই। দারিদ্র্য অশিক্ষা দিন মজুরি করে জীবন ধারণ। তবু এই ছেলেমেয়ের মধ্যে একটা হৃদয়ের সম্পর্ক তাদের একত্র করে বেঁধে রেখেছে, এক সুখে একই দুঃখে।

আমরা যাকে বলি বয়ঃসন্ধি—সেই সন্ধির কাল থেকে এদের বয়স্কতা প্রাপ্তি পর্যন্ত যে মানস বিবর্তন, 'দি সেকেণ্ড্ ষ্ট্রীট'-এ সেই বিবর্তনের কাহিনী ধরা হয়েছে। এখানে কেউ একা নায়ক নয়, কোনো একটি বিশেষ নায়িকা নেই—সম্মিলিত ভাবে একদল ছেলে মেয়ে নায়ক নায়িকার ভূমিকা নিয়েছে।

যে স্পর্শ লেখাকে জীবন্ত করে, এই উপন্যাসে তার স্পর্শ সর্বত্র। আন্তরিকতা এবং স্মৃতির সৌরভে বহুদল গঠিত কুসুমের মতন উপন্যাসটি যেমনি মাধুর্য সকল করে ফুটে উঠেছে।

কোন মানুষই চিরকাল শিশু থাকে না। কিশোর আর তারুণ্যের চপল দিনের পর যৌবনের সীমায় পা দিয়ে মানুষ নানা বিচিত্র সমস্যার মুখোমুখি হয়। ফ্লোরেন্সের সেই ছোট্ট সীমাহীন পাড়ার ছেলেমেয়েরা এক সময় অনুভব করতে পারে জীবন এবং জগৎ অনেকটা যেন বাড়িয়ে গেছে। সেই বৃহৎ জগতে তাদের সমস্যাও বিচিত্র। কেউ প্রেম চায়, কেউ ভোগ চায়: কারও কাছে জীবনের অর্থ কোনো আদর্শকে আঁকড়ে ধরা, কেউ বা জীবন সম্পর্কে

বিশ্বাস (I will never be anything but a poor good-for-nothing bastard, its the way I am made) হয়ে ঘুরে চলে যায়; কেউ মানসিকভাবে পীড়িত, জেলখানার অবশেষ এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে' জীবনের সমাপ্তি ঘটায়।

একবার সেই বীমজনের পাড়া নগরের পরিবর্তনে চেহারা বদলে ফেলে। যত্তি আর ভাড়া বাড়ির ঘুলোয় সত্যতার ইমারত গড়ে উঠছে, যারা আত্মীয় ও বন্ধুত্বের বন্ধনে একদময় এক হয়ে ছিল তারা আজ জীবনের নানা পথে ছিটকে চলে গেছে, কেউ রাজরোষে বন্দী, কেউ যুদ্ধে মৃত, কেউ বা সৈন্য-শিবিরে শিক্ষানবিশীর পালা শেষ করে সভ্য ফিরেছে।

তবে কি সেই পুরোনো দিন—যা মনে হত যাদের ঘাটে দিয়ে নদীর প্রবাহের মতন বয়ে যাচ্ছে—সেই দিনের আর কোনো অবশেষ নেই? বইয়ের শেষে মারিসা বলেছে: "তুমি দেখেছ সেই পুরোনো পাড়া বদলে গেছে; না কি? কিন্তু আজও এখানে সবাই আছে, ভুলো না, আমরা সকলেই এখানে রয়েছি।"

আর কিছু যারা চলে গেছে তারা? তারা সতেজ বাতাস আর রোদের জন্য বাইরে চলে গেছে। কিন্তু তারাও খুব সুখে নেই।

অথচ বাতাস আলো দরকার। জীবনের জানলা চারপাশে বন্ধ হয়ে থাকবে এমন আর চাই না। ওটা প্রয়োজনীয়—ওই রোদ বাতাস, খুলে যাক। ওটা সহ্য নিতে হবে।

প্রাটোলিনির লেখার সব চেয়ে বড় গুণ আন্তরিকতা। এর সৌন্দর্য বাইরে নয়, সকল সোনা চালাবার কারিকুরিতে ব্যাহত না। কিন্তু যে-বাস্তব সত্য, যার গ্লানি এবং পীড়া মানুষকে অহরহ সহ্য করতে হচ্ছে, সেই বাস্তবের সূক্ষ্মতম দিকেও ওঁর নজর রয়েছে।

তা ছাড়া, আধুনিক ইটালিয়ান লেখকদের মধ্যে সিলোনে-কে বাদ দিলে, আমার ধারণা, প্রাটোলিনি অপেক্ষা সমাজসচেতন লেখক বোধ হয় আর কেউ নেই। প্রাটোলিনি প্রায় সম্পূর্ণ জীবনকেই বরবার চেষ্টা করেন, মানুষের সমস্ত বৃত্তি এবং আবেগকেই। কেউ যদি বলেন, বিউটি অ্যান্ড দি বিস্ট ঘুরেফিরে পালা ওঁর হাতে সমান ভেসে আসি আপত্তি করব না। জীবনে ফুলের ঘ্রাণ এবং পশুর আঁচড় দুইই সমভাবে রয়েছে।

বিমল কর

কয়েকটি রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংকলন

বিশ্বভারতী পত্রিকা : রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা। সম্পাদক : সুধীরঞ্জন দাস। শ্রীতবিতান পত্রিকা : অষ্টম সংখ্যা। সম্পাদক : প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত। The Wayfaring Poet : A Dunlop Tagore Centenary Publication.

গ্রন্থ প্রকাশনার দিক থেকে ১৩৬৮ সালটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ বৎসর। রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি বৎসর হিসাবে এবছর বহু গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্র প্রতিভার বিকাশও বহুমুখী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বিভিন্ন দিকে তাঁর সৃজনশীল প্রতিভাকে প্রসারিত করেছিলেন—তাঁকে তাঁর পরি-ব্যাপ্ত সৃষ্টির পূর্ণ মূল্যায়ন সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রসাহিত্যের পর গ্রন্থ প্রকাশনা, তাঁর আলোচনা এই পূর্ণতাকে হৃদয়ঙ্গম করবার বিভিন্ন প্রকরণ মাত্র।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিক-পূর্তি বৎসরে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে আলোচ্য সংকলনগুলির মধ্যে রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ সংস্করণ শ্রীতবিতান সংগীত সোসাইটির রবীন্দ্র-জন্ম-শতবর্ষপূর্তি প্রকাশন 'শ্রীতবিতান পত্রিকা', 'বিশ্বভারতী' পত্রিকা' ও 'The Wayfaring Poet'; তৃতীয়টি ডানলপ কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, শিক্ষা, ভ্রমণকাহিনী যেকোন দিকে তাকান যাক না কেন, সেদিকেই রবীন্দ্রনাথ একতারার মতো একনিষ্ঠ পথপ্রদর্শক। সেকারণে শতবার্ষিকী বৎসরে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে এরূপ নানা বিষয়ে গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্বভারতী পত্রিকার বর্তমান সংস্করণটি বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, পত্রিকাটির সুরে অভিনবত্বের ছোঁয়া বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সাজাতে গিয়ে কবির নিজেরই রচনাকে উপাচার হিসাবে সামনে তুলে ধরেছেন এই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ। রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক সাহিত্যকীর্তির

বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত আলোচনার দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে উপলব্ধির গতানুগতিক এই পন্থা থেকে বিরত হয়ে আলোচ্য পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই পদার্পণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রচনা ও তাঁর অঙ্কিত চিত্রাবলী এবং তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বে তাঁর আলোকচিত্রের প্রতিলিপি দ্বারা ভূষিত এই পত্রিকাটিতে রবীন্দ্রনাথকে খোঁজবার চেষ্টা করা হয়েছে তাঁরই রচনার মাধ্যমে।

মূলতঃ এই পত্রিকাগত আদর্শকে স্মরণে রেখে হস্তাক্ষরে তাঁর রচনা পরিবেশনে কর্তৃপক্ষ মনোযোগী হয়েছেন; কারণ হাতের অক্ষরের মাধ্যমে কবির ব্যক্তিগত পরিচয়ও কিছুটা পাওয়া যায়। বস্তুতপক্ষে কবির ব্যক্তিগত অভিমত তাই। আলোচ্য পত্রিকাটিতে কবির যে লেখনগুলি হাতের অক্ষরে ছাপা হয়েছে তার ভূমিকায় কবি নিজেই বলেছেন যে "এই টুকরো লেখাগুলির প্রধান মূল্য হাতের অক্ষরে, ব্যক্তিগত পরিচয়ের, যে পরিচয় কেবল অক্ষরে নেই, ক্রটলিখিত ভাবের মধ্যেও ধরা পড়ে। ছাপার অক্ষরে সেই ব্যক্তিগত সংস্রবটি নষ্ট হয়—সে অবস্থায় এই সব লেখা বাড়ি-মেরা টীন সষ্টমের মতো হাল্কা ও ব্যর্থ হতে পারে। অযত্নকৃতায় কাটা-কুটির ভাব এটিতেও ব্যক্তিগত পরিচয়েরই আস্বাদ থেকে যায়।"

রবীন্দ্রনাথের বিপুল রচনাসম্ভার থেকে পাণ্ডুলিপির কয়েকটি পাতা এখানে তুলে ধরা হয়েছে, তা থেকে পাঠকেরা সহজেই রবীন্দ্রনাথের লেখার আঙ্গিকের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন। প্রকাশিত এই লেখনগুলি ছাড়া আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ দুজনের একনিষ্ঠতার কথা ঘোষণা করে। বিজ্ঞানের আসরে প্রফুল্লচন্দ্র যেমন ছিলেন একনিষ্ঠ সাধক, সাহিত্যের আসরে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন তেমনি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীতে এই চিঠিটির প্রকাশ খুবই সময়োপযোগী ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার যথার্থ নিদর্শন।

শিল্পী রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত কয়েকটি মূল্যবান চিত্রের প্রতিলিপি উল্লেখযোগ্য। জীবনের বিভিন্ন পর্বে কবির আলোকচিত্রের কয়েকটি প্রতিলিপি আলোচ্য পত্রিকাটির অন্যতম সম্পদ। এই প্রতিলিপিগুলি বিভিন্ন অবস্থায় ও পরিবেশে কবিজীবনকে জানার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে। রচিত কয়েকটি নাটকে কবির অভিনয় ঘটনার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ—তাই অভিনয়ের আলোকচিত্র কবির নাট্যপ্রতিভার দিকটি উদ্ভাসিত করে।

পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে ও পরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে তোলা কয়েকটি আলোকচিত্র কবির ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ করে তোলে। মুদ্রণ এই পত্রিকাটির মুদ্রণ পরিকল্পনা রুচিবান যে কোন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

'গীতবিতান' পত্রিকাটি সত্তবার্ষিকীতে প্রকাশিত অন্য একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সত্তবার্ষিকীর অন্যতম কর্তব্য হিসাবে এর প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন গীতবিতান নামক বিশিষ্ট সংগীতসংস্থা।

সংগীতগোষ্ঠীর পত্রিকা বলেই বিশেষ করে পত্রিকার কর্তৃপক্ষ আলোচ্য পত্রিকায় রবীন্দ্র-আলোচনা সংগীত ও নৃত্যনাট্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, এ ছাড়াও কবির স্মৃতিচারণ করে কয়েকটি রচনাও এই পত্রিকায় স্থান পেয়েছে।

পত্রিকার উদ্দেশ্য আলোচনাকালে পত্রিকা-সম্পাদক বলেছেন যে রবীন্দ্র-নাথের বহুমুখী প্রতিভার কয়েকটি নির্দিষ্ট সরণিধারার মধ্যেই গ্রন্থের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের সংগীত নৃত্য নাট্য সম্পর্কিত আলোচনা ও রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে তথ্যমূলক স্মৃতিকথা আলোচ্য পত্রিকায় পরিবিষ্ট করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সংগীত-নৃত্য-নাট্য সংক্রান্ত আলোচনামূলক প্রবন্ধগুলির মধ্যে আমার বেশী জোর দেওয়া হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানের উপরে। রবীন্দ্রসংগীতের বিরাট ব্যাপ্তি ও তার বৈচিত্র্য প্রত্যেক সংগীত শ্রোতাকেই বিস্মিত করে। রবীন্দ্রসংগীতের এইরূপ রসবৈচিত্র্যের মূল্যায়ন নিরূপণে ব্রতী হয়েছেন বিশিষ্ট লেখকেরা।

ভারতীয় সংগীতের ছন্দোচিন্তা ও রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে রাজ্যেশ্বর মিত্র সংগীতে ছন্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সংগীতে কোন শাসন মানার পক্ষে ছিলেন না, কারণ শাসনের অভাবে সংগীত স্বাধীন বিকাশ লাভ করতে পারে না। অন্য একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সংগীত সমালোচনার ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন শ্রীমতী সাধনা বসু। তার মতে রবীন্দ্রনাথের এ আলোচনা রসজ্ঞের রসাস্বাদনজাত; তিনি সংগীতের বিচার বিশ্লেষণ করেছেন প্রকৃতি ও প্রয়োজনের দিক থেকে। সংগীতের রূপরস গতি প্রকৃতি, দেশের বিভিন্ন গীতের পার্থক্য, বিদেশী সংগীতের বহিঃ ও অন্তর-রূপ: এই হচ্ছে তার আলোচনার বিষয়। প্রফুল্লকুমার দাস

'গীতাঞ্জলির গান' প্রবন্ধে গীতাঞ্জলির গান রচনার যুগকে এক বিশেষ সন্নিবেশ বলে বর্ণনা করে' গানগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন।

নৃত্যনাট্য আলোচনা কালে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার নাটকগুলিকে আঙ্গিকের দিক থেকে অপেরাটিক বা সংগীত ও নৃত্য প্রধান বলেছেন। অমিয় চক্রবর্তী, হিরণ সান্যাল ও প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের লেখাগুলিও উল্লেখযোগ্য।

পত্রিকাটির 'স্মরণ' অংশে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি অপ্রকাশিত ও অন্যান্য চিঠি প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত তার জীবিতাবস্থায়ই হয়েছিল। রবীন্দ্রপরিচয় সভা প্রবন্ধে সেই আলোচনার প্রকৃতি ও এই সভাটির ইতিহাস সম্বন্ধীয় বহু তথ্যের আভাস দিয়েছেন প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত। রবীন্দ্রপরিচয় সভা ছিল আশ্রমের সংস্কৃতি জীবনে সর্বসাধারণের প্রথম সম্মিলিত সেবাকারী সংস্থা। আশ্রম জীবনের স্মৃতিকথা ও রবীন্দ্রসাহিত্যের সংগীত ও নাট্য আলোচনার বিভিন্ন দিক ছাড়াও এই পত্রিকাটির অন্য বিশিষ্ট আকর্ষণ কবির দুটি গানের অপ্রকাশিত স্বরলিপি। কবিতনয় একটি সুন্দর আলোকচিত্র ও নন্দলাল বসু ও সুধীরচন্দ্র সেনের স্কেচ অন্যতম আকর্ষণ।

পথের প্রতি কবির ছিলো এক নিগূঢ় আকর্ষণ—ঘরের থেকে পথই তাঁকে গভীর ভাবে টেনেছিল। 'আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ'—পথচলার আনন্দে কবির ভ্রমণ কথাতে সমৃদ্ধ The Wayfaring Poet সেই আলোচ্য গ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন। এইসব দেশ ভ্রমণকালে সেদেশের লোক ও তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে কবির পরিচয় মিলিত হয়। বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার ভিন্ন—রবীন্দ্রনাথ তা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছেন ও তার পরিচয় লিপিবদ্ধ করে গেছেন বিভিন্ন চিঠিপত্রে ও কয়েকটি প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিপত্র ও ভ্রমণ সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি বর্ণনার অভিনবত্বে ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য সম্পদ-রূপে গণ্য হয়েছে। শুধুমাত্র তথ্যগত বর্ণনাই নয়—কল্পনা ও কবিত্বের সমন্বয়ে এই রচনাগুলি উৎকৃষ্ট ভ্রমণ সাহিত্য-রূপে সর্বকালে স্বীকৃত হবার যোগ্য। The Wayfaring Poet বইখানির মূল সুর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেমিক মন, যা তাঁর বিস্তৃত দেশ ভ্রমণ থেকে সদাই উৎসারিত। রবীন্দ্রনাথ অনেক দেশ দেখেছিলেন, জগতের বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সংস্কৃতির এই মেলা পথিক রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ

করেছিলো। তাই বাইরের বিরাট জগতের আহ্বান যখনই এসেছে, কবি কোনদিন সাড়া দিতে ভোলেননি। রবীন্দ্রনাথের এই সুদীর্ঘ ভ্রমণপঞ্জী, যা তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর বিভিন্ন চিঠিপত্রে ও ডায়েরীতে, তা থেকেই প্রয়োজনীয় কিছু উদ্ধৃতি নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে এই গ্রন্থটি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম ইউরোপ ভ্রমণ ১৮৭৮ সালে তাঁর বড়দা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে। এর আগেও তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে হিমালয় প্রদেশে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ যাত্রা করেছেন সাতবার। রাশিয়া ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন কয়েকবার। চীন জাপান ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশও পরিভ্রমণ করেন। জাপানের অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য, তাদের সৃষ্টিশীলবোধ কবিকে মুগ্ধ করেছিলো। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ অভ্যর্থনা জানিয়েছিল তাঁকে সাদরে। সেই ডাক কবিকে বিশ্ব-আত্মীয় ও বিশ্ব মৈত্রীর বাণী প্রচার করিবে দিয়েছিল।

পথের প্রতি কবির এই আকর্ষণ কোথাও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। কারণ পথের প্রান্ত কবির তীর্থ নয়, পথের মধ্যেই তার নেশা। নতুন পথের ইশারায় কবি বারবার বাইরে বেরিয়ে পড়েন—তবু পথিক রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ, 'বিপুলা এই পৃথিবীর' কতটুকুই বা তিনি জেনেছেন!

পথের সঙ্গী রবীন্দ্রনাথের এই আজীবন পথযাত্রা—এই সুরটিই ঝঙ্কৃত হয়েছে এই গ্রন্থে নানা উদ্ধৃতি ও ছোট ছোট কবিতার মাধ্যমে। সুদৃশ্য গ্রন্থখানির আরেকটি মূল্যবান সম্পদ রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রঙীন চিত্র। বিভিন্ন আরসার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে তোলা রবীন্দ্রনাথের এই ছবিগুলি গ্রন্থটির আকর্ষণীয়তাও যথেষ্ট সাহায্য করেছে। যথাযথ অনুবাদগুলিতে মূল রচনার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে। অনুবাদ করেছেন বিষ্ণু দে, সমর সেন, হিরণকুমার সান্যাল, প্রভাত গুহ, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, জি, পি, গাঙ্গুলী ও টগর হক।

ভারবি কোম্পানীর এই প্রকাশনটি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের যে-দিকটির প্রতি আলোকপাত করে, তা ঠিক এই ভাবে পূর্বে আর প্রকাশিত হয়নি। তাই ভারবির এই অভিনব পরিকল্পনাটি যে রুচিবান পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রকাশিত গ্রন্থটির জন্য সমগ্র দেশবাসীর কাছে তাঁরা অকুণ্ঠ ধন্যবাদ অর্জন করবেন।

কমলকান্তি ভট্টাচার্য

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র শতবার্ষিক বাংলা-সাহিত্য সম্মেলন

বেশ কিছুকাল পূর্বে শ্রীযুক্ত অমদাশংকর রায় এবং শ্রীমতী লীলা রায়ের প্রচেষ্টায় এবং বিশ্বভারতীর অন্যান্য উৎসাহী কর্মীদের সাহচর্যে শান্তিনিকেতনে বাংলা সাহিত্যের (উত্তর বাংলা) একটা হিসেবনিকেশ হয়ে গিয়েছিল। সেই সাহিত্যমেলার পর এবার রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব হিসেবে বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাস ও বিশিষ্ট কবি শ্রীঅশোকবিজয় রাহার আহ্বানে বাংলাদেশের বহু সাহিত্যিক আবার শান্তিনিকেতনে মিলিত হয়েছিলেন। এ মিলন দানাদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। যে অদ্ভুত সাড়া ও প্রাণবন্ত আবেগ সম্মেলনের কয়েকদিন আমরা লক্ষ্য করেছি তার মূলে ছিল সেই আশ্চর্য মানুষটির আত্মিক উপস্থিতি, যিনি একদা বাঙালীর হয়ে তাকে সৃষ্টি করেছিলেন, ভারতবাসীর হয়ে সংস্কৃতির নূতনতর অর্থ আরোপ করেছিলেন এবং সর্বমানবের জন্য নব মানবতন্ত্রের দীক্ষা দিয়েছিলেন।

বলাই বাহুল্য, এজাতীয় সম্মেলন নিছক এ্যাকাডেমিক হতে পারে না, শান্তিনিকেতনের উদার আকাশে যে শিক্ষা আমরা লাভ করি তা মৈত্রীবন্ধনের। 'সহিত' অর্থে সাহিত্যের যে ধারণা রবীন্দ্রনাথ আমাদের শুনিয়েছিলেন সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এই সাহিত্য সম্মেলনের তাৎপর্য। এখানকার উন্মুক্ত প্রকৃতিতে অবাধ স্বাধীনতার প্রাণ খুলে মেলামেশায়, কাব্যসাহিত্যের চিন্তনে ও পরস্পরের সাহিত্য-অনুভূতির যোগসূত্রে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সম্ভবত তা ঐ কয়েকদিনের আনুষ্ঠানিক প্রবন্ধপাঠের চেয়ে বেশী মূল্যবান। এর বিভিন্নস্তরে আমরা একটা চলমান সাহিত্য সংস্কৃতির রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলাম, উত্তর বাংলার অন্তর্নিহিত শুদ্ধাবেগের প্রমাণ পেয়েছিলাম, অনুভব করেছিলাম সাহিত্য যে-জীবনকে কেন্দ্র করে বিরচিত হয় তা শুধু সামাজিক মানুষের নয়,

চারিদিকের আলোর সাতাসে জলে যাওয়ায় যেতে-ওঠা প্রাণের, সেনকালের সত্তী যার সীমারেখা কখনো টানতে পারেনি।

শ্রীযুক্ত অন্নদাশংকর রায় 'আধুনিক যুগ ও রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে যে রচনাটি পাঠ করেছিলেন তা তাঁর বহুদিনের চিন্তাভাবনার ফল। এমন একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধের জন্য তিনি সকলের ধন্যবাদার্হ। 'পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ' এ প্রবন্ধের নিজস্ব একটি মনোজ্ঞ দিক তুলে ধরেছেন। গোপাল হালদার-এর 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার ঐতিহ্য' প্রবন্ধে তথ্যের সঙ্গে মননশীলতা যুক্ত হয়েছে, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের ছবি' একটি প্রবীণ শিল্পীর ব্যক্তিগত অনুভূতির ফলস্বরূপ। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ও রাজ্যেশ্বর মিত্র সঙ্গীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অবদানকে যথাযথ তুলে ধরেছেন। শান্তিদেব ঘোষের রচনায় চাইতে মৌখিক ভাষণ অনেক বেশ জনগ্রাহ্য হয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচনাটি সবচেয়ে ছোট হলেও সংবেদনায় উজ্জ্বল। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'চির অশান্ত' রবীন্দ্রনাথের এক অপরিচিত অধ্যায়ের প্রতি লেখকের আলোকপাত, একটি অসামান্য রচনা বলে আমার নিজের মনে হয়েছে। কুমার কাজী মোতাহার হোসেনের প্রবন্ধটি 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নাট্য সংগীত' উদ্ধৃতি কণ্টকিত ও তথ্য ভারাক্রান্ত হলেও মনিষ্ঠ ও সংবেদনশীল। এছাড়া শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, শশিভূষণ দাসগুপ্ত, লীলা মজুমদার ও জগদীশ ভট্টাচার্য প্রবন্ধ পড়েছেন। প্রতিদিনই প্রবন্ধপাঠের শেষে উপস্থিত সাহিত্যিক-গণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। আলোচনার সময় অল্প ছিল, তার উপর পূর্বপ্রস্তুতি না থাকায় অনেকে কিছুটা বিব্রত বোধ করেছেন, তবুও কয়েকজনের আলোচনা তারি মধ্যে চিন্তার উদ্রেক করেছে। হিরণকুমার সান্যাল, কাজী আবদুল ওদুদ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুশীলচন্দ্র সরকার, অবনীভোষ দত্ত এবং আরো অনেকে তাদের চিন্তাভাবনার কথা বিশদভাবেই জানিয়েছেন। সম্মেলন শেষে কবিতাপাঠের আসরে উপস্থিত কবি সকলেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনীশ ঘটক, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জগদীশ ভট্টাচার্য, সুশীল রায়, বাণী রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুশীলচন্দ্র সরকার, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, নাবেদ আলী, সজনীকান্ত দাস, অন্নদাশংকর রায়, অশোকবিজয় রাহা এবং বর্তমান লেখক স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান।

অরুণ ভট্টাচার্য

হারা মেঘের কেতা

[টুকরো কবিতাগুলি বিভিন্ন ব্যক্তিকে নিয়ে লেখা। প্রথম দুটি কবিতা বাদে অন্যান্য সমস্ত কবিতাই ১০ থেকে ১২ই মাঘ, রবীন্দ্রশতবর্ষ সাহিত্যসেমিনার শান্তিনিকেতনের পরিবেশ নিয়ে রচিত। কয়েকটি কবিতা ঐ সময়েই লেখা। প্রথম দুটি কবিতার লেখক পরিচিতি সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ নই। অপর কবিতাগুলির পাশে রচয়িতার নাম দেওয়া হ'ল। নামহীন অন্যান্য কবিতা সংগ্রাহকেরই লেখা হ'লে ধ'রে নিতে হবে।] [সংগ্রাহক]

অশোকবিজয় রাহা

আহা !' [অজ্ঞাত ?]

সৌরেন বাগ

জাগ্ !! [অজ্ঞাত ?]

বীরেন চট্টোপাধ্যায়

কাহার সাধ্য বাদ সেধ !

চট্টোপাধ্যায় বীরেন

সর্বদাই ফিরেন ॥ [বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী]

সমরেশ বোস

নেই কোন দোষ ॥ [সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়]

অরুণ ভট্টাচার্য

কেবল করেন কার্য ;

কী ভয়ানক আর্য !! • •

শ্রীমান সমরেশ

পড় লেখেন বেশ

পড় লেখেন বেশ ;

পড় লেখেন বেশ

পড় লেখেন বেশ ॥ • •

শ্রীমতী চাটুজ্যে

খুঁজছে কী ? কী খুঁজছে ॥ • •

সৌরেন চক্রবর্তী
ভোর না হ'তেই শীত গায়
'কই পেয়ালা ভর্তি
গরম চা, গরম চা, গরম চা ?'...
চা বানিয়ে সে শীত খামায় কণিকা।

নূতন নজরী পরম প্রেমেন
যাকর দিলে তারই দেবেন।
আমরা তো বাবা আকাট মূর্খ
আমাদের সেঁটে মিলবে দুঃখ।
সোজা চ'লে যাও নূতন কুটিতে
খাঁচড়া কামড় আখর লুটিতে। [মণীশ ঘটক]

মাত উঁচু ক'রে দেখি মণীশ ঘটক
চুল যত পাকুক না, মাথামি চটক।
সেই চোখে বিদ্যুৎ, ঠোঁটে বাঁকা হাসি,
কত বুড়া বুড়া হল দেখে বুধনাথ। [প্রেমেন্দ্র মিত্র]

(কৌতিক গৃহ)

কামাক্ষী সহরের সরোজ ব্যানার্জ
হাত বারোটায় শিরে কে হানলো বাজ ?
কে ধরোজা ভাঙে, উঁকি মারে আসপাশ
প্রেত নয়, কমরেট শ্রীসুশীল রায়।
এবং স্বভাবে তাঁর সেই কোনো খুঁৎ-ও।
যদিও হতে সেই একপাটি ভূতো। • •

কবি দিবেশ দাস
গ্রীনে করবেন বাস
জীবন তিন ঘণ্টা
খারাপ তাই মনটা। • •

কাব্য পড়ুক সবারা, বীরেন পড়বে না।
তার চাইতে বীরেন-কে দ্বিতীয় কাপ চা
বানিয়ে দেবে।...আনিয়ে দেবে জগৎটাকে, আর
সময় নেই : চুল পেকেই সেজে যাতুড্যাব ! ● ●

অটোগ্রাফের খাতা খুলে দেখি
উড়ছে সাদারঙের কথার কাছন।
তারই মধ্যে কলম মারলো এ-কী :
'জেলখানার কয়েদীরাও মানুষ' !
জয়ানন্দ ! আজো কী মনে আশা,
মানুষ জানে সত্যি ভালোবাসা !

রামকিঙ্কর না
'এম এ, ডি ফিল' না !
এমনকি নন কবি
আঁকেন শুধুই ছবি !! ● ●

সংগ্রহ : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুস্থ সমালোচনার অন্তর্ধান

শান্তিনিকেতন-এর সাহিত্যসম্মেলন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে 'দেশ' পত্রিকা যে মন্তব্য করেছেন তা সম্ভবত সত্য নয়। এর প্রতিবাদ করা হয়ত সম্মেলনের আহ্বায়কদের পক্ষে সমীচীন নয়, অথচ যখন 'দেশ' পত্রিকা কথায় কথায়, প্রতিবাদ ছাপবেনসা বলে চিঠিপত্র বন্ধ এবং সত্য-ভাষণের ও সমালোচনার অধিকার থেকে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করেন তখন অন্যান্যদের সেই প্রসঙ্গে বাধ্য হয়েই কিছু মন্তব্য করতে হয়।

নিমন্ত্রিত সাহিত্যিকদের একটি পূর্ণ তালিকা সম্মেলন-আহ্বায়ক শ্রীযুক্ত অশোকবিজয় রাহা আমাদের পাঠিয়েছেন। তা থেকে জানতে পারি, যাঁরা আসেননি এবং যাঁরা এসেছেন তাদের মিলিয়ে বাংলা ভাষার এমন কোন বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিকই বাদ পড়েননি যাঁরা সাদরে আমন্ত্রিত হননি ; দ্বিতীয়ত যে সকল অধ্যাপক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন তাঁরা, 'দেশ' কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাত নয়,

দীর্ঘদিন বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় গবেষণায় দিন কাটিয়েছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বা শশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রবোধচন্দ্র সেন অথবা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা সাহিত্যে এমন কয়েকটি নাম যাঁরা শুধু অধ্যাপক নন, বাংলা সাহিত্যে বরণীয়। পত্রলেখক শ্রীদীপক বসুমদারের সঙ্গে আমরা একমত যে একাধিক অধ্যাপক আছেন যাঁরা সাহিত্যের প্রবেশদ্বার খুলে দিতে পারেন, আবার এমন অনেক সাহিত্যিক আছেন যাঁরা সাহিত্যচেতনার কোন প্রমাণই দিতে পারেন না। এরূপ সমালোচনায় সাহিত্যের আবহাওয়া নিশ্চয়ই মার্জিত হয়না।

[সম্পাদক : উত্তরসূরী]

আকাশবাণী ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত

বহু ত্রুটি নানা মহল লক্ষিত হলেও আকাশবাণী বিগত কয় বৎসর ধরে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের প্রসারকল্পে বিভিন্নরকম অনুষ্ঠান করছেন (অবশ্য হাল আমলের উৎকট কিছু আধুনিক সঙ্গীত পরিবেশনেও এঁদের উৎসাহ কম নয়—এবিষয়ে অন্যত্র আলোচনার ইচ্ছে রইল)। সম্প্রতি বেতার কর্তৃপক্ষ আকাডেমি অব ফাইন আর্টস এর রমণীয় অডিটোরিয়ামে এরকম একটি অনুষ্ঠান করেছিলেন। সারা ভারতের তিনজন অত্যন্ত বিশিষ্ট শিল্পী অংশগ্রহণ করায় এর তাৎপর্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমাদের কোন অজ্ঞাত কারণে সর্বজন-শ্রদ্ধেয় শিল্পী তারাপদ চক্রবর্তী দীর্ঘকাল বেতার মারফৎ সঙ্গীত পরিবেশন করেননি। বহুদিন পর তাঁর খেয়াল গান পরিবেশিত হ'ল বেতার মাধ্যমে (উক্ত অনুষ্ঠানের টেপ-রেকর্ড রাত্রে বেতারে শোনান হবে)। অন্য দুজন শিল্পী ছিলেন বেগম আখতার ও আলি আকবর খান। এঁদের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

বেগম আখতার এর গান শুনতে শুনতে মনে হোল এর গলায় সেই বৈশিষ্ট্য, বলিষ্ঠতার সঙ্গে সূক্ষ্ম কাজের মুন্সিয়ানা আর উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত নয়। বিশেষত আমার প্রশ্ন, ঠুংরী গজল ও দাদ্‌রা সঙ্গীতে মূল আবেদন ও গায়কী কি এক? প্রথম থেকে শেষ অবধি যে-কোন সময়ই মনে হচ্ছিল যেন উনি ঠুংরীই পরিবেশন করছেন। গজল গানটিতে কেদার রাগের ছায়া থাকলেও উক্ত রাগের পূর্ণ বিস্তার নিশ্চয়ই গজলের ধর্মানুযায়ী নয়। গানের প্রারম্ভে

এসব গানে লক্ষিত হওয়া উচিত, কিন্তু সেদিকে বোধহয় গায়িকার লক্ষ্য ছিলনা। দ্বিতীয় শিল্পী শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী সম্ভবত এখনো অসুস্থ। সেকারণে সুরের বলিষ্ঠতা প্রথম দিকে লক্ষ্য করা যায়নি—দুর্বল শরীরে খেয়াল পরিবেশন রীতিমত কষ্টসাধ্য। সুরিয়া ওঁর প্রিয় রাগ এবং বিবাদের বিস্তারে উনি অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। ওঁর গমকযুক্ত তানগুলি বর্তমানকালে সকলেরই শিক্ষণীয়। আমি আকবর সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নেই। শিবরঞ্জনী একদিনেই অপ্রচলিত রাগ, তাতে মিশ্র সুরের ব্যবহারে সম্ভবত অনেকেই অসুবিধা বোধ করেছেন। দুর্গার সঙ্গে কোমল গান্ধারের অপরূপ মিশ্রণে রাগটির বৈচিত্র্য আলাপ ও গৎ-এ সুন্দর পরিস্ফুট হয়েছিল। এরকম সঙ্গীত অনুষ্ঠান আমরা বেতার কর্তৃপক্ষের কাছে আরো আশা করি।

শঙ্কর ভট্টাচার্য

'গীতবিতান'-এর রবীন্দ্রশতবার্ষিক উৎসব

গীতবিতান সম্ভবত রবীন্দ্র সংগীত নৃত্যনাট্য ও নাটক শিক্ষাদানের প্রাচীনতম সংস্থা। পরিচ্ছন্ন রুচি ও নিষ্ঠার সঙ্গে এঁরা রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন দিকে শিক্ষাদান করেন। গত বৎসর রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্য করে এরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পঞ্চাশটিরও বেশী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং চিরাচরিত ঐতিহ্যের সঙ্গেই সেসকল স্থানে এরা সংগীত ও নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেছেন।

গত ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে 'গীতবিতান' রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে নিজস্ব অনুষ্ঠানসূচী গ্রহণ করেন। পাঁচদিনের অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে চারদিনই গীতবিতানের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন এবং 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া' 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'মায়ার খেলা' অভিনীত হয়। আই পি. টি. এ. এর 'প্রান্তিক সখা' কর্তৃক 'মৌকাডুবি' অভিনীত হয়।

কয়েকদিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে 'মায়ার খেলা' ও 'বাল্মীকি প্রতিভা'ই সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়েছিল। সঙ্গীতাংশে, নৃত্য ও সুষ্ঠু পরিচালনার ফলে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। এই কয়েকদিনের অনুষ্ঠানে মূলতঃ 'বাল্মীকি

প্রতিভা'র বাল্মীকি ও 'মায়ার খেলা'র প্রমদার ভূমিকায় লীলা ভট্টাচার্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অপরাপর ভূমিকায় ছন্দা চৌধুরী, সন্ধ্যারাণী চৌধুরী, অমিত্য রায়চৌধুরী, তন্দ্রা পাল, উমা সেনগুপ্ত, মণিরা ভট্টাচার্য, কমা ঘোষাল, দর্বাণী গুপ্ত, মহাশ্বেতা রায়, দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নৃত্যাভিনয় উল্লেখযোগ্য। অমিত পাল ও উমা সেনগুপ্ত যথাক্রমে 'বাল্মীকি প্রতিভা' 'মায়ার খেলা' এবং 'চিত্রাঙ্গদা'র নৃত্যপরিচালনা করেন।

সঙ্গীতাংশে গীতবিতানের ছাত্রছাত্রীগণ ও কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে অমিতি সেনগুপ্ত, সুপ্রিয়া চট্টোপাধ্যায়, লেখা ভট্টাচার্য, কমলা বসু, রমা রায়পুরকায়স্থ, প্রশান্ত ঘোষ, অমিত মিত্র ও তরুণ মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। 'বাল্মীকি প্রতিভা' 'বসন্ত' ও 'মায়ার খেলা'র সংগীত পরিচালনা করেন তরুণ মিত্র ও 'চিত্রাঙ্গদা'র সংগীতাংশ পরিচালনা করেন শৈলেন্দ্র বসু। জ্যোৎস্না মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় প্রান্তিক এর 'মৌকাডুবি'ও দিলেন সমাদর লাভ করে এবং উল্লেখযোগ্য অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, দিলিপ সেন, লেখা রায়চৌধুরী, কাদিম্বী সেন, মমিতা বিশ্বাস প্রভৃতি। তাপস সেনের এর আলোকসম্পাত অনুষ্ঠানগুলির অন্যতম আকর্ষণ ছিল।

অমিত সেন

স্বামী বিবেকানন্দের কবিপ্রতিভা

[ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে, কি ধর্ম কি নীতি কি স্বাদেশিকতায়, একদিন স্বামী বিবেকানন্দ যুবকদের যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন কর্মের দিকে, গ্রামসংগঠনে ও সামাজিক উন্নয়নকল্পে, সেই স্মৃতি আজো ভারতীয় চিত্তকে অনুপ্রাণিত করছে। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এবার কলকাতায় নাগরিকগণ উত্তর কলকাতায় পক্ষকালব্যাপী উৎসব করেছেন—সেখানে তাঁর জীবনী, সাধনা ও বিভিন্ন কর্মধর দিক দিয়ে আলোচনা করেছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট সুধীবর্গ, সংগীত পরিবেশন করেছেন শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা, বিশেষত বিবেকানন্দের প্রিয় গানগুলি প্রায় সবই গীত হয়েছে। প্রদর্শনীটিও অন্যতম আকর্ষণ ছিল—তাঁর জীবন ও বাণী তাতে বিধৃত হয়েছে। বিশ্বাসহীনতার দিনে স্বামী বিবেকানন্দের কর্মময় ও ভাবময় জীবন সকলের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়

বলে বোধ হবে। যে যুগে একদিকে স্বদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন এবং অন্যদিকে য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের চেতনা ভারতবাসীর মধ্যে যে দ্বিধাবিভক্ত পথের সমস্যা সৃষ্টি করেছিল তারই মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশিত পথ সেসময় জাতির মানসগঠনে বিশেষ কার্যকরী ছিল। কিন্তু এছাড়াও বিবেকানন্দের সাহিত্যপ্রতিভা তৎকালে বাংলাসাহিত্যের একটি বিশেষ দিগ্‌নির্ণয়ে সহায়তা করে। গভীর অনুভূতি, ঔদার্য ও সরলতা এবং একই সঙ্গে কবিত্বময়তায় তাঁর রচনাবলী যে-কোন সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। 'বিবেকানন্দের কবিপ্রতিভা' শীর্ষক আলোচনায় এ মন্তব্য আরো পরিস্ফুট হবে।]

জগৎ ও জীবনের গভীর উপলব্ধির ভাষায় রূপ দেন যিনি, তিনিই কবি। যে বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য-কর্মকে কবিতা বলি আমরা, তা হলো কবি-মনের বাহ্য অভিব্যক্তি। চলতি ভূমিকায় কবি-প্রতিভার বিচার আরম্ভ হয় সেই রচনা থেকেই। কিন্তু প্রকৃত কবিতার বিচার নির্ভর করে কবির মানসিকতার ওপর, যা মুখর হলে ভালোই, না হলেও ক্ষতি নেই। অর্থাৎ সেই পুরানো কথা: কবি নীরবও হতে পারেন, হতে পারেন অ-লেখকও।

এই মনোগত বৈশিষ্ট্য বিচার করেই কবি বলা যাবে স্বামী বিবেকানন্দকে। এমন কি, তাঁর সমকালীন অনেক কবি নামের মানুষদের চেয়ে বড় কবিও বলা যায় তাঁকে। তাঁর হৃদয়ে তরঙ্গিত হয়েছে নিত্য নূতন ভাবের আবেগ। জগৎ-রহস্য ও জীবন-রহস্যের বিচিত্র দিক উদ্ভাসিত আলোড়িত হয়েছে সেই তরঙ্গে। সেই আবেগ নিজেই নিজের ভাষা তৈরী করে প্রকাশমান হয়েছে, যা কখনো পাঁচটি কবিতায় মূর্তি ধরেছে, কখনো ধরেছে নিবন্ধ, বক্তৃতা বা চিঠির।

এই সবরকম অভিব্যক্তিকেই তাঁর কবিতা বলছি আমি, কারণ যুক্তি তর্ক, বিচার বিশ্লেষণ ও তথ্যতত্ত্বের উপকরণ যাই থাক তাতে, তার প্রেরণা হল ভাবাবেগ এবং রসাবেশ, যা প্রকৃত কবিতার প্রাণ। এক জন ফরাসী সমালোচক বলেছেন, কবিতার অবস্থান হল হৃদয়, বিজ্ঞানের অবস্থান মস্তিষ্ক। আর কতকটা মস্তিষ্ক ও কতকটা হৃদয়কে এক সঙ্গে স্পর্শ করে থাকে দর্শন: বলা যেতে পারে তা উভয়ের সন্ধান। কথাটার নিঃসংশয় সৌন্দর্য লক্ষ্য করার মতো। কবিতা থেকে দর্শন বিজ্ঞানের দূরত্ব যে বেশী নয়, আর এরা যে একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত থেকেই একসূত্রে গাঁথা, এ স্বীকৃত হয়েছে কথাটার মধ্যে।

বিবেকানন্দের কবি-হৃদয় খুঁজতে এই অভিমতটিকেই কেন্দ্র-বিন্দু হিসেবে নিতে হবে। তীব্র হৃদয়ানুভূতি থেকে উৎসারিত হয়েই তাঁর বেশীর ভাগ রচনা চলে গেছে হয় কোন তত্ত্ব বিচারে, নয় কোন তথ্য-বিশ্লেষণে এবং কল্পনায়, আবেগে, বিচারে, মননশীলতায় একাকার হয়েই তা গড়ে উঠেছে এক একটা আকর্ষ রচনারূপে। ব্যাপক বা সর্বাত্মক অর্থে নিলে এর সবগুলোকেই কবিতা বলা যাবে। প্রাচীন আলঙ্কারিক মতেও কবিতা বলতে তাই বোঝাত : any noble impression of the soul, clothed in equally noble expressions is poetry বলেছেন টিচেনো। এই অর্থে শ্রীমদ্ভগবদ গীতা এবং উপনিষদ কবিতা। বঙ্কিমচন্দ্র, রাজেন্দ্রসুন্দর ও রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধাবলী কবিতা। বিবেকানন্দ-রচনাও কবিতা এবং মহৎ কবিতা।

আমি জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, শিকাগো বক্তৃতা, পরিব্রাজকের পত্র···সমস্ত রচনার কথাই বলছি। যুক্তত এর কোনটা ধর্মতত্ত্ব, কোনটা দর্শন, কোনটা ইতিহাস, কিন্তু প্রায়শ কবিতা এবং ছন্দোবদ্ধ যে রচনাগুলি তাঁর বাণীবাহী নামক সংগ্রহে গ্রথিত হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী গভীর ও সুদূরগামী কবিতাই আছে তাঁর পূর্বোক্ত রচনাগুলির মধ্যে। কোথাও তার অদ্ভুত আত্মনিবিষ্ট ভাবানুভূতির রূপ, কোথাও জাগতিক পর্যবেক্ষণের উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য চিত্র, কোথাও রসার্দ্র জীবন-চিন্তার মনোরম আলেখ্য। অথচ তারি মধ্যে বিধৃত আছে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব।

প্রকৃত বড় কবিতা একেই বলে। বঙ্কিম, রাজেন্দ্রসুন্দর ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও কার্লাইল, রাস্কিন, এমার্সনও এই অর্থেই মহৎ কবি। মহৎ কবি তলস্তয়, রলাঁ, রাসেল, বের্গসঁও। কিন্তু বিবেকানন্দ-রচনাবলীর এই মহৎ তাৎপর্য আবিষ্কৃত ও ব্যাখ্যাত হয় নি এবং তা হয়নি প্রধানত ও প্রথমত তাঁকে একেবারে ধর্মাচার্যরূপে প্রচার এবং ধর্মক্ষেত্রের মধ্যে তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয় বলে। ধর্মাচার্যরূপে তাঁর পরিচয় গৌণ নয়, কিন্তু ধর্মবিমুক্ত নির্মল প্রজ্ঞার নিরিখে বিচার করেও বিবেকানন্দ-রচনার একটি উঁচু সার্থকতা পাওয়া যায়, যা সাহিত্যের বস্তু।

এরূপ সাহিত্যের দিক থেকে বিবেকানন্দ-রচনার মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। বীরবাণী বইটি পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। এতে বাংলা ইংরেজী ও সংস্কৃতে লেখা বিবেকানন্দের মুষ্টিমেয় ছন্দোবদ্ধ কবিতা এবং গান সংগৃহীত হয়েছে। এর

মধ্যে 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার' কবিতাটি সারা দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। 'অতল অবয়ব' গানটি এবং 'নীলকাশে ভাসে মেঘকুল' কবিতাটিও দু-রচনার নিদর্শনরূপে পর্যাপ্ত প্রশংসা দাবী করতে পারে। Song of the Sannyasin নামক ইংরেজী কবিতাটি এবং ইংরেজী সনেটটিও সুন্দর। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হরিনাথ দে ও অরবিন্দের কবিতার মতো দাবী বিবেকানন্দ-বিরচিত ইংরেজী কবিতাও কম আগ্রহ, অনুরাগ বা কৌতূহলের বস্তু নয়।

যা আকারে কবিতা, এমন রচনায় বিবেকানন্দ হয়ত খুব অসাধারণতা দেখাননি। কারণ যে নিবিষ্ট অনুশীলনে তা সম্ভব, তা ছিল না তাঁর কর্মবহুল জীবনে। কিন্তু প্রকারান্তরে যা কাব্যধর্মী এবং মহৎ কবিতার লক্ষণ যাতে সুস্পষ্ট, এমন সৃষ্টি অনেকই তাঁর হাত থেকে প্রচুর। সে চলে তাঁর গদ্য রচনাবলী। (এখানে অবশ্য বলে রাখা দরকার যে গদ্য গ্রন্থাবলীর সবই তাঁর মূলতঃ ইংরেজীতে লেখা : Eastern and Western, মহাপুরুষ প্রসঙ্গ, আর পত্রাবলী ছাড়া।) কিন্তু ইংরেজীতেই হোক, আর বাংলাতেই হোক, গদ্য রচনা তাঁর বরাবরই বলিষ্ঠ প্রাণধর্মসমৃদ্ধ ও কাব্যমণ্ডিত। বাংলায় তিনি চারু কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন এবং তা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী এই মাধ্যমকে জাতীয় রচনায় নিয়োগ করার অনেক আগে। এই গদ্য রচনাগুলির দিকে সম্রদ্ধ দৃষ্টিপাত করলেই আমরা কবি বিবেকানন্দকে পুরোপুরি চিনতে পারব এবং সেই প্রকাণ্ড মানুষটিকে চেনার দিক থেকে তাই সত্যিকার দিগ্‌দর্শনস্বরূপ।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সজনীকান্ত দাস

সজনীকান্ত দাসের পৈতৃক নিবাস বীরভূম জেলার রাইপুর গ্রামে। ১৩০৭ সালের ৯ ভাদ্র (২৫ আগস্ট ইং ১৯০০ সন) শনিবার বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের প্রায় ৩৭ বৎসর কাল সাহিত্য সাধনা করেন। এই সুদীর্ঘ কাল নানা পত্র পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনা, গ্রন্থ রচনা ও গ্রন্থাবলী সম্পাদনা করেন, ফলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সজনীকান্ত আজ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। প্রধানত 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক রূপে পরিচিত হলেও, তিনি কবি, গবেষক গল্প-উপন্যাস ও সংগীতরচয়িতা ছিলেন। গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬২, (২৮শে মাঘ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ) রবিবার তিনি কলকাতায় বেলগাছিয়ার নিজ বাড়ীতে পরলোকগমন করেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি তিনটি গ্রন্থের প্রকাশ-কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু সেগুলি সমাপ্ত হয়নি। ১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পরিবর্ধিত সংস্করণ। ২। নবীনচন্দ্র-রচনাবলী-৫ম খণ্ড। ৩। ব্রজেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়ের রচনাবলী।

রচিত গ্রন্থ :

১। অজয় (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩৩৬। ২। পথ চলতে যাদের ফুল। (গীতিকাব্য)। ভাদ্র ১৩৩৬। ৩। বঙ্গভূমে (জাতীয়তামূলক ব্যঙ্গ কবিতা)। অক্টোবর ১৯৩১। ৪। মনোদর্পণ (ব্যঙ্গকবিতা)। অক্টোবর ১৯৩১। ৫। মধু ও হুল (ব্যঙ্গরসাত্মক গল্প ও নিবন্ধ)। ১৩৩৮ সাল। ৬। অমৃত (ব্যঙ্গকবিতা)। অক্টোবর ১৯৩১। ৩-৬ সংখ্যক গ্রন্থ একসঙ্গে একই সময়ে প্রকাশিত হয়। ৭। রাজহংস (কাব্য)। চৈত্র ১৩৩২। ৮। আলো-আঁধারি (কাব্য)। বৈশাখ ১৩৩৩। ৯। কলিকাল (সচিত্র হাসির গল্প)। ভাদ্র ১৩৩৭। ১০। কেড্স ও স্যাণ্ডাল (সচিত্র হাসির কবিতা)। ভাদ্র ১৩৩৭। ১১। উইলিয়ম কেরী (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-১৫)। বৈশাখ ১৩৪৯। ১২। পঁচিশে বৈশাখ (রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কীয়

কাব্য)। বৈশাখ ১৩৪৯। ১৩। মাসিক- সরোবর (কাব্য)। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯। ১৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-২২)। মাঘ ১৩৪৯। ইহার অন্যতম লেখক : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৫। বাংলার কবিগান (সাহিত্য-প্রন্থিকা : প্রবন্ধমালা-১)। আষাঢ় ১৩৫১। ১৬। মৃত্যুমুক্ত (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩৫১। ১৭। রাজমোহনের স্ত্রী (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩৫১। ১৮। আকাশ-বাসর (গল্প-সংগ্রহ)। কার্তিক ১৩৫১। ১৯। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (গদ্যের প্রথম যুগ)। আষাঢ় ১৩৫৩। ২০। পথের সন্ধানে (সন্দর্ভ)। ১৩৫৩। ২১। ক্যাপ্টেন জেম্‌স স্কিওয়ার্ট, কেলিস্ক কেরী। চৈত্র ১৩৫৮। (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৮৮) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত একত্রে রচিত। ২২। ভাব ও ছন্দ (গীতিকাব্য)। মাঘ ১৩৫৯। ২৩। আত্মস্মৃতি প্রথম খণ্ড অগ্রহায়ণ ১৩৬১ ও দ্বিতীয় খণ্ড ভাদ্র ১৩৬৩। ২৪। স্ব-নির্বাচিত গল্প (গল্প)। চৈত্র ১৩৬৬। ২৫। রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। রথযাত্রা, ১৩৬৭। ২৬। পাদু-পাদপ (কাব্য)। কার্তিক ১৩৬৭।

সম্পাদিত গ্রন্থ :

১। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত 'কাশীরাম দাসের সচিত্র অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত'। আশ্বিন ১৩৩৪। ২। রজত-জয়ন্তী। সম্রাট পঞ্চম জর্জের সাম্রাজ্যের পঁচিশ বৎসরের স্মারক গ্রন্থ। জুন ১৩৩৫। ৩। বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী। (১-৩) খণ্ড। ফাল্গুন ১৩৪৪-চৈত্র ১৩৪৬। ইহার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ৪। সুলভ গ্রন্থমালা : ১২ সংখ্যা : কপার শব্দের অর্থ-ভেদ শ্রাবণ ১৩৪৬। ১৩ সংখ্যা : কথোপকথন বৈশাখ ১৩৪৯। ৫। বঙ্কিম-রচনাবলী। (১-৯) খণ্ড। আষাঢ় ১৩৪৫-পৌষ ১৩৪৮। ৬। অমদামঙ্গল গ্রন্থের মূলাল। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭। ৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী। অচলিত সংগ্রহ (১-২) খণ্ড। আশ্বিন ১৩৪৭-অগ্রহায়ণ ১৩৪৮। ৮। মধুসূদন-গ্রন্থাবলী। (১-২) খণ্ড। অগ্রহায়ণ ১৩৪৭-জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮। ৯। ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী। (১-২) খণ্ড। মাঘ ১৩৪৯-ভাদ্র ১৩৫০। ১০। বাংলার কবি ও কাব্য গ্রন্থমালা : (১) সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, চৈত্র ১৩৪৯, (২) বলদেব পালিত, অগ্রহায়ণ ১৩৫০, (৩) ঈশানচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাদ্র ১৩৫১। ১১। দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী। (১-২) খণ্ড। আষাঢ় ১৩৫০-ভাদ্র ১৩৫১। ১২। পাপায়ো। বৈশাখ ১৩৫১। ১৩। রামমোহন-গ্রন্থাবলী। (১-৭) খণ্ড। অগ্রহায়ণ ১৩৫১-শ্রাবণ ১৩৫৯। ১৪। শকুন্তলা। অগ্রহায়ণ ১৩৫২। ১৫। দ্বিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলী : কবিতা ও গান। ভাদ্র ১৩৫৩। ১৬। হুতোম পাঁচার নক্সা ও অন্যান্য সমাজচিত্র। বৈশাখ ১৩৫৪। ১৭। গীতার বনবাস। আশ্বিন ১৩৫৫। ১৮। রামেন্দ্র-রচনাবলী। (১-৫) খণ্ড। আষাঢ় ১৩৫৬-মাঘ ১৩৫৭। ১৯। সারদামঙ্গল। ফাল্গুন ১৩৫৬। ২০। মহিলা। বৈশাখ ১৩৫৭। ২১। শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী। শ্রাবণ ১৩৫৭। ২২। পাঁচকড়ি রচনাবলী। (১-২) খণ্ড। ফাল্গুন ১৩৫৭-আষাঢ় ১৩৫৮। ২৩। বলেন্দ্র-রচনাবলী। অগ্রহায়ণ ১৩৫৯।

এই গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় সজনীকান্ত বলেছিলেন :

"সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষকাল প্রবীণ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমার বাংলা সাহিত্যের অক্ষয় গ্রন্থগুলির সম্পাদন-সহযোগিতা এই বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলীর সঙ্গেই শেষ হইল। বহু অকালে আদিয়া···১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ১৭ই আশ্বিন··· বেদনার্তের অন্তরে চিরস্মরণীয় দিবস হইয়া রহিল।"

ইহার পর তিনি স্বয়ং গ্রন্থাবলীর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী সম্পাদনা করেন :

২৪। মেঘনাদ-গ্রন্থাবলী। (১-২) খণ্ড। আষাঢ় ১৩৬০-অগ্রহায়ণ ১৩৬১।
২৫। অক্ষয়কুমার বড়াল-গ্রন্থাবলী। ফাল্গুন ১৩৬২-শ্রাবণ ১৩৬৩।
২৬। রামেন্দ্র-রচনাবলী : বিবিধ। (ষষ্ঠ খণ্ড)। চৈত্র ১৩৬৩।
২৭। নবীনচন্দ্র-গ্রন্থাবলী। বৈশাখ-ফাল্গুন ১৩৬৬।

সনৎকুমার গুপ্ত

আলোচনা

Camus নামের উচ্চারণ

শ্রী অরুণ মিত্রের যুক্তি সম্ভবত কিছুটা অসংগত। Don Juan নামের আদি উচ্চারণ অনুসরণে তাঁর আপত্তি, অথচ Camus নামের আদি উচ্চারণ প্রতিষ্ঠায় তাঁর আগ্রহ। ব্যক্তিগত চিন্তাধারার এই অসামঞ্জস্য মোটেই আশ্চর্যজনক নয়, বরং তা উচ্চারণ সম্পর্কে একটি সাধারণ সত্যেরই নির্দেশ দেয় : কোন নামের উচ্চারণ সর্বদা নিয়মানুগ নয়, অর্থাৎ ইংরাজিতে যাকে বলা হয় arbitrary (যেমন Sandys, Macleod, Altrincham, Home ইত্যাদি নামগুলির উচ্চারণ ; এবং এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, Earl Home-এর বিদেশ-সচিব পদে নিযুক্ত হওয়ার সংবাদদানের পর B.B.C.-এর সংবাদদাতা বলেন—'I am going home, Good-night)!

প্রচলনসিদ্ধতা যদি নাম উচ্চারণের মাপকাঠি হয়, তাহলে প্রত্যেক ইউরোপীয় নামের প্রচলিত ইংরাজী উচ্চারণই তো আমাদের গ্রহণ করা উচিত, কেননা বিদেশী ভাষার বর্ণমালা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের সৌভাগ্য বা সুবিধা আমাদের বাঙালীদের কজনেরই বা হয়! কিন্তু ইংরাজী উচ্চারণের ফলও খুব বেশী আশাপ্রদ নয়, কারণ তা অন্যান্য ভাষার মতই ক্রমপরিবর্তনশীল। শ্রীযুক্ত মিত্র জানেন কিনা জানি না, অধুনা ইংরাজী শিক্ষিত মহলে Don Juan-কে ডন্ জুয়ান এবং Don Quixote-কে ডন্ কুইক্সোট হিসাবে উচ্চারণ করা মানে মিত্রকে intellectual coelacanth রূপে ঘোষণা করা। তিনি লিখেছেন—'ইউরোপের অন্যদেশেও কেউ হুয়ান বলে না।' এই categorical statement-এর অর্থ কি? তিনিও সম্ভবত জানেন যে, এ নামের জার্মানি, সুইডিশ, নরউইজিয়ান ও ডেনিশ উচ্চারণ 'উয়ান', ও 'য়ুয়ান', এবং ইটালীয়ান ভাষায় এর সাধারণ উচ্চারণ 'হুয়ান' না, 'জোভানে'।

যেহেতু বিদেশী শব্দ উচ্চারণে অভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের য ফলা-ও বিয়ের সূক্ষ্ম পার্থক্য বজায় রেখে তা যথাযথভাবে কোন বিদেশী

মাবের প্রতি প্রয়োগ করা অসঙ্গত, সেহেতু শ্রীযুক্ত মিত্রের 'কাম্যু' গ্রহণে আমি নারাজ। উপরন্তু, ফরাসী বলেও তো একটা জিনিষ আছে, যা প্রত্যেক কথিত ভাষার মূল অঙ্গ। সুতরাং 'কাম্যু' শব্দরূপ গ্রহণে আরও একটি আপত্তি এই যে, এ ক্ষেত্রে ব কলা প্রথম শব্দাংশটির প্রতি ফরাসী প্রয়োগের নির্দেশ দিচ্ছে (কাম্ । যু ; cam । mus) যা খুবই ভুল। যদিও ফরাসী নিয়ম অনুযায়ী ফরাসী camus শব্দটির দুটি অংশেই সমাঘাতে পড়া উচিত (ca । mus), তা সত্ত্বেও কথাটির উচ্চারিত রূপে শেষ শব্দাংশটির (mus) প্রাধান্যই লক্ষণীয়। সেজন্যই আমি উ-এর পরিবর্তে উ ব্যবহার পক্ষপাতী। ফরাসী ভাষায় 'u' ধ্বনি উচ্চারণের নিয়মটী P. Fouche-এর Traite de Prononciation Francaise (1950) থেকে উদ্ধৃত করতে পারি—

— U —

... u se prononce (y) :
... 3° A la fin d'un mot, après une consonne, un h ou un i :
cf. bu, écu. (ou ecus), moulu, venu, glu, jouillu, vertu, Chapu, Trochu, Riu.

এ প্রসঙ্গে লণ্ডনের তিনটি পত্রিকার (Observer, Spectator ও New Statesman) সাহিত্য বিভাগের সম্পাদকদের (Terence Kilmartin, Ronald Bryden ও Karl Miller) মতামত উল্লেখযোগ্য।

আমি তাঁদের লিখি :

In writing article for the Bengali public I have had occasion to refer to Camus, and a dispute has arisen as to how this name should be pronounced. I have rendered it in the vernacular by using a single 'm' so that the accent falls on the last syllable. The critics have objected that the name should be rendered by an accented 'm' (Cammu) so that the emphasis falls on the first syllable. I would be immensely grateful for your opinion on this point.

Terence Kilmartin (Observer) এর উত্তর :

With reference to your letter of December 14th, the answer to your problem about the pronunciation of Camus lies in between the two schools of thought. In other words, each of the two syllables should have an equal weight. This is an unbreakable rule in all French pronunciation.

Ronald Bryden (Spectator) এর উত্তর :

Forgive me for not replying to your letter earlier. My French friends tell me that your pronunciation of Camus, with the accent on the last syllable, is correct.

Karl Miller (New Statesman) এর উত্তর :

In reply to your query of the 28th, regarding the accent on the name 'Camus'; in our opinion the accent should fall on the last syllable, in which case your rendering in the vernacular with a single 'm' would seem to be the more correct.

There seems to be a further fine point on which the authorities disagree—whether or not the final 's' is sounded. I have rung the French Institute in Kensington, who say that it should be dropped (as in your letter); but we have heard the final 's' pronounced by some (for instance, the BBC).

পরিশেষে, শ্রীযুক্ত মিত্র 'কেমাস্' কথাটা কোথায় ও কার মুখে শুনেছেন তা জানতে ইচ্ছা করি। দুর্ভাগ্যবশতঃ, আমি ওটা কোথাও শুনিনি, বিশেষত ইংরাজী শিক্ষিত মহলে যেখানে এর প্রচলিত উচ্চারণ 'কামুস', যা খুবই ভুল, কারণ Fouche অনুযায়ী L'e final est muet; এবং এজন্যই আমি লিখেছি যে দক্ষিণ ফ্রান্সে এ নামের প্রচলিত উচ্চারণ ইংরাজী মত অর্থাৎ উচ্চারণে 'e' ব্যবহার লক্ষিত হয়, যা খুবই সত্য; এবং তার প্রমাণ স্বরূপ দক্ষিণ ফ্রান্স নিবাসী এক মহিলার মতামত এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি Mme Denise Pearton, Licencié ès lettres (Université de Toulouse), Titulaire du Diplome Technique de Bibliothécaire (Sorbonne, Ecole des Chartes, Paris).

তিনি আমাকে লেখেন :

I was interested to learn that the information I had casually offered has given rise to an academic controversy. As one born and brought up in the south of France I can assure you it is common practice in that part of the world to pronounce the name 'Camus' with the final 's' which, in the Parisian dialect, may be considered ungrammatical. But then one cannot afford to be grammatically fastidious in any language over the mere pronunciation of a name.

It should be noted that the final 's' is also sounded when the word is used to convey its general meaning: which is 'flat-nosed'.

বিভিরকুমার গুপ্ত

ভারতীয় চলচ্চিত্রে সংগীত

সংগীত চলচ্চিত্রের একটি প্রকাশ মাধ্যম—একটি ভাষা। এর কাজ হচ্ছে বিভিন্ন চরিত্রের মানস এবং বিভিন্ন দৃশ্য ও পরিস্থিতির মনস্তাত্ত্বিক পট-ভূমিকাটিকে ব্যক্ত করা। তাই সংগীত মিশ্রে একটি চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াতে পারেনা—যেমন পারে না ভাষা কোন যথার্থ লেখকের কিংবা বর্ণ কোন যথার্থ চিত্রশিল্পীর পরম লক্ষ্য হতে। আমাদের চলচ্চিত্রশিল্পের অধিকাংশ সংগীতস্রষ্টাই হয়ত একথা বোঝেন। দুঃখটি আমাদের এবং তাঁদের উভয়েরই দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রায়শঃই অযথাভাবে সংগীতের অপপ্রয়োগ ঘটে আসছে [একথা বলছিনা যে, বিদেশী সবাক চিত্রে এমন কিছু কদাচিৎকালে ঘটে না।]। অবশ্য এই অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির জন্য সর্বক্ষেত্রে কিংবা সম্পূর্ণরূপে সংগীত পরিচালকই দায়ী নয়।

সংগীত সবাক চিত্রের অন্যতম প্রকাশ মাধ্যম—এই বাক্যটিকে একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। সবাক চিত্রের মত আর কোন শিল্পকর্মের একাধিক প্রকাশ-মাধ্যম নেই। মোটামুটিভাবে তিনটি মাধ্যম এখানে ব্যবহৃত হয়—দৃশ্যমানতা (visuality ১), সংলাপ (dialogue) এবং সংগীত। এদের দুইভাবে প্রয়োগ করা যায়—যুগপৎ একসঙ্গে কিংবা পৃথক ভাবে। কোন বিশেষ পরিস্থিতি কিংবা মনোভাবকে বর্ণনা করবার জন্য এই মাধ্যমত্রয়কে সম্মিলিতভাবে ব্যবহার করা হবে, না স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করা হবে, তা স্পষ্টতঃই নির্ভর করবে চিত্রপরিচালকের উপর। ছবি মুক্তিলাভ করলে দর্শক ও সমালোচকের নিন্দা বা প্রশংসার প্রায় সবটুকুই যখন পরিচালকের প্রাপ্য, তখন সংগীত যোজনার ব্যাপারে তাঁকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং সংগীতের ভুল প্রয়োগের জন্য সংগীত পরিচালকই কেবল দায়ী নন।

সংগীত যোজনার সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে তিনটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্র রয়েছে:

---

১ ব্যঞ্জনা এবং প্রতীকের ব্যবহার দৃশ্যমানতারই অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমতঃ, যেখানে সংগীত প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম : দ্বিতীয়তঃ, যেখানে সংগীত অন্য মাধ্যম দুটির বিকল্প ; সর্বশেষে, যেখানে সংগীত ঐ মাধ্যম দুটির প্রতিপূরক বা সহায়ক। এই আলোচনা দৃষ্টান্ত সহযোগে বিশ্লেষিত হতে পারে।

ছবিতে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যখন সমস্ত বিষয়টিকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে একমাত্র সংগীতই সক্ষম। ধরা যাক, গভীর নিশীথে নির্জন বনপথে এক ব্যক্তি তার পরম শত্রুকে অবশেষে অস্ত্রহীন অবস্থায় হাতের মুঠোয় পেয়ে হত্যা করতে উদ্যত। হাতে একটি শাণিত ছোরা নিয়ে সে একপা একপা করে এগিয়ে যাচ্ছে তার শিকারের দিকে। আক্রমণকারী যখনই ছোরাটা উঁচিয়ে ধরছে তখনই হতভাগ্যের বক্তাক্তদেহ মাটিতে লুটানোর উপক্রম হচ্ছে। নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন ঐ ব্যক্তির মানসিক অবস্থাটা মুহূর্তভাবে ব্যক্ত করতে এখানে সংগীত ভিন্ন আর কিছুই সক্ষম নয় [উপযুক্ত ধ্বনি সৃষ্টিকেও এখানে সংগীতপ্রয়োগের একটি বিশেষ উদাহরণ রূপে ধরে নিতে হবে]। কেবলমাত্র এক্ষেত্রে ঐ চরিত্রের মুখে ভাষা যোগান সম্ভব নয়। শুধুমাত্র মুখের চেহারা দেখেও তার অন্তরের ত্রাসের পরিমাণ সম্পর্কে কিছু আন্দাজ করা যাবে না। যদি চিত্রনির্দেশক একথা উপলব্ধি করে' তদনুযায়ী ব্যবস্থাগ্রহণে ইচ্ছুক হন, তবে দায়িত্ব এসে পড়বে সুরস্রষ্টার কাঁধে। কারণ যদি তিনি পরিবেশোপযোগী আবহসংগীত যোজনায় অপারগ হন, তাহলে সমগ্র প্রয়াসটাই মাঠে মারা যাবে। দুঃখের বিষয়, এভাবে বিচার করলে হয়ত দেখা যাবে যে, এতদ্দেশীয় চলচ্চিত্রে সুরদান করে যে সব সংগীত পরিচালক প্রভূত অর্থ ও যশের অধিকারী হয়েছেন আসলে তাঁদের মধ্যে অনেকের নামের পাশে 'অনুত্তীর্ণ' ছাড়া আর কোন শব্দ বসানো যায় না।

বেলায় সংগীতসৃষ্টির ব্যাপারে দুটি অন্য প্রশ্ন জড়িয়ে আছে : প্রথমটি হচ্ছে উপযোগযুক্ত সুর বা সুরবিন্যাস সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে, উপযোগযুক্ত বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে। একথা সত্য যে, অন্যান্য শিল্পের মত এই শিল্পেও তাদের নির্বাচন সম্পর্কে অনড় বা লিখিত কোন অনুশাসন নেই। অর্থাৎ, এমনতরো কোন বিধান নেই যে, শোকপ্রকাশের সুরে ঘরোয়ানী কাওয়ালী দিতেই হবে এবং তা বেহালায় বা বাঁশীতে চলবে না। তবু অভ্যাস পরিচালনের সাথে একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, উপযুক্ত বাদ্যযন্ত্র ও সুর নির্বাচনের ব্যাপারে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালকদের অনেকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের

অভিনয়ের সংগীত ভাণ্ডারের শোচনীয় দারিদ্র্য প্রদর্শন করেছেন। এখানে কখনও কখনও আরও একটি সমস্যা এগিয়ে আসে। যেমন, পরিচালককে বিরহাতুর প্রেমিকার অন্তরবেদনা প্রকাশ করতে হবে। তিনি সেদৃশ্যে ভক্তিসংগীত (বিকল্পে পরিবেশোপযোগী কণ্ঠ সংগীত) প্রয়োগ করবেন, না প্রেমিকার মুখে শ্রোতামণ্ডলীকে 'সকরুণ গীতি' শোনাবেন? সমাজসচেতনরা সেযোক্ত পদ্ধতিই বেছে নেবেন, আর তাতে আর্থিক সফলতার সম্ভাবনা খুব বেশী। কেননা আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ চিত্রামোদী এই প্রত্যয়েই লালিত হয়েছেন যে, সংগীতের ব্যাপারে সবাক চিত্র চিত্রায়িত অলসাযাত্র। অবশ্য আজকাল আমরা ক্রমশঃ বুঝতে শিখছি যে, কণ্ঠসংগীত হৃদয়াবেগ প্রকাশের একটি নেহাত সেকেলে রীতি। নিজেকে জানাবার জন্য যখনই কোন চরিত্র রূপালীপর্দায় গান গেয়ে ওঠে, তখনই একটি অস্বাভাবিক, অসেকটা অবাস্তব, অবস্থার উদ্ভব হয়। এবম্প্রকার প্রকাশমাধ্যম নির্বাচনের জন্য মূল দায়িত্ব আসলে চিত্রপরিচালকের, সুরকারের নয়। কিন্তু তাই বলে সেযোক্ত ব্যক্তিও সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। কেননা তাঁকে যে গানটি সরবরাহ করা হলো তাতে তিনি হয়ত এমন অত্যাশ্চর্য সুর চড়ালেন যে, সেই গান শুনে সেখানে দর্শকমণ্ডলের হিতাহিতজ্ঞান উধাও হয়ে ওঠার কথা সেখানে তার বদলে ছাপা হাসির ঘুম পড়ে গেল। এই শ্রেণীর গান চিত্ররসিকদের রসোপলব্ধিকে এমন একটা আকস্মিক ধাক্কা দেয় যে, তাদের মনে পূর্বেকার দৃশ্য ও ঘটনাবলী থেকে যে অনুকূল প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে জমে উঠছিলো সেটা নষ্ট হয়ে যায়, আর তাঁরা চিত্রপরিচালককেই দোষী সাব্যস্ত করেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রে সংগীতপরিচালকদের এহেন ত্রুটির ফলে চিত্রপরিচালক, গীতকার এবং চলচ্চিত্র-শিল্প সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কোন কোন স্থলে সংগীত মৃদুমাধুর্য এবং সংলাপের বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন ধরা যাক একদা ভোরে ঘুম ভাঙতেই অনেক লক্ষপতি অপ্রত্যাশিতরূপে জানতে পারলেন যে, তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে। সেই মুহূর্তে ভদ্রলোকের মনের যে অবস্থা সে-সম্পর্কে একটি মৃদু ধারণা দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়া কিরূপে সম্ভব? তাঁর মুখ থেকে একটি আর্তনাদ বের হওয়া উচিত, না তাঁকে ঐ আকস্মিক আঘাতের ফলে পাষাণের মত স্তব্ধ দেখিয়ে একটি উচ্চগ্রামের ভয়সংগীতসাধনের দ্বারা তাঁর সর্বনাশের সুর দর্শকের মনে

সলিল চৌধুরী : (১) 'একদিন রাত্রে' (শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র), (২) 'কাবুলে' (বি-আর চোপড়া)।

মৃণাল মুখার্জি : 'জীবন মৃত্যু' (অমিত সেন)।

বাসন্তীদেবী : 'শুভ বিবাহ' (শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র)।

নচিকেতা ঘোষ : 'জোনাকীর আলো' (অমিত সেন)।

ও-পি-নায়ার : 'নয়া দৌড়' (বি-আর চোপড়া)।

মৌসাদ : 'সরাব' (সিরি), (২) 'পরদেশী' (ইকো-লোভিয়েট ফিল্ম)।

স্বধীন দাশগুপ্ত : 'ডাক হরকরা' (অগ্রগামী)।

পঙ্কজ মল্লিক : 'প্রতিবাদ' (হেমচন্দ্র)।

রোশন : 'বাপরেটি' (নিমল রায়)।

বসন্ত দেশাই : (১) 'অমর ভূপালী' ও (২) 'দো আঁখে বারা হাত' (শান্তারাম)।

শংকর জয়কিষেণ : 'আওয়ারা' (রাজকাপুর)।

কয়েকটি কারণবশতঃ দক্ষিণ ভারতীয় চিত্রে সংগীতকে উচ্চস্থানের বলে মনে হয়নি। তাই তাদের আলোচনার আবশ্যকতা অনুভব করিনি।

অরুণ মজুমদার

●

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের শেষ বয়সের ফটোগ্রাফটির জন্য আমরা তাঁর পুত্র শ্রী কুমার মুখোপাধ্যায় ও পুত্রবধূ শ্রীমতী রমলা মুখোপাধ্যায়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

●

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৫০
টেম্পল প্রেস, ২ শ্যামরতন সেন, কলিকাতা-৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নবম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা
বৈশাখ-আষাঢ় তেরশ' উনসত্তর

কবিতা সংগীত শিল্পচর্চা ও
সমালোচনার ত্রৈমাসিক মুখপত্র

সম্পাদক
অরুণ ভট্টাচার্য

913

উত্তরসূরী

'বর্ষশেষ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ শুধু যে বিয়োগবেদনার করুণ রাগিণী শুনিয়েছেন তাই নয়, নতুনকে স্বাগত জানিয়েছেন অকুণ্ঠে। 'নবাঙ্কুর উপবনে এখনো করিছে বৃষ্টিধারা',—মনে হয় যেন বিগত বর্ষের যত মলিনতা নবজলধারে স্নিগ্ধ, পবিত্র হয়েছে। নববর্ষ এসেছে প্রকৃতির বিচিত্র সম্ভারে, মানবমনের অন্দর-মহলে যার সাড়া প্রাণবন্ত, দুর্বার। কবি ডাক দিয়ে বলেছিলেন সকলকে, এসো, স্মৃতিকে একধারে সঞ্জীবিত করি, অন্যধারে আহ্বান জানাই নতুনকে।

কে সি দাশ প্রাইভেট লিমিটেড
আবিষ্কারক—রসোমালাই
কলিকাতা - ৪

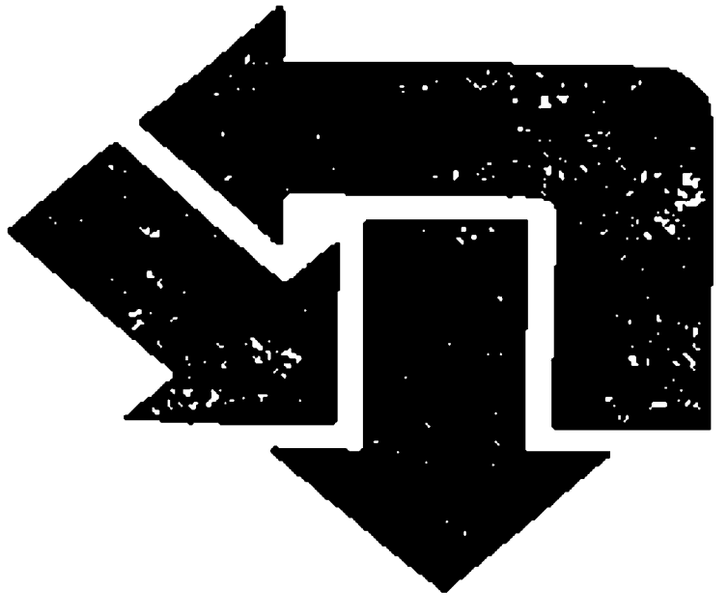

Your NEW SYMBOL of Petroleum Energy !

It may be new to you — but it is a sign recognised for leadership in petroleum progress and development in most of the world!

This is the ESSO sign — supported by the world's greatest resources of petroleum knowledge and experience.

Esso research works wonders with oil!

ESSO STANDARD EASTERN, INC. [illegible]

[illegible]

আধুনিক কাব্য পরিস্থিতি

অরুণ ভট্টাচার্য-এর
মিলিত সংসার

সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত : "তিরিশের কবিদের সর্বগ্রাসী কবিতার স্রোতে যে কলহর উঠেছে, তার অধিকাংশ তথাকথিত চল্লিশ ও পঞ্চাশের কবিদের সৎ-প্রতিভার দৃষ্টিগ্রাহ্যতায় যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি করেছে। এখন কবিতা পাঠককে স্মরণ করতে বলি, স্থির হতে বলি; এবং অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতার দর্পণে একবার নিজেদের প্রতিবিম্বিত হ'তে অনুরোধ করি। আপাত-সারল্যে কখনো কখনো 'মহৎ' আত্মগোপন করে, যেমন করেছিলো উইলিয়ম ব্লেকের কবিতায়। অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতায় নিষ্পাপ পবিত্রতা ও যন্ত্রণার অদৃশ্য অতিরিক্তি ও ছন্দের কৌশল আমাদের যুগপৎ মুগ্ধ ও বিহ্বল করে। তাঁর আর একটি বিশেষ গুণ পাঠকে তিনি শব্দাতীত গভীর ব্যঞ্জনায় উত্তীর্ণ করতে পারেন।

এবং সাম্প্রতিক কবিতায় যা দারুণ দুর্লক্ষ, অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতায় সেই আরোপিত অর্ডনার নেই, অত্রত্য কবিদের ব্যর্থ অনুস্থিতি"—'দেশ'।

অরুণকুমার সরকার
দূরের আকাশ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অরুণকুমার সরকার বর্তমান বাংলা কবিতায় দুজন প্রতিনিধিস্থানীয় কবি। আধুনিক কবিতার যা সদ্‌গুণ তা উভয়ের কাব্যেই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
জাতক ॥ লঘিন্দর

এই আশার কথা, এঁদের কাব্যে মানবতাবাদী ঐতিহ্যের গভীর সূত্র অনুসন্ধান করলে ব্যর্থ হতে হয় না। জীবন যন্ত্রণার সঙ্গে সুস্থ দার্শনিক মনোভঙ্গির আশ্চর্য মিলনেই এঁদের কবিতার সার্থকতা।

সিগনেট ও অন্যান্য পুস্তকালয়ে পাওয়া যাবে।

উ ত্ত র সূ রী

বিশেষ সংখ্যা

সাময়িকপত্র ও বাংলা সাহিত্য

●

বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রের আদিযুগ
ভবতোষ দত্ত : বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সম্পাদিত সাহিত্যপত্র
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় : প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্র
রথীন্দ্রনাথ রায় : প্রমথ চৌধুরীর মননশীলতা
সত্যব ভট্টাচার্য : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও পরিচয়
অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় : সুধীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা
মদনগোপাল সেনগুপ্ত : সাময়িকপত্রের আধুনিক যুগ

●

কয়েকটি প্রাচীন সাময়িকপত্রের প্রতিলিপি। বাংলাভাষায় প্রকাশিত সাময়িকপত্রের তালিকা প্রভৃতি থাকবে।

সীমিত সংখ্যক ছাপা হচ্ছে। যোগাযোগ করুন
সম্পাদক : ১বি-৮, কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৫০

ঐক্য ও সমন্বয়ের সাধনায় ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

উত্তরসূরী

নবম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯

ছবি : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবন্ধাবলী : অমূল্য মুখোপাধ্যায়। বিশুদ্ধ সিদ্ধের স্ব-ভাব ও সমস্যা ২৮১। লোকনাথ ভট্টাচার্য। তিনজন ফরাসী কবি, যাঁরা আমাদেরও ২৯৩। অমিয়ভূষণ মজুমদার। সাহিত্যের ধারণা ৩৩১। রোমা গ্যারী। অমিতা অ্যাচরণবোধ ও আধুনিক সভ্যতা ৩৫৮।

কবিতাবলী : নজরুল ভট্টাচার্য। গোপাল ভৌমিক। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। আরতি দাস। পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য। চিন্ত ঘোষ। প্রণব মিত্র। শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়। শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়। অশ্রুকুমার সিকদার। অসিতকুমার ভট্টাচার্য। সুরজিৎ দাশগুপ্ত। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তি লাহিড়ী। দিব্যেন্দু পালিত। মদনশঙ্কর দাশগুপ্ত। নবীন চক্রবর্তী। দিনেশ মজুমদার। বিজয়কুমার দত্ত। আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। গোতম ঘোষ। মানস রায়চৌধুরী। আলোক সরকার। সোকনাথ ভট্টাচার্য। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাম বসু। অরুণ ভট্টাচার্য। ৩১৩-৩৪৮।

বিদেশী কবিতা : সেক্সপীয়র (পাঁচটি সনেট) : মণীন্দ্র রায়। গ্যেটে : অরুণকুমার সরকার। লর্ড টেনিসন : শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়। নজরুল : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই আঘাত : মধুছন্দা মিত্র। ৩৬৭-৩৭৩।

সমালোচনা সাহিত্য : রবীন্দ্রনাথ। উত্তরসূরী : সম্পাদনা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : অসিতকুমার ভট্টাচার্য। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। মণি বাগচী : কবিতা চক্রবর্তী। শতাব্দী শতক। সম্পাদনা প্রেমেন্দ্র মিত্র ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : অরবিন্দ পোদ্দার। আলোক সরকার শ্যামসুন্দর রায়চৌধুরী শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় শান্তিকুমার ঘোষের কাব্যগ্রন্থ : মানস রায়চৌধুরী। অসিতকুমার ভট্টাচার্য অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় শান্তি লাহিড়ী আশিস সান্যালের কাব্যগ্রন্থ : মদনশঙ্কর দাশগুপ্ত। সঙ্গীত নাটক একাডেমির রবীন্দ্র শতবর্ষ সংখ্যা : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৩৭৪-৩৮৮।

আলোচনা : নলিনীকান্ত গুপ্ত। অরুণ সেনগুপ্ত। ৩৯৯-৪০৭।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কলকাতা। দূরে কাছে গ্যাসের আলোর ছোট ছোট নক্ষত্রাকে বিকেল হলেই কলকাতাকে রহস্যময় মনে হোত। চোগা চাপকান পরিহিত এক বাঙালী ভদ্রলোক হাইকোর্ট ছুটি হলে গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে ঘুড়ি গাড়ীতে চড়ে প্রতিদিনই উত্তর কলকাতার দিকে রওনা হতেন। লাটসাহেবের বাড়ীতে মিটিং থাকুক কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনেটের সভাই হোক, শত কাজের মধ্যেও বউবাজারের একটি মিষ্টির দোকানের সামনে তাঁর গাড়ীটি প্রতিদিনই থামত। দোকানের কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে বাইরে আসতেন। অর্ডার যেত, মতরকমের সন্দেশ আছে।

উক্ত বাঙালী ভদ্রলোক অমায়িক স্বার আপ্তোষ, বাঙলার বাঘ, যাঁর হৃদয় ছিল বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি। কুসুমের মত মৃদু বলেই হয়ত এই শিল্প দরদ সন্দেশের রসলালিত্য বুঝতেন তিনি।

★

ভীমচন্দ্র নাগ

কলিকাতা : হাওড়া

শিল্পী : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রভারতীর সৌজন্যে

VISVA-BHARATI

উত্তরসূরী

নবম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১৪৩৩

বিশুদ্ধ শিল্পের স্ব-ভাব ও সমস্যা

অঙ্কুর মুখোপাধ্যায়

অভিজ্ঞতা প্রতিভাত বস্তুমাত্রেই সৎ এবং সৎ বস্তুমাত্রেই যুক্তিসিদ্ধ, এই হেগেলীয় সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে হিগ্যান্স হেগেল র‍্যাপস্যাসে উত্তীর্ণ হওয়া হয়তো সম্ভব এবং র‍্যাপস্যাস ও মল্যান্স-এর সম্পর্কটা অবশ্যম্ভাবী না হলে হয়তো আপাতিক বা হতেও পারে, কিন্তু র‍্যাপস্যাস থেকে এলুয়েটিক্স-এ উপনীত হওয়া একরকম অসম্ভব বলেই মনে হয়। বিষয়টিকে আর এক রকমে উপস্থাপিত করলে বলতে পারি, গদ্যের ভাষা র‍্যাপস্যাস, কিন্তু কাব্যের ভাষা প্রাক্-র‍্যাপস্যাস। গদ্যের ভাষা যুক্তিবাক্যিত, তার প্রতীকগুলো বীজগণিতের চিহ্নের মতই সঙ্কেতময়, কিন্তু কবিতার ভাষা যুক্তির অতীত, তার শব্দগুলি প্রাণময় প্রতীক, বস্তুর সঙ্গে তাদের অন্তরের যোগ সব সময় প্রত্যক্ষ না হলেও প্রতিবোধবিধিত। গদ্যের বেশীর ভাগ, সংবাদপত্রের ভাষা, এক কথায় র‍্যাপস্যাস ভাষা অধুনা কাব্যের ভাষাকে প্রভাবিত করেছে। ফলে, এলুয়েটিক্স-এর রাজ্যে বিপ্লব ঘটেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু যথেষ্ট প্রাণময় ভাষার মৃত্যু ঘটেছে। র‍্যাপস্যাস ভাষা বীজগণিতের বিমূর্ত চিহ্নের মতই কার্যকরী। কিন্তু সে ভাষা কাব্যে অনুপ্রবিষ্ট হলে যাক এবং অর্থ, শব্দ এবং বস্তুর মধ্যেকার ছিন্ন হবে। র‍্যাপস্যাস থেকে এলুয়েটিক্স-এ পৌঁছবার এই প্রয়াস তাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। বাহিরের রীতি এবং নীতির প্রভাবে কাব্য তথা শিল্পরীতি ও নীতি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, আধুনিক কালের পক্ষেই কবিতা থাকা সম্ভব।

কবি-জীবন, ওঁর আয়ুষ্যক ক্লান্তি এই দুঃসাধ্য সাধনের ব্যর্থতা থেকেই উদ্গীত বলে মনে হয়।

কবিতার বাহন হিসাবে র‍্যাঁবো পদ্য-ভঙ্গী ত্যাগ করে গদ্যভঙ্গী অবলম্বন করেছিলেন। পদ্যের নিহিত ছন্দ এবং শব্দ-সম্ভার দিয়ে কবিতার মধ্যে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চার করার প্রয়াস শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হ'ল বিশুদ্ধ কবিতা সৃষ্টির বিফল উদ্যমে। লোক-ভাষার ব্যবহৃত শব্দ এবং তার অর্থের সামুজ্য হারিয়ে, সেই শব্দসমূহের অন্তস্তরে অসাধারণ অর্থ আবিষ্কারের মধ্যে যে বিকৃতবুদ্ধির পরিচয়, "বিশুদ্ধ কবিতার" প্রচারকদের মধ্যে তার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি। কবিতা যদি শুধুমাত্র শব্দসৃষ্টি চিত্রকল্পের মালা মাত্রে পর্যবসিত হয়, তবে সে কবিতা গদ্যধর্মী হলেও ক্ষতি নেই। বিশুদ্ধ কবিতা, যার মধ্যে অ-কবিতার প্রবেশ নিষিদ্ধ, বস্তুমুক্ত বিকল্প-চিন্তার সঙ্গেই যা উপমেয়, জীবন থেকে, প্রাত্যহিক বাচনভঙ্গী থেকে, জীবন্ত মানুষ থেকে শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। র‍্যাশনাল ঘুসে কবিতায় বিশুদ্ধি রক্ষার প্রয়াস কবিতার প্রাণধর্মকে আঘাত হানলো সর্বাধিক।

দান্তের "ডিভাইন কমেডি" শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুখপাঠ্য না হতে পারে, বহু স্থানে দুরূহ বোধ হতে পারে, "বিশুদ্ধ কবিতার" এস্থেটিক মাপকাঠিতে বহু পদের সৌন্দর্য সুলক্ষিত না হতে পারে, তবু সন্দেহ নেই, ওটা কবিতা। সমগ্রভাবে ডিভাইন কমেডি'তে যে বিশ্ববীক্ষা, যে জীবনবোধ, যে লিরিক এবং ক্লাসিক সৌন্দর্যের সমাবেশ, অন্যত্র তা দুর্লভ। হোমরের মহাকাব্য, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মহাভারত, বাল্মীকির রামায়ণ—এই সব চিরঞ্জীব সৃষ্টির ধারা ধরে, উত্তরকালে ও-দেশে এবং এ-দেশে যে সব প্রথম শ্রেণীর, এমন কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্লাসিক-ধর্মী দীর্ঘ অথবা লিরিক-ধর্মী দীর্ঘ কবিতা রচিত হয়েছিল, একই সঙ্গে জনচিত্ত এবং মহাজন-চিত্ত সম্মোহনে তাদের সাফল্যের কারণ, বিশ্বের মৃত্তিকা-রসে, ধর্মাশ্রিত মূল্যবোধের প্রাণ-স্পর্শে, জগদ্ব্যাপারের প্রতীকী কাব্য-চিত্র উদ্ঘাপনে তাদের সার্বত্যে। এই সার্বত্যের তর-তম অবশ্যই ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট স্তরের কবিতাও অপাঠ্য ছিল না, তাদের বাচন-ভঙ্গী এবং প্রতীকী তাৎপর্য ছিল সর্বজনবোধ্য। অবক্ষয়ের যুগে কবিতা যখন সত্যই অচল এবং অপদার্থ আদর্শ এবং অদ্ভুত ও উদ্ভট প্রতীক ও শব্দের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, তখন তীব্র আত্ম-চেতনসম্পন্ন কবিকুল কবিতার

বিশুদ্ধি রক্ষার এই প্রক্রিয়ার বিপরীত প্রান্তে উপনীত হতে বাধ্য হন। সংযম এবং শাসনের চাপে কবির ব্রত প্রায় যতির ব্রতে পরিণত হয়। তবু "বিশুদ্ধ কবিতা" খ-পুষ্পের মত বিকল্পনাথাই থেকে যায়। মালার্মের অসাধারণত্ব সত্ত্বেও এ কথা সত্য।

এ বিষয়ে এলিয়টের একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি সর্বথা প্রণিধানযোগ্য। "If you aim only at the poetry in poetry, there is no poetry either." এই উক্তির দ্বারা এলিয়ট "বিশুদ্ধ কবিতার" সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আত্যন্তিক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। লোকভাষার শব্দসম্ভারকে বিশুদ্ধতর অর্থগৌরবে সমৃদ্ধতর করে', তার দ্বারা কবিতার মূল আবেগ উদ্ধার এই কারণেই সম্ভব হয় নি। সাধারণের ভাষাকে স্বেচ্ছামত বিকৃত করে এক শব্দের বদলে অসাধারণ কৌশলে অন্য শব্দ যোজনা করে, প্রচলিত অর্থ থেকে শব্দকে বিচ্ছিন্ন করে, শব্দের বাসাদ এবং উচ্চারণভঙ্গীকে ভিন্ন রকমের আকৃতি ও প্রকৃতি দান করে রবেদ তাঁর গদ্য-কর্মে বিশুদ্ধ কবিতার আদর্শ এবং উপলব্ধির আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। প্রচলিত পুরাতন শব্দের ভিন্নতর প্রতীকী সম্ভাব্যতা কিন্তু অন্তর্ভাষী রূপে তাঁর সাই শব্দ এবং বাক্য এর মধ্যে অনিবার্য হয়ে ওঠে নি। বিরল প্রতিভার র‍্যাডিক্যাল চিন্তাপ্রসূত এই অবশ্য তাঁর "বিশুদ্ধ শব্দ" সৃষ্টির বিরল এবং চরম উদাহরণ।

এ-দেশে মহাভারত, রামায়ণ এবং পুরাণাদির কাহিনী, শব্দ এবং প্রতীকের ওপর ভিত্তি করে অনেক শতাব্দী যাবৎ যে কাব্য এবং কবিতা রচিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তার চরম এবং পরম পরিণতি। মহৎ কবি ভাষার আপেক্ষিক অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দান করে থাকেন; ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ বাক, অর্থ, শব্দ এবং প্রতীক, উপমা এবং উৎপ্রেক্ষাকে এমন একটি প্রসন্ন রূপ দান করে থাকেন যে, মনে হয়, বাক এবং অর্থের হরগৌরী মিলন, প্রতীক এবং প্রতিমার (ইমেজ) রাজযোটক, শব্দ এবং বস্তুর প্রত্যক্ষ যোগ সাধিত হয়েছে অতি সহজে। রবীন্দ্রকাব্যে ভাষার এই পরমাশ্চর্য আবির্ভাব এ কালের এক যুগান্তকারী ঘটনা। পরবর্তীগণের পক্ষে এ জিনিষ স্বাভাবিক কারণেই সহজসাধ্য নয়, এমন কি আয়াসসাধ্যও নয়। যে প্রত্যয়ভূমির ওপর রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়েছিলেন, পরবর্তীদের পায়ের তলা থেকে তা অপসৃত। এই প্রত্যয় ছাড়া কাব্যের কোন Content Value সম্ভব নয়। রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে

কবিতার আধেয় অপেক্ষা আধারের গুরুত্বই সমধিক উচ্চারিত। দেহ এবং দেহী, আধার এবং আধেয়, এর মধ্যে দেহী অথবা আধেয় কবিতার অঙ্গ থেকে অন্তর্হিত, বাকী থাকে শুধু আঙ্গিক। অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি-প্রবণ কবিমানসে আগন্তুক থাকে কবিতা সম্বন্ধে এক বিশেষ ধারণা—idea of poetry; এই বস্তুটিই শেষ পর্যন্ত সোনেট্টের স্থান বে-দখল করে। আধুনিক তথা অতি-আধুনিক বাংলা কবিতার এই বস্তুটি য়ুরোপের "বিশুদ্ধ কবিতার" পূজারীদের মতো সোচ্চার না হলেও নিতান্ত অনুচ্চারিত নয়। অর্থহীন শব্দসমষ্টি নয়, বিশেষ এবং বিশিষ্ট অর্থপূর্ণ শব্দ, অথচ সাধারণের, সমাজের সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন এক বিশেষ, বিশুদ্ধ কাব্য জগতে তাদের অপসারণ—এই হলো আধুনিক কবিদের চৈতন্যিক, কলা-কৌশল। সর্ব মানুষের দেহ-মন-আত্মার, ঐতিহ্যেতিহ্যবাদ এবং আধ্যাত্মিক আহার্য যোগান দিত যে কবিতা, তা অতীতের বস্তু। রবীন্দ্রযুগেও অক্ষয় মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবি যে কৃতির ছাপ রেখে গেছেন, বর্তমানে অধিকাংশ কবির পক্ষেই তা দুরধিগম্য। তবু এই কবিকুল একটি মাত্র প্রত্যয় অবলম্বন করে এখনও কবিতা রচনা করে চলেছেন। সে প্রত্যয় কবিতা সম্বন্ধে, কবিতার পরমাশ্চর্য ঐশ্বর্য সম্পর্কে, কবিতার বিশুদ্ধির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে। এই প্রত্যয় হয় তো একদিন ফেলে-আসা প্রত্যয়-ভূমির, বিশ্বের মানুষ-স্রোতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। ধ্বনি এবং অর্থ, দেহ এবং আত্মা, একান্ত এবং অনেকান্তের মিলন হয়তো যা সম্ভব হবে, আর সম্ভব হবে সেই কবিতা, যার প্রসার এবং লক্ষ্য কোন বিশেষ কবির অন্তর্ধন নয়, সর্ব-সাধারণের সম্পত্তি।

কবিতার ক্ষেত্রে যে আলোচনা প্রাসঙ্গিক, চারুশিল্পের ক্ষেত্রেও তা অপ্রাসঙ্গিক নয়। ল্যাণ্ডস্কেপ আমার চোখে কাব্যের আত্মা অপহৃত, চারুশিল্পও বিকারগ্রস্ত। তুলির ভাষা সমগ্র সত্তা দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে, রসোপলব্ধির জন্যও চাই সমগ্র সত্তার জাগরণ। প্রাচীন হিন্দু বৌদ্ধ বা জৈন আর্ট, কাংড়া, জয়পুরী, মুঘল বা রাজপুত চিত্রকলা, আধুনিক কালের অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্র-নন্দলাল, এদের পাশাপাশি তথাকথিত ক্যালকাটা স্কুল এবং অন্যান্য স্কুলের ছবি যখন আমরা দেখি, তখন একটি পীড়াদায়ক উপলব্ধি হয়। ঐতিহ্যাশ্রিত প্রাচীন বা আধুনিক মাষ্টারপিসের শিল্পীরা সমগ্র সত্তা দিয়ে আর এক সত্তাকে বুঝতে চেয়েছেন, এই একান্মতা এক ধরণের act of love: হৃদয় বা সত্তার

সমস্ত ইন্দ্রিয়বেদ্য এবং সংবেদ্যতম বৈশিষ্ট্যগুলি এই প্রেম-ক্রিয়ার ফলে মূলগত দীপান্বিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আধুনিক স্থূল র‍্যাশনাল মনীষার মানদণ্ডে বস্তু বা সত্তাকে বিচার করে' তার কয়েকটি অসংলগ্ন এসথেটিক বৈশিষ্ট্যকে অস্থির অঙ্গুলি-অগ্রে ধরে রাখতে চায়; সমগ্র সত্তার সংবেদনার প্রশ্ন ওঠে না, মাত্র স্নায়ুমণ্ডলীর অতি স্পর্শ-কাতর উপরি-ভাগের আলুতো ছোঁয়ার স্পর্শে ছবি হয়ে ওঠে conception of perception; দৃষ্ট সত্তাকে এড়িয়ে মাত্র ধর্মসঞ্জাত ধারণাকে মগজে ধরে রাখা এবং সেখান থেকে ক্যানভাসের ওপর স্থানান্তরিত করার অতি সূক্ষ্ম যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার যোগফলই সম্ভবত নন্‌অবজেক্টিভ আর্ট। "বিশুদ্ধ কবিতার" idea of poetryর মতই তথাকথিত বিশুদ্ধ আর্টের এই perception of conception রসোবেদনা এবং রূপকর্মের দিক থেকে নিরর্থক। তথাকথিত ঐতিহ্যাশ্রয়ী আর্টিস্টরা জীবন ও বস্তুর কতকগুলি নিগূঢ় প্রশ্ন, জগৎ ও জীবনের রূপ লিখতে চেয়েছিলেন পটে, পাথরে, প্রতিমায়। তার মধ্যে দেখতে পাই সমগ্র সত্তার আশ্রিত স্পর্শ। সব রকমের শিল্পবস্তু বিচারের একটি বড় নিরেখ নিশ্চয়—আর্টিস্ট সমগ্র সত্তা দিয়ে বস্তুটিকে ছুঁয়েছে কি না। ইম্‌প্রেশনিজম্, এক্সপ্রেশনিজম্, সুররিয়ালিজম্, কিউবিজম্—এসব প্রশ্ন গৌণ। উনবিংশ শতকের পশ্চিমী আর্টের আবেদন দর্শকের রেটিনার ওপর, আর বিংশ শতকের আর্টের আবেদন বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তির ওপর, এসথেটিক ক্যাকাস্টির বিশ্লেষণ শক্তির ওপরই তার ঝোঁক। সিজান সমগ্র বিশ্ব সংসারকে দেখেছিলেন বিশুদ্ধ বর্ণরূপে; তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে জগৎ সংসারের পুনর্গঠিত বর্ণময় রূপ ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর অক্ষম অনুকারীরা তাঁর টেক্‌নিকের অংশবিশেষ গ্রহণ করে পরিণামে 'কিউবিজম' এর প্রচলন করেছিল। কিউবিষ্টদের টেকনিক বিশ্লেষণাত্মক। কিন্তু তাঁরা কোন বস্তু বা সত্তার বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ না করে, মগজোদ্ভূত রূপকর্মকেই বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে থাকেন। উক্ত রূপকর্মের কতকগুলি বিশ্লিষ্ট, বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন অংশবিশেষকে পুনর্যোজিত করে তার কাঠামোটা (ট্রাকচার) ফুটির টানে তুলে ধরেন। একে রূপসৃষ্টি বলে না, বিশুদ্ধ, বস্তুর সমসৃষ্টির মতই এ-ও এক ধরণের সেরিব্র্যাল জিম্‌ন্যাষ্টিক।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসাদ হাতে, র‍্যাশনাল প্রকাশ-পদ্ধতি সম্বল করে, উনবিংশ শতাব্দীতে যে আর্ট ইয়োরোপে আবির্ভূত হলো, এবং যার অক্ষয়

অন্তকরণে এ-দেশের কলাশিল্পী অবলম্বনুখী হয়ে কালযাপন করছেন, তাঁরা তাঁরা জীব ও জগৎ, জন্ম মৃত্যুর ওপর কোন নতুন আলোপাত করে না। জগৎকে প্রকাশ করতে সে অভিমুখ নয়, ইচ্ছার অনুৎপত্তি নয়, সামগ্রিকভাবে এ সম্পর্কে তার অনীহাই আধুনিক আর্টের আধির লক্ষণ। বস্তুকে প্রকাশ নয়, তার পরিবর্তে কতকগুলি রেখা-সম্বন্ধ একটি প্যাটার্ন এবং কয়েকটি মিশ্র বর্ণচ্ছটা। বস্তুকে বাতিল করে দিয়ে, তার শূন্য আসন দখল করেছে এই প্যাটার্ন আর বর্ণচ্ছটা। কিউবিষ্ট আর্টের এই অ্যাবষ্ট্রাকশন আধুনিক সমস্ত স্কুলকে প্রভাবিত করেছে। অবশ্য প্রকৃতি বা বস্তুর হুবহু প্রতিকৃতি মধ্যযুগীয় বা ক্লাসিক যুগের আর্টেও স্থান পায় নি, কিন্তু সেখানে মানবিক আবেদনের অপলব ঘটে নি। বাস্তবাশ্রি আর্টে বস্তুর আকারের চেয়ে বস্তুর প্রকার, আকৃতির চেয়ে প্রকৃতি অগ্রগণ্য হিসেবেচিত হয়েছে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই বিশুদ্ধ তথাকথিত রূপ বা pure form এর খাতিরে উপাদেই বিসর্জিত হয় নি।

শিল্পসৃষ্টির জন্য নিরপেক্ষ, অনাসক্ত দৃষ্টি আবশ্যক। কিন্তু সৃষ্টির একটি পর্যায়ে একাগ্রতা ব্যতিরেকে বস্তুর রূপজ্ঞান অসম্ভব। দেখো জুড়া দেখং বুজেৎ —এই হল শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ। র‍্যাশনাল ভাষায় বস্তুর এই রূপ ও রস ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। বর্তমানে শিল্পীর এবং বৈজ্ঞানিকের সমস্যার মধ্যে প্রকৃতিগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। শিল্প যদি কতকগুলো বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায়, তবে রূপবিৎ এবং রূপস্রষ্টার পক্ষে সমস্যা ক্রমশঃ ঘনীভূত হবে।

অখণ্ড ঐক্য, সমন্বয়ী ঐক্যের ওপর জোর দিয়েছিলেন রোদলেয়র, যদিও অদৃষ্টের পরিহাসে এই ঐক্যের সন্ধানে তিনি বরং ব্যর্থকাম হয়েছিলেন। এক এবং অনেকের ঐক্য, শব্দ এবং অর্থের ঐক্য, প্রতীক এবং প্রত্যয়ের ঐক্য, faith এবং myth, এর ঐক্য—এক কথায় আর্ট এবং রিলিজন এর ঐক্য, এই হল সর্বযুগে বস্তুতন্ত্র আর্টের অন্বীষ্ট এবং অভিষ্ট। রিলিজন এর স্থানে র‍্যাশন্যালিটিকে বসিয়ে আর্টকে যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত রূপদান করার প্রয়াস অসার্থক। অন্তপক্ষে আর্টও রিলিজনের বিকল্প রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না। ধর্মাশ্রিত মূল্যবোধের আত্যন্তিক অপলব ঘটলে তার স্থানে রিলিজন্ এর পূজা, অভিনব হলেও আর্টের ক্ষেত্রে নিতান্তই সৌত্তলিকতা। আবার রিলিজন্ এর অবক্ষয়ে বহুর থেকে বিচ্ছিন্ন একক আর্টই অথবা বহুর মধ্যে আত্মলুপ্ত আর্টই যথাক্রমে উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অথবা নৈর্ব্যক্তিক যূথবদ্ধতাকে আশ্রয় করে যে

আর্ট সৃষ্টি করেছেন, তাতে রিলিজম্ এর ছাপ থাকলেও, অমৃতলোকের আড়পত্র নেই।

একজন গাণিতিক, একজন এঞ্জিনিয়ার, একজন মেকানিক—এঁদের সঙ্গে একজন আর্টিষ্টের তফাৎ অনেকখানি। বীজগণিতের সমীকরণ তথা যুক্তি-শাস্ত্রের সহজীকরণের মতই শিল্পবস্তু সহজ সরল হতে পারে, কিন্তু গণিতের বিমূর্ত সঙ্কেতচিহ্নের সঙ্গে আর্টের প্রতীকী প্রকাশের কোন মিল নেই। বিজ্ঞানের প্রত্যয়ভূমি এক, আর্টের প্রত্যয়ভূমি প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন। গাণিতিক, এঞ্জিনিয়ার বা মেকানিক সীমিত নিয়ম, অর্থ বা মিনিং-এর দৌহদ্যির মধ্যে,—এক কথায় ট্রু প্রিন্সেপ্টের রেখা অঙ্কনের সীমার মধ্যে স্ব-স্ব সৃষ্টি সম্ভবপর করে তোলেন। আর্টের প্রতীকী ভাষা সর্বসীমালঙ্ঘী। অন্যসহিত অর্থকে অতিক্রম করে তার ধ্বনিরূপ অসীমকে স্পর্শ করে বলেই আর্ট অনির্বচনীয়, অনির্বচনীয়। ন্যাশনাল ভাষা চিন্তাকে, ভাবনাকে রূপদান করতে পারে, আর্টের প্রাক্-ন্যাশনাল ভাষা রূপাতীত করে অনির্বচনীয়কে। মেকানিকের সঙ্গে আর্টিষ্টের পার্থক্য এইখানেই : স্রষ্টিবস্তুতে আর্টিষ্ট সমর্পন করে দেহ-মন-আত্মা। সর্বসমর্পনের মূল্যে, সমগ্রের মূল্যে এমন কি সর্বাতীতের মূল্যে আর্টিষ্ট লাভ করে সর্ব-অতিক্রান্ত নিঃস্রোত। আধুনিক কালে, ন্যাশনাল ভাষার দায়ক-মুখ তীক্ষ্ণতায়, বস্তুর অতর্কিত চিত্রের রূপ উদ্ঘাটিত হয়ে থাকে, অ্যানালিটিক্যাল ডিসএক্টির সূত্র ধরে বাক্যের গঠনরীতির মধ্যে, প্রতিভার প্রকল্পের মধ্যে বিধৃত সৎ বা সত্যকে সুনির্দিষ্ট রূপ দান করা হয়ে থাকে, সমগ্র মানুষকে পরিহার করে তার কয়েকটি মুক্ত, ন্যায়ার, আচরণ এবং আবরণকে প্রকাশ করা হয়ে থাকে যুক্তি-যোজিত মানবিকতার মানে। কিন্তু বিস্ময়ের কিছু নেই, এই মানবতন্ত্রী আর্ট থেকে মানুষ পলাতক।

আধুনিক কালে, লজিক্যাল পজিটিভিজম্ বা যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যক্ষবাদের যুক্তির তুলাদণ্ডে নয়্যাপিটি এবং এসথেটিক্স্ অসিদ্ধ। যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যক্ষ-বাদের চতুঃসীমার মধ্যে ক্যাট থেকে ভালুর জগতে উপনীত হওয়ার কোন রাস্তা নেই। এক কথায় যুক্তি থেকে নীতিতে এবং নন্দনে পৌঁছবার কোন পথ নেই। ঈশ্বরের প্রমাণে যুক্তির খাদর খুঁজতে যাওয়া যেমন বিপজ্জনক, নীতি এবং নন্দন, নয়্যাপিটি এবং এসথেটিক্স্-এর সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষবাদের তেমনি কোন প্রশ্ন নেই। এক কথায় প্রত্যক্ষবাদের বিচারে এ সবই জ্ঞানের

অধিষ্ঠিত। সুতরাং, অতি-আধুনিক যুক্তিসম্মোহিত অ্যানালিটিক্যাল ফিলজফি বিশ্লেষণাত্মক দর্শন—ক্ষুরধার যুক্তির খড়্গাঘাতে নীতি এবং মঙ্গলকে র‍্যাশনালিটির চৌহদ্দি থেকে বিতাড়িত করেছে। বিস্ময়ের কিছু নেই যে, র‍্যাশনাল ভাষা, শব্দ এবং বাক্যের বিস্ময়কর বিচ্ছুতি সত্ত্বেও আধুনিক কবি এবং শিল্পীদের অনেকেই রসসৃষ্টির দিক থেকে অসার্থক।

প্লেটোর শিবকল্পনায় Mathematics এবং good, গাণিতিক সত্য এবং শুভের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী, যদিও এতদুভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন অনায়াসসাধ্য নয়। কিন্তু প্লেটোর চাতে মহামনীষীও এই সত্য এবং শুভের সঙ্গে সুন্দরের মিলন ঘটাতে পারেন নি। এই কারণেই তাঁর Ideal Republic থেকে কবিকুল নির্বাসিত। এ দেশেও আর্টকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে নিরভিপ্রেতনিমনরহিত আখ্যান। যুক্তির নিরীখে এই উক্তি নিরর্থক। উক্ত নিরীখে Truth হচ্ছে function of a proposition. কোনও বিষয়, বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কিত জিজ্ঞাসাকে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া-সমন্বিত বাক্যের দ্বারা একটি যথোচিত প্রতিজ্ঞার আকারে উপস্থাপিত করলে সেই বাক্যের মধ্যেই সৎ বা সত্য অন্তঃস্থিত থাকবে। এই সৎ সত্য যদি হয় বুদ্ধিদীপ্ত, তবে আর্ট বা শিল্পের সৎ বা সত্য বোধিদীপ্ত। আর এই বোধিদীপ্ত সত্যের আকর্ষণী শক্তিকেই খামখামি শিল্পশাস্ত্রের ভাষায় বলা হয় সুন্দর। এই সুন্দরের সঙ্গে শিব বা শুভের মিলন সব সময় প্রত্যক্ষ না হলেও, প্রতিবোধবিদিত। দান্তের ডিভাইন কমেডি'র মধ্যে শিব এবং সুন্দর, বিউটি এবং মর‍্যালিটির অর্ধনারীশ্বর রূপ। শেল্লি'র আহ্বোলিত মেঘুরম তাণ্ডবাদের রহস্যে মেদুর। ভূবিস্পর্শদুরন্ত অশ্বারোহিত মাটিকে মাদ দিলেও তথাগত, মায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী এই পৃথিবী, একটি শিবসিক ক্রিয়ার মাধ্যমে এই মাটি হলো চৈতন্যময়। নীতি এবং মঙ্গল, সুন্দর এবং শুভের অভাবনীয় মিলন ঘটেছে hieratic art-এর মধ্যে।

নীটশে বলেছেন : The world has got no moral justification, its only justification is aesthetic. জগৎ ব্যাপারের পশ্চাতে কোন নৈতিক সমর্থন নেই, একমাত্র রূপসৃষ্টির দিক থেকেই, রসোবেদনার দিক থেকেই জগৎ ব্যাপার সমর্থনীয় তথা সহনীয়। অতিশয়োক্তি থাকলেও নীটশের এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য। সৃষ্টির পশ্চাতে যে বেদনা, অস্তিত্বের বুকে যে চিরন্তন ক্ষত, প্রত্যহের ধূলি-মালিন্যের মধ্যে মানুষ এবং মনুষ্যত্বের পরাজয় এবং

অপমৃত্যু, কোন নৈতিক মানদণ্ডেই তা সমর্থনযোগ্য নয়। একমাত্র রূপসৃষ্টি এবং রসোবেদনাই এই জগৎ ব্যাপারকে অপরূপ রূপ দান করতে পারে। অন্যথা ট্রাজেডি মানুষকে এমন গভীর ভাবে আলোড়িত করতে সমর্থ হত না।

দৃশ্যমানের মধ্যে actor এবং spectator-এর পৃথক অস্তিত্ব নেই, ড্রামার মধ্যে পৃথক হয়ে গেল অভিনেতা এবং দর্শক, জগৎ-সংসারের বিরাট রঙ্গ-মঞ্চে মানুষ-মাত্রেই একই সঙ্গে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি, অভিনেতা এবং দর্শক, একই সঙ্গে দৃশ্যমান এবং ড্রামার কর্তাকৃৎ ও কারকৃৎ। স্টেজের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার, বিরাট অহঙ্কার এবং সুমহৎ স্বার্থত্যাগ ড্রামার অন্তর্নিহিত মিথ এবং মিনিং, প্রতীক এবং প্রত্যয়ের রসস্থ উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করে। জগৎ-সংসারের স্টেজে দুঃখ, মৃত্যু, বিরহবেদনাকে এই হেতুনেই এবং এস্‌থেটিক্ প্রকাশ রূপে গ্রহণ করতে পারি।

কিন্তু এই এস্‌থেটিক প্রকাশ একই সঙ্গে মহান। মানুষের সঙ্গে নীতি অঙ্গাঙ্গী। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন, ইডিপাস্, আগামেম্‌নন্, ইলেক্‌ট্রা, ওরিষ্টিস—এদের ট্রাজেডি গহন গভীর মনকে আলোড়িত করে, এখানে fate এর পাশাপাশি রয়েছে অপরাজেয় faith; তাই এই সব ট্রাজিক চরিত্র একই সঙ্গে সুন্দর ও শুভের স্রষ্টা। এই faith বা প্রত্যয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যাজিক হিরো স্টেজ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে, ঘটনাটি বিশেষ লক্ষণীয়। ইবসেন, ষ্ট্রীণ্ডবার্গ, বার্নার্ড শ', ও' নীল, পিরাণ্ডেলোর নাটকীয় চরিত্র সমূহের মানবিকতা প্রশংসনীয়। র‍্যাশনাল বা ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল ড্রামার কেন্দ্র থেকে myth এবং faith-কে অপসৃত করে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে র‍্যাশনাল মানবিকতা। কিন্তু তারই সঙ্গে ঘটেছে ট্র্যাজেডির অপমৃত্যু। পিরাণ্ডেলোর নাটক ষট্-চরিত্র নাট্যকারের কাছে প্রার্থনা করছে বাক এবং অর্থের সংহতি, যা তারা দান করবে তাদের ট্র্যাজিক পরিণতিকে। নাট্যকার অবশ্য স্বাভাবিক কারণেই এই চরিত্রগুলিকে ট্র্যাজিক পরিণতিতে উত্তীর্ণ করে দিতে অসমর্থ হয়েছেন। প্রাণ প্রবাহের (elan vital) আঘাতে ব্যক্তির প্রাণাবেগ ভিমিত, স্তব্ধ, সুতরাং একমাত্র পার্শ্বা যা যুযোধ সহন করে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকায় আমরা অভিনেতা মাত্র, যুযোধসুক্ত মানুষটির সন্ধান পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব; তাই নাটকেও আমরা সার্থক নই, ন ৫

die naked,—এ মৃত্যু অসার্থক। ট্র্যাজিডি হিসাবে তাই এই ইন্‌টেলেকচুয়াল নাটকও অসার্থক।

কবিতার মধ্যে শুধু বিশুদ্ধ কবিতা যেমন খুঁজে পাওয়া যায় না, কবিতার প্রতীক ও প্রতিমা যদি কোন মহত্তর বস্তুর স্মারক না হয়, কবিতাও যেমন তবে নিরর্থক, ঠিক সেই ভাবেই মানবতন্ত্রী নাটক তথা আর্টের অন্যান্য ক্ষেত্রেও মানুষের সঙ্গে মানুষের অতিরিক্ত কোন ভ্যালু যদি না থাকে, তবে সেই ইন্‌টেলেকচুয়াল তথা ন্যাচারাল আর্টের মধ্যে মানুষের অস্তিত্বও হবে আণুবীক্ষণিক।

রুশীয় এবং অন্যান্য দেশের যুগে আর্ট জিনিষটাকে আমরা মানবিকতার সংজ্ঞায় সঙ্কুচিত করতে চেয়েছি। কিন্তু এর ফলে আর্ট মহত্তর হয় নি, মানুষও স্ব-মহিমায় দীপ্ত হয়ে ওঠে নি। নিজেকে অতিক্রম করার ক্ষমতা আছে একমাত্র মানুষেরই। আর্টে যদি মানুষের এই স্ব-অতিক্রান্ত রূপ ফুটে না ওঠে, তবে আর্ট এবং মানুষ দুই-ই ক্ষুদ্রতার আবরণে ঢাকা পড়ে। ন্যাচারাল তাদের শিল্পীর কাছে অহংএর মুক্তির আর প্রাক-ন্যাচারাল তাদের শিল্পীর অতীত অহং থেকে মুক্তি। শেষোক্তটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে আর্টের মোক্ষ।

তিনজন ফরাসী কবি, যাঁরা আমাদেরও

লোকনাথ ভট্টাচার্য

কাব্য সম্বন্ধে লেখা কাব্য হয় না, সাহিত্য সম্বন্ধে লেখা সাহিত্য হয় না, শিল্প সম্বন্ধে লেখা শিল্প হয় না—আমি। তবু মাঝে মাঝে দেখা গেছে ইতিহাসে, এবং ভবিষ্যতেও দেখা যাবে, কবিরা সাহিত্যিকরা শিল্পীরা নিজেরাই লিখতে বসেছেন কাব্য বা সাহিত্য বা শিল্প সম্বন্ধে, কখনো ক'ষ্টে তুলতে একটি তত্ত্ব যাকে তাঁরা নির্বিশেষে আখ্যা দিতে চান দেশ-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে, কখনো বা শুধুই আরো জোর স্পষ্ট ক'রে ফুটিয়ে তোলার অভিপ্রায়ে যথার্থ কী বস্তুটি তাঁরা, সেই কবিরা বা সেই সাহিত্যিকরা বা সেই শিল্পীরা, বলতে চান, এবং যেভাবে তাঁরা সেই বস্তুটিকে বলতে পেরেছেন বা বলতে চেয়েছেন, তা এমন একটি বিশেষ দৃষ্টি, অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দর্শন পর্যন্ত, ও ভঙ্গীর কাঠামোর মধ্যে পড়ে কি না থাকে বলা যেতে পারে তাঁদের ব্যক্তিগত, তাঁদেরই মৌলিক। এই দুটি অভিপ্রায় ও প্রচেষ্টার মধ্যে দ্বিতীয়টির পরিব্যাপ্তি লেখার আয়তনে দীর্ঘতর ও লেখকদের অনুভবের প্রচণ্ডতায় মহত্তর, এবং সেটাই স্বাভাবিক। কারণ প্রথমত বিশেষকে বাদ দিয়ে কোনো নির্বিশেষই দাঁড়ায় না, বিশেষের সমষ্টিকে ছ'য়েই নির্বিশেষ যেতে পারে একটি সামগ্রিক চেতনা, অন্য না থাকলে অন্তরের অর্থ তো নেই-ই, সত্তাও নেই। দ্বিতীয়ত, এবং যে কারণটি প্রধান, সকল বিজ্ঞান ও অন্তত আংশিকভাবে সকল দর্শনও যেখানে হ'তে চেয়েছে নৈর্ব্যক্তিক সত্য, কাব্য বা সাহিত্য বা শিল্প, এক কথায় সকল শিল্পসৃষ্টি, সেখানে হ'তে চেয়েছে একটি ব্যক্তিবিশেষের অভিব্যক্তি, তার আমি-র আত্মিক চেতনা বা বেদনা বা অভিনিবেশের প্রকাশ। বিজ্ঞানেও, এবং দর্শনে তো বটেই, আজকাল ক্রমশই দেখা যাচ্ছে যে তথাকথিত সেই নৈর্ব্যক্তিকতাটি শেষ পরীক্ষায় একটি মানহীন আপেক্ষিকতার মায়াজাল, তাতেও প্রতিফলিত ব্যক্তিগতের চেতনা ও অভিজ্ঞতা। কিন্তু তাতে সেই নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার প্রয়াসটি সর্বদাই বর্তমান থাকে, এবং তা খোলাখুলিই আসিয়ে নেওয়া হয়েছে। তা' যে সত্যটিকে ধরতে চেয়েছে তা' শুধু আমার বা তোমার হয়ে না, ঐ গাছের, ঐ পাখির, ঐ ধুলোর বা ঐ তারার হয়ে না,

তা' সত্য হবে এই আমাদের, ঐ তাদের সকলের পক্ষে। কাব্য কিন্তু গলা কাটিয়ে হ'তে চাইল নিতান্তই "আমার" ব্যক্তির—কবি বললে "আমারই চেতনার রঙে পাকা হ'ল আমুল।" শিল্পীও তার গায়ের জোরে, বরং তুলির জোরে, আঙুলে নিরন্তর চেনার পরিচিত আকার, তাকে দিতে একটি আকৃতি, ও প্রকৃতিও, যা তার একান্তভাবে নিজেরই পরিচয়ের, যা তার একান্তভাবে ব্যক্তিগত, আপনার।

অন্যদিকে, রয়েছে নির্বিশেষও—সে-ই পরম সত্য, অধিষ্ঠিত সকল শিল্প-সাধনার পথের শেষের মন্দিরে। অন্ত যা বিশেষকে থাকতেই হবে সাধনার মাধ্যম ও উপকরণ হিসাবে, কিন্তু তারা কখনোই সাধনার লক্ষ্য হ'তে পারে না —এবং যদিই বা হয় তো সে সাধনা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য অনিবার্যভাবে। চিরকাল তাই দেখা যায় শিল্পদৃষ্টি চেয়েছে সেই নির্বিশেষকে ধরতে, বাঁধতে, প্রকাশ করতে। কবি সাহিত্যিক শিল্পীরাও যখন তাঁদের সাধনার একটি তত্ত্ব খুঁজতে চেয়েছেন বা তাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, তখন বিশেষকে প্রায়ই ভুলে থ'রে দেখতে চেষ্টা করেছেন নির্বিশেষের পরিপ্রেক্ষিতে, দেশ-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে।

উক্ত দুটি প্রচেষ্টার প্রত্যেকটিই স্রষ্টার পক্ষে একটি বিধুর, মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। সূর্যাস্তকে পাওয়া গেল না, যাবে না, সূর্যাস্তের বিশ্লেষণে। তবে কবিদের সাহিত্যিকদের শিল্পীদের এই যে সমস্ত উক্তি তাঁদের পথ বা সাধনা বা অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে, যাকে তাঁরা প্রায়শই তাঁদের তত্ত্ব বা দৃষ্টি বা দর্শন বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন, তা স্বয়ং কবিতা বা শিল্প বা সাহিত্যের সম্পূর্ণতা অর্জন না করতে পারলেও তার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ আছে শিল্পচেতনার সমকালীন ও ঐতিহাসিক ধারায় প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত, তা' প্রায় সব ক্ষেত্রেই কোনো বিশেষ কবি বা সাহিত্যিক বা শিল্পীর সৃষ্টিসাধনাকে আরো একটু ভালো ক'রে বুঝতে সহায়তা করে। দ্বিতীয়ত, ও মুখ্যত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের নিজস্ব কারখানা থেকে বেরিয়ে এসে এই সব কবি শিল্পী সাহিত্যিকরা মঞ্চের উপর দাঁড়িয়েছেন শুধু নতুন কিছু বলবার তাড়নাতেই, দিতে একটি নতুন ব্যাখ্যা, একটি নতুন ভঙ্গী বা একটি নতুন মর্মার্থ শিল্প-সাধনার। এঁদের যে সবাই সব সময় সত্যিই তেমন একটা কিছু নতুন প্রতিপাদ্য নিয়ে পাঠকদের সামনে এসে উপস্থিত হ'তে পেরেছেন, তা' নয়। সে প্রশ্ন এখানে অপ্রাসঙ্গিক। প্রতিপাদ্যের মান করে তুলি তুলি হয় আলোচনা

ইতিহাস সকল করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। প্রাসঙ্গিক যা তা হচ্ছে সেই তাঁদের কেউ কেউ, যাঁদেরও সংখ্যা অনেক, তাঁদের ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসা ও অন্বেষণের পথ ধরে কখনো কখনো দেবার চেষ্টা করেছেন আকস্মিকভাবে নতুন একটি ব্যঞ্জনা অন্তরের প্রকাশদর্বী প্রচেষ্টায়। এই ধরণের ব্যঞ্জনাতে নিশ্চয়ই প্রতিফলিত থাকা অর্থে থাকা জমে থাকে বলে থাকেন যুগধর্ম, বা একটি যুগের সামগ্রিক চিন্তার সত্তা এবং যার যথার্থ অনুধাবনের প্রয়োজন আছে ঐতিহাসিকের। কিন্তু ঐতিহাসিক যদি তার মধ্যে শুধু যুগটিকে দেখেই চোখ বন্ধ করেন তো তিনি দেখলেন না তার সব, তার মধ্যে তাঁকে আবিষ্কার করতে হবে যুগাতীতের যে শুদ্ধ কথাটিও, যা বলে যুগ হ'তে যুগান্তরে, টপকে টপকে, এক যুগে বলা বা লেখা হ'য়ে গেলেও পরবর্তীর অন্য যুগ-যুগান্তরে যার ধ্বনি অনুরণিত হ'তে পারে। ফেলে আসা, ভুলে যাওয়া সব যুগের এই ধরণের কয়েকটি "নতুন" ব্যঞ্জনার অনুরণনে আজও সমৃদ্ধ আমাদের জীবন। এরা নতুন, এরা পুরানো হয় না, কারণ কালস্রোতের সেই বহুকথিত গুণটি যা' বর্তমানকে চিরকালই আধুনিক আখ্যা দেয়, যা' চিরকালই একটা কিছু ফেলে আসছে ও অন্য আরেকটা কিছুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাও ঐ ব্যঞ্জনাগুলির মধ্যে ক্রমাগতই নতুন অর্থ আবিষ্কার করতে পারে, তা' আগামীর রূপায়ণে অজস্র অনুপ্রেরণা পেতে পারে এদেরই মধ্যে।

আমার বর্তমান আলোচ্য তিনটি কবি, যাঁরা ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন যুগের, ভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের, ও নিশ্চয়ই ভিন্ন যুগধর্মের। পল ভেরলেন, স্তেফান মালার্মে ও আর্তুর র‍্যাঁবো, এঁরা তিনজন ফরাসী কবি গত শতাব্দীর ও তাঁদের দেশের একটি বিশেষ পর্যায়ের। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে খুঁটিনাটি পার্থক্য নিশ্চয়ই অনেক আছে, প্রত্যেকেই তাঁরা এক একটি দ্বীপ, যদিও সেই পরস্পর হ'তে বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন দ্বীপগুলির তীর ধোওয়া একই সাগরের লোনা জলে। সাহিত্যের ইতিহাস এঁদের তিনজনকে মিলিয়েছে একই পরিচ্ছেদে—তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টির সমতা ও পার্থক্য, দুই-ই একত্রে মিলে তাঁদের সম্মিলিত কাব্যকে দিয়েছে একটি ঐকাবদ্ধ দর্শন। তাঁদের এখানে একসঙ্গে আলোচনা করার পক্ষে এ যুক্তিটি তো আছেই, কিন্তু তা' প্রাথমিক। অন্য গুরু কারণও আছে।

সর্বপ্রধান কারণ হ'ল তাঁদের প্রত্যক্ষ সমসাময়িকতা, এই আজকেও, এই

আমাদের বাংলা দেশেও। আজকের বাংলা কাব্যের একটি দীপ্তিমান অংশ জন্মবর্ধমান সচেতনতার আগমনে দেশদেশান্তরের ঐতিহ্যের প্রতি—তেমনেস-মালার্মে-র্যাঁবোর নাম ও কবিতা বাঙালী কাব্যরসিকের সুপরিচিত। তা' ছাড়া, এতক্ষণ কিছুটা দীর্ঘ ভূমিকায় যা' বলবার চেষ্টা করেছি, কবিতার আত্মার সেই নির্বিশেষ ও কবি-বিশেষে বিভিন্ন ব্যক্তিগত রূপটির ব্যাখ্যার চেষ্টা এই তিনজনেই অনুবিতর করেছেন, যে ব্যাখ্যায় এমন কিছু প্রতিভাত হয়েছে যা' তার ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্যে আজও সমানই অর্থপূর্ণ ও যা' উজ্জীবিত করেছে, করছে সারা জগতের বহু কবিকে। তোড়ায় যদি কাব্য (বা সাহিত্য বা শিল্প) সম্বন্ধে কবিদের বিজ্ঞেদের লেখার আলোচনাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি তো তার কারণ শুধু এই যে এই তিন কবিই কখনো কখনো তাঁদের নিজস্ব আসন ছেড়ে বেরিয়ে এসে বক্তৃতার মঞ্চে দাঁড়াতে বাধ্য বোধ করেছেন নতুন কিছু ঘোষণা করার তাগিদেই, জানাতে তাঁদের নতুন অভিজ্ঞতা। বক্তৃতার মঞ্চ অবশ্য কথার কথা মাত্র, তার অর্থ এখানে এই যে এঁরা এঁদের বক্তব্যকে জানাতে চেয়েছেন শুধু কবি হিসেবেই নয়, শুধু কবিতার মাধ্যমেই নয়, কখনো সোজাসুজি বক্তা হিসেবেও, হয় তাঁদের চিঠিতে, নয়তো কথোপকথনের ছলে দিয়ে, নয়তো বা অন্য কোনো মাধ্যমের মারফৎ। আমার আলোচনার বিষয় তাই তত্টা তাঁদের কবিতা নয়, যতটা তাঁদের কাব্যদর্শন। যদিও এই দুটির একটিকে আরেকটি হ'তে বিচ্ছিন্ন করা চলে না, তাও মানি।

এই তিনজনের এখানে একত্র করার পিছনে আরো একটি কারণ আছে। যাকে আজ আমরা ফরাসী প্রতীকবাদী কবিতা বলে চিনতে শিখছি ও যে কবিতার অন্তরঙ্গ পরিচয় এই তিনজন কবি, তা' মূলত বহুলাংশে এক ভারতীয় দর্শন ও সৃষ্টিতত্ত্বের কাছে। ইতিহাসের এক বিচিত্র উজানস্রোতের মোহনায় ভারত ও ইউরোপ মিলল আমার অনন্তের অভিসারে। এ হচ্ছে আমাদের আগে দিয়ে পরে ফিরিয়ে নেওয়া—তবে ফিরিয়ে নেওয়া আর সেই একই জিনিষ নয়। কারণ সে জিনিষের রূপ বদলেছে যখন তা' প্রথম দেশান্তর পাড়ি দেয়, অর্থাৎ সেই দেশান্তর বাসীদের কাছে, তার রূপ দ্বিতীয় বার পালটায় যখন আমরা তাকে আত্মসাৎ করে আমলাম আবার। আমাদের বেদনা যা আমল হয়ে দিয়ে দাঁড়াল পাশ্চাত্য নির্বেদে, এবং সেই নির্বেদকে আজ আমরা আত্মসাৎ করছি আমাদের মননশক্তির সীমা ও সমাজগত যা

জাতিগত বা ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্যের পরিবেশে। সুতরাং এই তিনজন কবি সামাজিক দিকে আমাদেরও আজ। উক্ত প্রসঙ্গগুলির প্রত্যেকটিরই আলোচনার প্রয়োজন আছে—কিন্তু আগে আরম্ভ করা যাক একটির পর একটি কবিকে নিয়ে।

জেরুসেম সম্বন্ধে প্রথম কথা হচ্ছে এই যে তিনি একজন গৌণ কবি, কিন্তু সেই গৌণতা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নির্দিষ্ট স্থান ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেনি, বরং যতই দিন যাচ্ছে, কবি হিসাবে তাঁর সামান্যতা একদিকে যেমন বেশি করে ধরা পড়ছে, অন্যদিকে তেমনি তিনি আগলেন যেন ক্রমশই আরো উজ্জ্বল হয়ে ফরাসী কাব্যের একটি চমকপ্রদ পর্যায়ের এক অন্যতম মুখপাত্র হিসাবে। ফ্রান্সে যে যুগে জেরুসেম জন্মেছিলেন, তার কিছুটা আগে থেকে ও আর কিছুটা পরে ক্রমাগতই, এবং তাঁর জীবনকালেও, কবির রসায়নাগারে চলছিল এক যুগান্তকারী পরীক্ষা। কী হবে কবিতার আত্মা, এই "আর্ট"—বস্তুটা শেষ বিশ্লেষণে আসলে কী, কবির সঙ্গে বিশ্বের সম্পর্কটা কোথায় বা কোনো বলবার মত সম্পর্ক থাকতে পারে কি না, অথবা কবিতায় যা বাহ্যিক উপাদান তা কতদূর কবিতার অন্তরাত্মাকে পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারে ও সেই অবয়বের কোন্ বিশেষ রূপটি হবে যথার্থ, এইসব চিরাচরিত প্রশ্ন ও চিরকালের পরম সমস্যাগুলির নতুন নতুন উত্তরের প্রাণান্ত অনুসন্ধানে সেই দেশের ও সেই যুগের আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে ছিল। জেরুসেমের মাত্র কয়েকবছর আগে এসে গেছেন বোদলেয়ার, এক কবি সিংহ, যাঁর পূর্ণমের মহিমা তখনো সর্বতোভাবে উপলব্ধ হতে আরম্ভ না হলেও তরুণদের মধ্যে তার একটা অন্তত আংশিক ও অতি আন্তরিক সাড়া জেগেছে—আর এসেছে ভাপনাদের অন্য লোকের সঙ্গীতের প্রতি একটি ক্রমবর্ধমান চেতনা কয়েকটি যুরিপের তরুণদের মধ্যে, এসেছে শিল্পের জগতে "ইম্প্রেশনিজম" বা বিষবাদ। সঙ্গীত ও শিল্পের সঙ্গে কাব্যকে সরাসরি সংশ্লিষ্ট না মনে হতে পারে, কিন্তু তাদের যুগপৎ মিলনে যে এক সর্বাঙ্গীন শিল্পসৃষ্টির সম্ভাবনা নেহাৎ অকল্পনীয় তো নয়ই বরং সাধনার বস্তু, এই অভিনব সৃষ্টিও ঐ একই যুগের দান। আজ যেমন করে ইওনেস্কো প্রমুখ বহু উগ্র আধুনিক নাট্যকারেরা প্রোকোফিয়েভের সঙ্গীতে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন, এক শতাব্দী আগে সেই রকম করেই ফরাসী প্রতীকবাদী কবিতা পেয়েছিল বিজাতীয়কে, অপ্রত্যাশিতে তাপনারের সঙ্গীতে,

ও সেই সঙ্গীতের ধারা তা প্রকাশময়ী প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। অন্যদিকে বিষয়বাদী শিল্প আমল এক নতুন আলোকবর্ষী চেতনা তৎকালীন শিল্পমর্মীদের উপর, নতুন এক আলোর খেলায় প্যাঁচে ফেলে তা দ্রষ্টাকে দেখাতে চাইল একটি অভিনব আঙ্গিকে ও ভঙ্গীতে, আগের মত আর সরাসরি বা পরিষ্কার ক'রে নয়, কিন্তু এবার আবছায়া মোহিনী মায়ায়, ছুঁইয়ে তুলতে যথাসম্ভব সিম্বলি-ভাবে তত্তটা আর দেহ বা কাঠামো নয় যতটা দিতে চেয়ে অনুভবের একটি সম্পূর্ণ রূপ দ্রষ্টব্য বস্তু বা বিষয় বা ব্যক্তির একেবারে আত্মাটিকে। এবং বোদলেয়ার স্বয়ং এক নতুন শিল্প-আলোচনার ভিত্তি স্থাপন ক'রে গেছেন আগেই।

তবু এ শুধু তখনকার চারিদিকে বহু জানালা খুলে যাওয়ার মাত্র খুবেকটি দিক। এবং দিক কালের, কারণের দিকটা নয়। কারণের দিকে ছিল তৎকালীন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তায় অনেক গৃহীত সত্যের প্রায়-রাতারাতি ওলটপালট, যা' এতদিনকার নিশ্চয়ত্ব ভূমের জলে সহসা যেন এনে দিল সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ। এই জাগরণের সম্পূর্ণ কোন ছবি দেওয়া অসম্ভব, এবং সেই ছবিটি জটিল, তা' বিস্তৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখা-প্রশাখায়, বিস্তৃত বহু ব্যক্তি, বহু সমষ্টি ও বহু খুঁটিনাটিকে আঁকতে। তা' ছাড়া, এর সবই ঘটেছে একই সঙ্গে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের সীমার মধ্যে, কিন্তু ঘটে গেছে ক্রমাগতই, আজো ঘটেছে—এ অনন্ত রক্ত রেখার একটি সমষ্টি যা' বহুমুখী ও বহু স্তরের সাধনায় প্রসারিত। আর, সেই ছবিটির সম্পূর্ণ আয়তন সম্বন্ধে আমার নিজের জ্ঞানের সীমাও সংকীর্ণ, শুধু তার সামগ্রিক সত্তা যদি কিছু থেকে থাকে, অন্তত যেভাবে আমি তাকে গ্রহণ করতে পেরেছি বলে মনে করি, সেইভাবে সেই সত্তাটিকে সংক্ষেপে দেখানোর চেষ্টা করছি এখানে। আমাদের অল্পপরিচিত নাম ও ঘটনার খুঁটিনাটি বর্ণনায় পাছে বক্তব্য অবথা ভারাক্রান্ত হয়, যে-নাম বা যে-ঘটনাটি যা উল্লেখ করলেই নয়, শুধু সেই সামান্যটির কথা এখানে আলোচনা করছি।

তেরলেন, ও একই অর্থে মালার্মে এবং তাঁদেরও আগে বোদলেয়ার ও বোদলেয়ারেরও আগে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকরা, প্রধানত যার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়াতে বাধ্য বোধ করেছিলেন তা' হচ্ছে সেই যুগের "পজিটিভিজম্" বা প্রত্যক্ষবাদের ধর্মন। কী নীতির ক্ষেত্রে, কী কাব্যে বা শিল্পে, কী সমাজ-চিন্তায়, প্রত্যক্ষবাদীরা ভেবেছিলেন তাঁরা অবশেষে সমস্ত

রহস্য সমাধানের শেষ চাবিটি খুঁজে পেয়েছেন, তাঁরা ভেবেছিলেন এই জগৎকে ব্যাখ্যা করে ফেলতে পরিষ্কার প্রাঞ্জল ভাষায়, জেনেছিলেন যে সবই নিছক ব্যক্তের সীমার মধ্যে। থাকতে পারে না আর অসীম, আর অব্যক্ত, আর রহস্য—এই ছিল তাঁদের বক্তব্য। কিন্তু ক্রমশই দেখা যেতে লাগল রহস্য পর্বতই রয়ে যাচ্ছে, অসীম রয়ে যাচ্ছে, অব্যক্ত রয়ে যাচ্ছে। তরুণ বুদ্ধি-জীবীদের অনেকেই আর সান্ত্বনা পেলেন না প্রত্যক্ষবাদে—তাঁরা মেনে নিতে চাইলেন অবোধ্যকে, অপ্রকাশ্যকে, অসীমকে। কিন্তু সেই অপ্রকাশ্যকে কী ভাবে প্রকাশ করা যাবে, অব্যক্তকে কী ভাবে ব্যক্ত করা যাবে? শুধু তা-ই কি নয় শিল্পের স্বরূপ ধারার সাধনা যুগযুগান্ত ধরে, চিরকালের? তাই এই নতুনরা দেখলেন এবার যে চাই এক অন্যরকমের আঙ্গিক, সাধনার এক অন্যরকমের অস্ত্র। তেরলেন বললেন, আর রঙ নয়, শুধু আভাস লাগাও। কারণ একমাত্র আভাসেই হয়তো সম্ভব হবে সূক্ষ্মতম অনুভূতির অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা। ভাষাকে হতেই হবে একটি সম্পূর্ণ উক্তি, পরমের বা অব্যক্তের নিগড়-ছোঁওয়া। তাই মোরেলেয়ার চাইলেন একটি "সন্মিলন" বা "সংযোগ", যাতে বাধা পড়বে ঐক্যের সুরে সমস্ত ইন্দ্রিয় চেতনার একতান ঝংকার, যাতে সঙ্গীতের উপাদানে কাব্য হবে সমৃদ্ধ। সব চেয়ে সঙ্গীত কেন? কারণ সঙ্গীতেরই মধ্যে সব চেয়ে বেশি করে এমন একটা কিছুর প্রকাশের চেষ্টা আছে যা' সকল ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে।

অবশ্য প্রত্যক্ষবাদ মরে নি এত তাড়াতাড়ি। পরে, সময়ের স্রোতে গড়িয়ে, তা' নাম নিল "ন্যাচারালিজম্" বা প্রকৃতিবাদের—সেযুগের বহু উপন্যাস-নাটকে তার দর্শনের অঙ্গ ঘোষিত হতে থাকল। কিন্তু, একই সঙ্গে, বিরুদ্ধদলের মধ্যেও পড়েছে সাজ-সাজ রব, এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই নাম করবার মত অনেক তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকরা এসিয়ে এসেছেন তাঁদের বিক্ষুব্ধ অন্তরসমুদ্রের গর্জন শোনাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে। অল্প কথায় পরিষ্কারভাবে কী করে এটিকে বলা সম্ভব হবে জানি না, তবে এই নতুনরা তাঁদের সংগ্রামে যে একটি অভূতপূর্ব অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হলেন, তা' আন্তরিকতার প্রগাঢ়তায় ও অনুভবের মাহাত্ম্যে তাঁদের আজো সমস্ত করে রেখেছে ইতিহাসে। সকল সাহিত্যের ইতিহাসে এ একটি অবিস্মরণীয় পর্যায়, এর নিশিষ্ট কাব্যে ও শিল্পে সেই মহান অন্তর্দ্বন্দ্বের মূক-ফাটা রক্তের দাগ।

এক স্বাভাবিক অসন্তোষ তো ছিলই প্রত্যক্ষবাদীদের সকল রহস্য উড়িয়ে-দেওয়া ব্যাখ্যায়, যে-ব্যাখ্যা বোঝাতে পারল না মানুষের অন্তর অভীপ্সা ও হতাশা-নিরাশার সমষ্টিকে। কিন্তু বিজ্ঞানও হাতে হাত মেলাল এই অসন্তোষের। বৈজ্ঞানিকরাও দেখতে আরম্ভ করলেন যে রহস্যকে যতই ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করা যায়, সে ততই মাথা তুলে দাঁড়ায় অনন্ত আকাশে। তারপর রয়ে গেছে শুধু দৈনন্দিনের তুচ্ছ অনেক কিছু অবোধ্যই নয়, মানুষের আধ্যাত্মিক কৌতূহলও, যা' সব সময় ব্যবহারিক যুক্তির কথায় ওঠে-বসে না। আধ্যাত্মিকতা ?—তা' তো বিলাস মাত্র, প্রত্যক্ষবাদীরা বললেন নাক সিঁটকে। কিন্তু তার প্রতি মানুষের কৌতূহলটিকে ওঁরা দমাবেন কী করে ? ১৮৭১ সালে ফ্রান্সে স্বনামধন্য দার্শনিক স্পেন্সারের একটি প্রস্তুতভাবে বিনিত ও আলোচিত বইএর অনুবাদ বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই তরুণদের দল তার মধ্যে দেখল তাদেরই ধ্যান ধারণার স্বীকৃতি। লোকে পাচ্ছনা পেল জেনে যে অজানা বলেও, অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলেও একটা বিরাট, প্রধান জিনিস থাকতে পারে। প্রত্যক্ষবাদীদের এক মানসীয় গুরু ছিলেন কঁত, স্পেন্সার আবার প্রথম হতেই সেই কঁতের মহান প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর অন্যতম প্রতিপাদ্য হল : যে শক্তি নিয়তই রূপ নিচ্ছে এই বিশ্বজগতকে, তা' আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞেয়, আমাদের বোধের অগম্য চিরকালের জন্যে তা'। নতুন দলের মহারথীরা বিস্ময়ে বললেন, বাঃ, কী চমৎকার, কী সত্য কথা !

ধীরে ধীরে অজ্ঞেয় হতে এল শ্রদ্ধের, শ্রদ্ধের চেতনা। প্রাচ্য দর্শন ও চিন্তার অধ্যয়নও তখন আরম্ভ হয়েছে। ভারতীয় দর্শনপ্রেমিক শোপেন-হাওয়ারের বাণী উৎসুকতা জাগিয়েছে, যে বাণী প্রত্যক্ষবাদীদের ভ্রূক্ষেপ না করে বলল জগতটা মায়া, তার সব কিছু ছল পেয়েছে এক তত্ত্ব, অজ্ঞের অনন্ত হতে। এমনি করেই আরম্ভ হল একটি নতুন আদর্শবাদের ভিত্তি স্থাপন। এ সবেরও বহু আগে থেকে ভারতের সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের অনুবাদ বেরোতে আরম্ভ হয়েছে ফরাসী ভাষায়। সেখানকার জ্ঞানী-গুণীদের অনেকেই পড়েছেন গীতা, ভাগবত পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত। ১৮৩৫-এ ফ্রান্সের বিশিষ্ট ভারতীয় শাস্ত্রজ্ঞ বুরনুফ তাঁর বুদ্ধ-ধর্ম সম্বন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। বহু কবি, বোদলেয়ারের আগেও, ভারতীয় দর্শন হতে সাক্ষাৎ অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। এমন কি র‍্যাঁবোর সঙ্গেও গীতা ও উপনিষদের

সম্পর্ক কিছু আছে কি না, তা' নিয়েও অনেকবার অতি বিশদ আলোচনা হয়ে গেছে। এই সব আলোচনার প্রায়ই যে অত্যুক্তি থাকে নি, এমন নয়—যেমন ধরা যাক রঁবেঁতিন একটি সাম্প্রতিক দীর্ঘ নিবন্ধে প্রাণপণে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে র‍্যাঁবো ও ভারতীয় চিন্তাধারা প্রায় একেবারে একাত্ম—তবে এই ধরণের অত্যুক্তিও শুধু এইটুকুই প্রমাণ করে যে প্রাচ্য চিন্তাধারা এবং বিশেষত ভারতীয় চিন্তাধারা অনেকাংশে ও অন্তত পরোক্ষভাবে রূপ দিয়েছিল এই নতুনদের আদর্শবাদকে, ও তাকে প্রত্যক্ষবাদের সংকীর্ণ গণ্ডী হতে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছিল। ভারতীয় চেতনা বা আনন্দ আর সেই যুগের (অনেকখানি আজকেরও) ফরাসী নিয়ে এক বগলে হয়তো বেশ একটু বাড়াবাড়ি করা হবে তবে সেই নিয়ের যে আধ্যাত্মিক চমকটি কবিরা দিতে চেয়েছিলেন, তা' কম অনুপ্রেরণা পায়নি ভারতীয় অব্যক্তের অভিব্যক্তি হতে।

এক কথায়, যখন চিন্তা ও দর্শনের জগতে এইরকম একটি বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয়েছে, এক নতুন আলোড়নের আবহাওয়ার মধ্যে সারা দেশটা গমগম করছে, তখন এলেন ভেরলেন। পুরানো ও নতুন, এই দুয়ের দুটি বিপরীতধর্মী স্রোতের সংঘাতে পড়ে' তাঁর জীবন—ব্যক্তিগত ও কবির, দুইই—বহু কত চিহ্ন অঙ্কন করেছে। তবু, কখনো সন্দেহে, কখনো অটুট প্রত্যয়ের দৃঢ়তায়, তিনি শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন আপনার দিকের ইংগিত।

পল ভেরলেন বেঁচেছিলেন যাহোক বছর, ১৮৪৪ থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত। কিন্তু তিনি বেঁচেছিলেন দুই যুগে, বরং দুই যুগধর্মের আলোছায়ার মধ্যবর্তী পরিস্থিতিতে। তাঁর জীবনের গোড়ায় ফরাসী কাব্যে চলছিল পারনাসদের রাজত্ব, এবং তাদের সে আন্দোলনে তিনি নিজেও কিছু সাময়িক অংশ গ্রহণ করেন নি। তবে ধীরে ধীরে, তাঁর অনুবর্তী ও অন্যান্য অনেক তরুণ সমসাময়িকদের মত, তিনিও আবিষ্কার করলেন যে পারনাসদের দক্ষ বিদ্যা, তাদের কবিতার ঐশ্বর্যশালী ছন্দ ও তথাকথিত সার্থ আকারের মধ্যে নিখুঁত-ভাবে অনুপস্থিত রয়ে গেছে সেই ব্রহ্মাস্ত্র যা' ফরাসী কবিতাকে একটি সম্পূর্ণতার পথে দাঁড় করাতে পারে। অতএব? রোমান্টিক বিপ্লব তো বহু আগেই পথ দেখিয়ে দিয়েছে, বলেছে যে কবিতাকে মুক্তি দিতে হবে প্রাচীন রীতি-নীতির কারাগার হতে—এগোনো যাক না তাই এখনো সেই একই

মুক্তিকামী ও মুক্তিস্নাতা পথ ধরে, ক্রমশই এক বৃহত্তর ও মহত্তর প্রাপ্তচেতনার উন্মেষে। এ ছাড়াও, তেরলেনের কিছু আগেই ফরাসী কাব্যে ঘটে গেছে এক অভাবনীয়, অকল্পনীয় প্রচণ্ড বিপ্লব : বোদলেয়ারের আবির্ভাব। সেই বোদলেয়ার পাপের মধ্যে বেঁচেছেন সহজিয়া তান্ত্রিকদের মত, সাধকের উদ্দীপ্ত অভীপ্সায়, তিনি পাপকে মূলে পরিণত করেছেন ও সুন্দরের মানসের মধ্যে পাপবোধকে চুকিয়ে দিয়েছেন একটি অভিনব সৌন্দর্যতত্ত্ব। শুধু তাই নয়, পরবর্তী প্রতীকবাদী কবিতার ভিত্তিস্থাপনও তিনি করে গেছেন "সংযোগ" সনেটটি লিখে। নির্বেদকেও তিনি দিয়েছেন আধ্যাত্মিক, অন্যলোকের রূপ।

তাই দেখি মাইল বছর বয়সে প্রকাশিত তেরলেনের প্রথম কবিতার বইটিতেই এই দুটি বিশিষ্ট ও বিভিন্ন ধারার ছাপ : একটি প্রেরণা পেয়েছে বোদলেয়ার হতে, অন্যটি অনুগতের মত অনুসরণ করেছে পারনাসদের আঙ্গিক ও দৃষ্টিভঙ্গী। বইটির নামকরণেই তো বোদলেয়ারের অবিসংবাদিত প্রভাব—"শনির কবিতা"। অন্যদিকে, সেই একই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতার মধ্য দিয়ে, কবি কখনো ছুটেছেন তথাকথিত "উদ্দীপকদের" যদি দিতে মিলো-র ভেনাসের পায়ে, ভেনাসের যে-প্রস্তর মূর্তিটি তখনকার দিনে হয়ে দাঁড়িয়েছিল নতুন শ্রম ও প্রতিভার প্রতীক : কখনো বা কবি ল্যকঁত দ লিলের মত লিখতে বসেছেন একটি "হিন্দু কবিতা", তাহাটা যেন ইতিহাসের কোনো ঋতমকে পাতা হতে সদ্য তুলে আনা : কখনো বা তিনি ঘোষণা করছেন যুগের ব্যবহারিক, অনুপস্থিতের চিন্তবৃত্তির প্রতি তাঁর বিজাতীয় ঘৃণা। এর সব কিছুতেই প্রতি-ফলিত পারনাসদের বিশিষ্ট প্রতিপাদ্য ও ভঙ্গী। তবে ঐ একই বই-এ আবার আরো অনেক কবিতা আছে যা' বলছে নির্বেদের কথা, কথা অন্তর্দাহের অথবা ব্যর্থহীন বিষণ্ণতার, যাতে চিত্রিত হয়েছে পারী-র ধূসরতা কিম্বা কোনো প্রান্তরের বিধুরতা, তাতে আছে উগ্রকে, বিশ্রীকে আবাহন। ছন্দও বহুক্ষেত্রে যেন সঙ্গীতের মৃদু মূর্ছনাকে ধরতে চায়। এই দ্বিতীয় ধরণের কবিতাগুলিতে বোদলেয়ারের প্রভাব অস্বীকার্য, শুধু তাতে যা নেই তা' হচ্ছে বোদলেয়ারের অন্তর্নিহিত গাম্ভীর্য ও তাঁর গ্লানির চেতনার অতিরিক্ত তিক্ততার মাধুর্য। ছন্দের মধ্যে এখানে শুধু তেরলেন ছুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন যে গ্লানি তত্ত্ব, মদ খারাপের—সেটি তেরলেনের বিশিষ্ট সুর তাঁর অন্যান্য কাব্যেও। তিনি

চেয়েছেন প্রকাশ করতে "কবিকে এক প্রেম, যে প্রেম ভাবুক, যে প্রেম আধুনিক, তার অতীতার ও যার মাথার বিষণ্ণতার মুকুট।"

এই ধারাতেই চলছিলেন ভেরলেন ও এগোছিল তাঁর কাব্য, যতদিন না তাঁর জীবনের মহত্তম ঘটনাটি দরজায় এসে ধাক্কা দিল অপ্রত্যাশিতভাবে। সেটি হচ্ছে তাঁর জীবনের কিশোর র‍্যাঁবোর আবির্ভাব, প্রথমে পাগল-করা পত্রমধ্যবর্তে, পরে সশরীর ছদ্মবেশে। এই ঘটনার কিছুকাল আগে হতেই ভেরলেন মেতেছেন মদের নেশায়, বেশ্যাবাড়ী যাওয়ায়, বহন করছেন জন্মহাড়ার জীবন। শৃংখলা নেই, রীতিত যাবটি অনুপস্থিত, কী যেন একটা অজানার আবেশ ও আগমনীতে ইতিমধ্যেই ভুলছে মন। র‍্যাঁবো এলেন যথার্থ ডাকটি নিয়ে বিরুদ্ধের যাত্রার। র‍্যাঁবোর এই আগমনে তাঁর জীবনটাই যেন পালটে, তা' যেন মুহূর্তে ছিটকে বেরিয়ে গেল তার এতদিনের অতি পরিচিত, ময়চে-পড়া পরিবেশের কেন্দ্র হতে। র‍্যাঁবো তাঁকে করে তুলতে চাইলেন এক "নারকী প্রেমিক," তাঁকে জানিয়ে দিতে চাইলেন এক অভাবনীয় আদর্শের বহ্নিতে, চাইলেন তাঁর কল্পনায় এক নতুন দৃষ্টের জগতকে সৃষ্টি করতে। তাঁকে র‍্যাঁবো করতে চাইলেন সর্ব অর্থে এক অতিমানব, তাঁর মননশক্তি ও চেতনার গতিটিকে নিজের শক্তিতে ছুঁয়ে দিয়ে, তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁর অতীত ও বর্তমান হতে।

পাগল হওয়া দোজা, কিন্তু ভেরলেন পারলেন না র‍্যাঁবোর ঐ আদর্শে উঠতে, এবং অচিরেই একদিন ব্রাসেলসে তাঁদের পরস্পরের হতাশা ও অন্তর্বিক্ষোভ এমন চরম মনোবাসিছের রূপ ধরল যে "নারকী প্রেমিক" তাঁর রিভলভারের গুলীতে আহত করলেন। আহত, ক্ষুব্ধ ও অন্তর্গ্লানিতে জর্জর র‍্যাঁবো চিরকালের জন্যে ছাড়লেন ভেরলেনকে, এবং অল্পকাল পরে কাব্যজগতকেও বিদায় জানিয়ে দেশান্তরী হলেন সম্পূর্ণ এক নতুন জীবন আরম্ভ করতে ভেবে।

এর পর ভেরলেনের জীবনটা পড়ে রইল, যে কটি বছর তিনি আরো বেঁচেছিলেন, এক ঝলসে-যাওয়া স্বপ্নের মত। র‍্যাঁবোর প্রভাব তাঁর কাব্য ও কাব্যদর্শনের উপর রয়ে গেল প্রচণ্ডই, তবু তাঁর ছিল না র‍্যাঁবোর মত আশ্চর্য ছবি সৃষ্টি করার ক্ষমতা। তবু তাঁর কাব্যে ফুটল আরো তীব্র হয়ে আবেগের সেই বিচিত্র ধূসরতার আবেশ, এক মিহত্তর সঙ্গীতের মূর্ছনা ও বিষণ্ণতা,

পাপের চেতনা, ও এক নামহীন বেদনা অব্যক্তের। তাঁর মত এমন করে বোধ হয় আর কোনো জীবনই কখনো চেষ্টা করে নি পরস্পরবিরোধী বহু স্রোতকে মন্থিত করে একাত্মিমুখে করতে। তাঁর শেষের দিকের কাব্য ক্রমশই হয়েছিল, আভাষে ও আকারে, প্রতীকবাদী কবিতার পূর্বসূরী, যদিও র‍্যাঁবোর প্রতিভার অতি বিলম্বিত খ্যাতি ভের্লেনের পর তিনি অনেকখানি নিষ্প্রভ হয়ে যান।

ঐ পরস্পরবিরোধী স্রোতের প্রসঙ্গে আর ছিল তাঁর মাঝে-মাঝের চরম ক্যাথলিকতা, যা' যখন জেগেছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে যা কাব্যে, বৃথাই যুদ্ধ করতে চেয়েছে তাঁর স্বভাবগত দুর্নীতিপরায়ণতার সঙ্গে। বার বার এই যুদ্ধে জয় হয়েছে তাঁর মনের মেধার, উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি তাঁর উৎকট প্রেমের। অবশ্য এক অর্থে সেই দুর্নীতিপরায়ণতাও কথার কথা মাত্র ও আপেক্ষিক। সাধারণ অর্থে আমরা যাকে পাপ বলি, তা' সাহসের অভাবে কতখানি আর পাপ থাকে আমি না।

কবিতা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য, যা-এখানে আমাদের প্রধান করণীয় বিষয়, ভের্লেন বিচ্ছিন্নভাবে অনেক বললেও তাঁর বিখ্যাত "কাব্যপ্রকাশ" বা Art Poetique গ্রন্থেই সেই তাবৎগুলিকে তিনি প্রথম তাত্ত্বিকে একত্র করলেন। প্রকাশকাল ১৮৮৪ সাল হলেও গ্রন্থটি লেখা হয় বহু আগে, প্রায় একই সময়ে যখন র‍্যাঁবো লিখেছিলেন তাঁর "ভ্রষ্টার" চিঠি। র‍্যাঁবোর প্রতিভা ছিল অনেক বিরাটতর, তাই তিনি দেখেছিলেন ও দেখাতে চেয়েছিলেনও যে-আলো অতলান্ত গভীরের, এবং যে গভীরে ভের্লেন কিছুই পারেন নি প্রবেশ করতে। তবু ভের্লেন উক্ত বইটিতে কিছু সার তত্ত্ব খাড়া করেছেন, যা' তাঁর নিজের অধিকারে স্থান পেয়েছে সাহিত্যের ইতিহাসে ও যাতে নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত আগামীর প্রতীকবাদীদের বহু বিশেষ প্রতিপাদ্য। কবিতা, ভের্লেন বললেন, তবু এক চমৎকার কারুশিল্পই নয়, তা' তবু আদিম শৃঙ্খলা রক্ষা করে ঘুমন্ত হওয়ার ক্ষমতারই প্রকাশ নয়, তা' যেন ব্যক্ত করতে উদ্যত হয় তাকেও যা' কেবল আভাসের ও সূক্ষ্ম চেতনার, যা' গুপ্ত। তা' যেন মানুষের অনিবার্য আন্তর প্রাণিকে, অপার্থিবকে, দুরন্ত স্বপ্নকে ধরতে পারে। তা' যেন পাঠকের চিত্তে জাগাতে পারে সেই মধুর রিক্ততার অনুভবটি যা' আগে ছিল কবিরই ব্যক্তিগত সম্পদ। ভের্লেনের মাহাত্ম্য যদি কিছু থাকে তো তা'

এইখানেই : তিনি নতুন পথের সাধনাকে সমর্থনায় করে গেলেন, তার কয়েকটি অতি আবশ্যক অঙ্গের সুস্পষ্ট ইংগিতও রেখে গেলেন।

তেকাস মালার্মে বেঁচেছিলেন ১৮৪২ হতে ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত। তিনি তাই ভেরলেনের সম্পূর্ণ সমসাময়িক—তবু চিন্তাধারায় কৈশিষ্ট্যে কী বিরাট পার্থক্য তাঁদের দুজনের! কবি হিসেবেও মালার্মে এক সত্যকারের মহারথী, যদিও তিনি লিখেছেন খুবই সামান্য, তাঁর সব কটি উল্লেখযোগ্য কবিতাই ছোট আকারের, সংখ্যায় গোটা সাতেকের বেশি নয়, যা যথেষ্ট একটি দুটি বইয়ের পক্ষে। তাই দিয়েই তিনি বৃত্তান্তের এক স্বাক্ষর রাখলেন ইতিহাসে। তবু যা' তাঁর সবচেয়ে বড় দান, তা' বহু তাঁর কাব্যিক দর্শন, যা' তাঁর অভিনবত্বে যেমন মৌলিক, পরবর্তীদের প্রভাব করার ক্ষমতায় তেমনি প্রচণ্ড বলে প্রমাণিত।

ভেরলেনের মত প্রথম হতেই, যখন তিনি কবিতা ছাপাতে আরম্ভ করলেন ১৮৬০ নাগাদ, মালার্মের ওপর দুটি বিশিষ্ট ধারার ছাপ, একটি পারনাসসের, অন্যটি বোদলেয়ারের। তবু, পারনাসসের প্রভাব প্রসঙ্গে, তিনি অন্যান্য পার্নাসিদের পথ ধরলেন না, লিখলেন না এথিক-ধর্মী গাথা, "হিন্দু কবিতা", চিত্রাঙ্কিত বিরাট দার্শনিক প্রতিপাদ্যে ভারাক্রান্ত করলেন না তাঁর বক্তব্য। উল্টে তিনি নিলেন তেওফিল গতিয়ে-এর পথ, পারনাসসের পূজ্য-পাদ অন্য এক অগ্রজ কবি, যিনি মালার্মেকে উদ্বুদ্ধ করলেন শব্দের সুখ ও বাঁচাবার আনন্দে, সৃষ্টি করতে যন্ত্র, উজ্জ্বল ছবি খেয়াল কল্পনার, প্রকাশ করতে ইন্দ্রিয়চেতনার সহজ খুশী ভাব। ওদিকে বোদলেয়ারের প্রভাব মালার্মেকে টেনে নিয়ে যেতে চাইল একই সঙ্গে অতি বিপরীত স্রোতে, তাঁর মধ্যে জাগাতে অসুস্থ অনুভূতি রোগের, যন্ত্রণার, দুঃখের দারুণ সৌন্দর্যের, তাঁকে জাগাতে মরিয়ার দুরীহ অবস্থায়, সকল ইন্দ্রিয়ানুভবের এমন একটি সূক্ষ্ম মানসিক চেতনায় যা' যেমন জটিল ও অবোধ্য, প্রকাশ পেতে চেয়েও তেমনি নারাজ-বান্দা। অবশ্য, বোদলেয়ারের প্রভাবটিই এখানে একেবারে সোজা হতে গভীরতর—মালার্মের প্রথম দিকের কবিতাতেও বিষয় বহু ক্ষেত্রে সেই একই : উঠবার চেষ্টা একটি অসম্ভব আদর্শের উদ্দেশে; বেড়া, যে দুঃখের কড়া, আনন্দের মদ, পার্থিব পাপের বোঝা যার ঘাড়ে; যে ঘন চুলের কালো গন্ধে মত্ততা জাগে; যার আবাহন শয়তানের। সেখার বাহ্যিক ধরণেও, যেমন কখনো কখনো গদ্য কবিতায়, বোদলেয়ারের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি।

তবু বোদলেয়ার হতে তাঁর পার্থক্যও অতি পরিষ্কার, এবং তাও একেবারে গোড়া হতেই। মালার্মের প্রকাশ যেন আরো অনেক বেশি পূত, অনেক বেশি আদর্শবাদী, কিন্তু অনেক তীক্ষ্ণতর বুদ্ধির দীপ্তিতে। বোদলেয়ারের "পাপের ফুলে" তিনি বিশেষ করে যা দেখলেন ও তাতে অনুপ্রেরণা পেলেন তা' হচ্ছে এক নতুন ছবির জগত ও আভাসের এক বিচিত্র, গুপ্ত আবেশ। কিন্তু ছবির সৃষ্টিতে তিনি গেলেন না একেবারেই বোদলেয়ারের মত। তিনি তাঁর ছবিদের শাসন করলেন না, তাদের বাঁধতে চাইলেন না কোনো সুচ শৃংখলায়, একই কবিতার এক ছবি হতে আরেক ছবিতে যেন যথেচ্ছ লাফিয়ে বেড়াতে লাগলেন। আসলে ছবির প্রতি প্রেম ছিল তাঁর এত প্রচণ্ড যে সেই ছবির স্বপ্নে কোনো পরম্পরা রক্ষা করার বাধ্যবাধকতাতে তিনি নিজেকে বাঁধতে চান নি। কারণ ছবি যে প্রতীক মাত্র, সে শুধু মানবিত্তের আমাকাপড় পরে প্রতিনিধিত্ব করে বেড়ায় এক অন্য কিছুর। এবং সেই অন্য কিছুটি হচ্ছে "ভাব" বা "আইডিয়া", যে একমেবাদ্বিতীয় ও যে-ই একমাত্র পরম লক্ষ্য। ছবির কাজ তাই প্রতীকের মধ্য দিয়ে সেই ভাবটিকে প্রকাশ করা তার চরম সার্থকতায়। ছবি যেন তার নিজের অন্তহীন মিছিলের মধ্য দিয়ে সেই তাকে দেখাতে পারে যা' গোপনে ব'সে আছে ও যা' সকল ছবির অতীত। এবং এই যাদু ঘটাতে পারে একমাত্র কবি তার যাদুকরী প্রতিভার শক্তিতে, যেন নিয়তির একটি সোনার কাঠির ছোঁওয়ায়, ও তার এক অন্তত্তর নির্মম নিষ্কুল শৃংখলার অভিনিবেশে। কবি তাই ধরতে পারে যে কোনো ছবি যে কোনো প্রতীক; এমন কি দৈনন্দিনের যে কোনো তুচ্ছ ঘটনাও—যেমন, এক মেলাতে একটু বেড়িয়ে আসা, বা একটি অপ্রত্যাশিত দেখার আলোকে উদ্ভাসিত কোনো অপরিচিত নারীর মুখ, যাত্রার অন্তরালে দুয়েকটি কথা কাটাকাটি কোনো পান্থশালায় বা রেলস্টেশনে, অথবা কোনো নর্তকীর একটি মুহূর্তের উদ্ধত ভঙ্গি, কিংবা মৃদু কোনো ফুলদানি বা একটি হাত-পাখা, অথবা আগে-শোনা কোনো এক দুর্বোধ্য বাক্য যা' মাথার কেবলি ঘুরে ঘুরে মরছে, ইত্যাদি ইত্যাদি—সকলই সার্থক বিষয় হতে পারে কবিতার, কিন্তু তা' হবে না কবিতার যথার্থ প্রতিপাদ্য।

মালার্মের এই ভাবধারণার সঙ্গে পরবর্তী প্রতীকবাদের সম্পর্কটি যে কত অন্তরঙ্গ, তা' বলাই বাহুল্য। এবং এর সঙ্গে ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রেরও

একটি সূত্র মিল যেন আছে কোথায়। হেগেলের দর্শনের সঙ্গে বিশেষ করে এর মিল আছে, যার দার্শনিক তত্ত্বকে ফ্রান্স তখন সবে গভীরভাবে জানতে আরম্ভ করেছে। হেগেলের প্রতিপাদ্য ছিল যে সত্তা বা "রিয়্যাল" ও কারণ বা "লজিকের" দুটি আপাত ভিন্ন স্তর এক হয়ে মেলে এক উন্নততর স্তরে যার নাম ভাব বা "আইডিয়া" এবং যা-ই একমাত্র সত্তা। মালার্মেরও তপস্যা ছিল সেই শেষ ও পরম ভাবটিকে ধরার, তাকে প্রকাশ করার, নিজের মধ্যে জগতকে নতুন করে তৈরী করার ও তার যথার্থ সত্তা রূপটিকে দেখানো প্রতীকের আলোছায়ার চারমাটির স্তরটিকে ভেদ করে। অনেকটা যেন ঈশোপনিষদের হিরণ্ময় পাত্র ও তার দ্বারা আবৃত ও তাতে নিহিত সত্যের প্রশ্ন এইখানেও। সেথা মানেই, মালার্মে বললেন, জানা—"সাদার ওপর সারি সারি কালো অক্ষর যেন কোন তমসাচ্ছিন্ন কিতাব গভীরের কাজ, যা' ধরে রাখে অন্তরকে।" সেথা তাই এমন একটি প্রচেষ্টা যা' যে রহস্য আমাদের সকলকে ঢেকে রেখেছে, তাকে সে উদ্ঘোষিত করে। মহাজীবনের অধিকারী যে মানুষ, সে মানুষ মহাগম্ভীর, তার প্রয়োজন আছে এই প্রয়াসের।

বোদলেয়ারের মত মালার্মেও এক "সংযোগ" চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই সংযোগের চেতনাটিকে তিনি ঠেলে দিয়ে গেছেন আরো ঊর্ধ্বে, ইন্দ্রিয়ানুভূতির তন্ত্রাই প্রদেশ হতে শুদ্ধ বুদ্ধির শুভ্র শূন্যে। কবিতার বাহ্যিক অবয়ব বা ভারতীয় আলংকারিক অর্থে যাকে রীতি বলা চলে, সেই বিষয়েও তাঁর অবদান সামান্য নয়, এবং তার রূপটিরও নির্দেশ তিনি দিয়েছেন অতি সুন্দর ও প্রাঞ্জল ইঙ্গিতে, কখনো তাঁর নিজের কবিতার মধ্য দিয়ে সরাসরি, কখনো বা বন্ধুদের সঙ্গে কথোপকথনে, কখনো আবার কাব্য সম্বন্ধে তাঁর লেখায়। তবে যেহেতু দেশভেদে রীতিভেদ হয়ে থাকে, তাঁর কবিতার আত্মাটিই বা সে বিষয়ে তাঁর বক্তব্যই বিদেশীদের পক্ষে আলোচ্য বিশেষ করে। কবিতার এই আত্মার দিকটায়ও বিস্তারিত আলোচনা তিনি করেছেন বিচ্ছিন্নভাবে, বিশেষ করে তাঁর "Prose à des Esseintes" নামক বিখ্যাত নিবন্ধে। এ সূত্রের অনেকখানিই যেন দুর্বোধ্য, প্রায় অযোগ্যও, যেমন বহুলাংশে তাঁর সমস্ত কবিতাও। তবু চেষ্টা করলে সর্বত্রই একটি প্রধান তরল রেখার অগ্রগতি ধরতে পারা যাবেই।

শেষ পর্যন্ত, মালার্মে নিজেকে ততটা কবি বলে মেনে নিতে চাননি, যতটা

তিনি হতে চেয়েছিলেন কাব্য-দার্শনিক। সংগীতের প্রতি, বিশেষ করে ভাগনারের সংগীতের প্রতি, তাঁর প্রীতি ছিল প্রচণ্ড। শেষ জীবনে তো লেখা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে সংগীত রচনাতেই মন দেবেন স্থির করেছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন যে অক্ষর বা অক্ষরে বিবৃত ছবির যে প্রতীক তা' নিম্নস্তরের, তাই ভেবেছিলেন সংগীতের নয়তর, শুদ্ধতর প্রতীকের ব্যঞ্জনায় "ভাবটির" আরো কাছে এগিয়ে যেতে। সারাজীবন ক্ষুরধার বুদ্ধির এই সাধনায় তাঁর কবিতাকে হতে হয়েছে অনিবার্যভাবে দুর্বোধ্য, তা প্রাণপণ প্রয়াস ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও প্রকাশ করতে নিশ্চয়ই পারেনি সেই এক ও অখণ্ডের অধিতীয়কে. শুধু তাঁর মুখে অজস্র চিহ্ন অমানুষিক এক আকাঙ্ক্ষার, অলৌকিক এক হতাশার। ব্যক্তিগত জীবনেও মালার্মে যেন পাগল হতে চলেছিলেন ধীরে ধীরে।

এই শুদ্ধ বুদ্ধির সাধনায়, সেই অলৌকিক, ঐশ ভাবটিকে ধরতে চেয়ে, মালার্মে একটি শৃংখলার তন্ত্রকেও খাড়া করেছিলেন যা' আর মানতে চাইল না তথাকথিত অনুপ্রেরণার দাক্ষিণ্যকে। অপ্রত্যাশিত মুহূর্তের অনুপ্রেরণার ঘর.. "তা" মিলবেই মিলবে নিশ্চল নির্মল সাধনায়। তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি: "যে মানুষ চিন্তাশীল সাধক, সে নির্বাসিত কখনো নয় সেই অলভ্য সুযোগের সম্ভাবনা হতে।" মালার্মের আগেও, কবিতার অনুপ্রেরণার মূল্যটি কতটুকু বা কতখানি বা তার কোনো মূল্য একেবারেই আছে কিনা, তাই নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে। অনেকেই হতে চেয়েছেন সাধক, অনুপ্রেরণার দাক্ষিণ্যের ভিখারী নয়। এমন কি বোদলেয়রকেও বলতে শোনা গেছে: "পারো কি যায় বা যে কোনো মানুষকে লিখতে, মাত্র বিশটি সন্ধ্যার শিক্ষায়, একটি নাটক যা' অন্য কোনো নাটক হ'তে কোনোদিক দিয়ে বেশি হাস্যকর হবে না, অথবা তাকে লিখতে যে কোনো বৈদ্যের একটি কবিতা যা' কিছু কম বাদহীন হবে না অন্য যে কোনো আজো অপঠিত এদিকের চেয়ে? বিশেষ ক'রে সেই শিক্ষায় যদি তাকে আমি দিতে পারি আমার তন্ত্রপুঁথি ও বিজ্ঞান?"

মালার্মের সেই শুদ্ধ বুদ্ধির সাধনার ধারাটি আজো নেমে এসেছে কাব্যে ও শিল্পে। অনেকগুলির মধ্য হতে আমি বেছে নিলাম আজো জীবিত ও ফ্রান্সের এক অতি মাননীয় শিল্পী ব্রাকের এই উক্তিটি: "চিত্রের বিষয়

কখনোই তা' যা বা যা' আপাতভাবে তা' দেখাতে চাইছে—তার প্রকৃত বক্তব্য একটি নতুন ঐক্য, একটি গীতিমুখর গতির বিকশিত চেতনা, যা' সম্ভব হয় একমাত্র শব্দপ্রয়োগ সাধনায়। আমি তাই যা' চাই তা' নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা, যা' আবেগকে ধরে রাখে ও তাকে বাঁধে।"

ভেরলেন ও মালার্মে দুজনেই বিদ্রোহ করেছিলেন তৎকালীন চিন্তাচেতনার বিরুদ্ধে, কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিগত দুটি বিভিন্ন পথে। র‍্যাঁবোর বিদ্রোহ আমার বয়স আরো একটি পথ, সে বিদ্রোহ এমন একটি রূপের ও এত প্রচণ্ড একটি আন্তরিকতায় যে তার তুলনা কোথাও সাহিত্যে নেই। কবি হিসেবে ভেরলেন ছিলেন গৌণ, আমি তো বলব নিতান্তই গৌণ, ও মালার্মের কবিতা অতি উচ্চ স্তরের হলেও তিনি মূলত হতে চেয়েছিলেন কাব্য-দার্শনিক। র‍্যাঁবো জগতের এক রহস্যময় কবি, এবং তা-ই তাঁর প্রধান পরিচয়। এবং তাঁর জীবনেরও আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য দিকটা আছে, যা' তাঁর কাব্যকে আরো মহিমান্বিত করেছে। তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন তৎকালীন সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য ও চিন্তাধারার সকল গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে, তাঁর দুরন্তপনা স্বয়ম্ভূ পূর্বসূরীর মতই প্রাণপণে তৈরী করতে চেয়ে একটি নতুন জগৎ, নিজের ইচ্ছায় ও শক্তিতে। প্রথম থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন জীবনে যেই বস্তুটাই অনুপস্থিত রয়ে গেছে যা' অর্থ দেয়, সঙ্গতি ও সুষমা দেয় জীবনকে। বুঝেছিলেন "আমাতে" "আমি" নেই, "আমি" একটা স্বতন্ত্র জিনিষ যাকে কবিরা চিনে উঠতে পারেনি—চেয়েছিলেন "স্রষ্টা" হতে, সৃষ্টি দিতে। মালার্মের মত তিনিও জাগতে চেয়েছিলেন যাদুকরী শক্তির চেতনায়, কিন্তু বেশ একটু অন্যভাবে। মালার্মের "ভাব" ও শুদ্ধ বুদ্ধি থেকে র‍্যাঁবোর সাধনার পার্থক্য অনেক। তাঁর আসা ও চ'লে যাওয়া ফরাসী কাব্যে ঘটল যেন উল্কার মত—একথা মালার্মেই বলেছিলেন। এ ছাড়া, অন্য অনেকে র‍্যাঁবোকে আখ্যা দিতে চেয়েছেন দানবের, বা দেবদূতের, বা মাত্র বয়ঃসন্ধির একজন মানুষের। কেউ কেউ এই তিনটি আখ্যা একেবারে একই সঙ্গে দিয়েছেন, যা' প্রমাণ করে র‍্যাঁবো সম্বন্ধে প্রহেলিকার প্রচণ্ডতা।

র‍্যাঁবোকে নিয়ে বাংলাদেশে বহু বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে, আমি নিজেও দুয়েকবার তাঁর সম্বন্ধে বলবার চেষ্টা করেছি। এখানে তাই মাত্র একটি-দুটি প্রয়োজনীয় কথা তাঁর সম্বন্ধে বলি যা ভেরলেন ও মালার্মের

আলোচনার সূত্র ধরে, কারণ ভেরলেন-মালার্মে-র‍্যাঁবো, এঁরা তিনজন ফরাসী প্রতীকবাদী কবিতার ত্রিমূর্তি বলে পূজিত।

বয়সে মালার্মে হতে বারো বছরের এবং ভেরলেন হতে দশ বছরের ছোট ছিলেন র‍্যাঁবো, ও তিনি মারা যান এই দুই অগ্রজ হতেই বেশ কিছু আগে। তা ছাড়া, যা' লক্ষ্য করার বিষয়, তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সীমা মাত্র প্রথম কুড়ি-একুশ বছরের মধ্যে বিধৃত। এরি মধ্যেই আসিয়ে যেতে পারলেন এমন একটি আগুন যার নতুন নতুন বহ্নিশিখা আজো জাগছে দেশে-দেশান্তরে। এ ছিল তাঁর অন্তর্জাত বোধির আগুন, মালার্মের কুয়াশায় শুষ্ক যুক্তির আগুন নয়। তাঁর অসন্তোষ ও ঘৃণা, প্রথমে নিজের পরিবেশের প্রতি, পরে তৎকালীন কাব্যের প্রতি, ও আরো পরে সকল সাহিত্যের ও এমন কি নিজেরও প্রতি, ক্রমবর্ধমান আবেগের অভিঘাতে এমন পৈশাচিক আকার নিল যে ঠিক যে সময়টিতে মনে হচ্ছিল তিনি পেতে চেয়েছিলেন সেই পরম পরাজয়ের সত্য চাবিটি, তিনি ছিটকে বেরিয়ে গেলেন কাব্য-সাধনার অন্তর হতে, আর দ্বিমূর্তির শেষ মন্ত্রটি পূজারীর সমস্ত আন্তরিকতার সঙ্গে উচ্চারণ করে দেশান্তরী হলেন এক সম্পূর্ণ অন্য ধরণের জীবন যাপন করতে। কিন্তু তার একটু আগেই, পরবর্তীর সমস্ত রসপিপাসুদের কথা স্মরণ করে' যেন, হাত দিয়েছিলেন একটি নতুন পরীক্ষায়। র‍্যাঁবো সেই পরীক্ষায় যেন ধরতে চেয়েছিলেন অব্যক্তকে হাতের মুঠোয়, তাকে নিজের যাদুকরী শক্তিতে প্রকাশ করতে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। তাই তিনি চাইলেন একটি নতুন শব্দের রসায়ন, সৃষ্টি করতে নতুন ভাষা, দেখতে নতুন করে দেখার ক্ষমতা। তাঁর "দ্রষ্টার" চিঠিতে বললেন, "কবিকে এবার "দ্রষ্টা" হতে হবে, ও সে তা হতে পারবে একমাত্র সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতির এক দীর্ঘ, প্রচণ্ড ও যুক্তির বিপরীত উদ্গমযাত্রায়।" তিনি ভাবলেন, জীবনকে একেবারে উল্টে দেখার রহস্যটিকে যেন তিনি ধরতে পেরেছেন।

অন্য সকলের সঙ্গে—প্রথম হতেই কৃতী ছাত্র ও কবিতা রচনায় অসামান্য প্রতিভাশালী। ছোট সহরের তুচ্ছতা, অর্থহীনতা, মর্মন্তুদ নির্বোধ ও বিদ্রূপ-ভাবকে যেন তীব্রবিদ্ধ বৃত্ত শিকারের মত ফেলে দিয়ে ছুটলেন তিনি প্যারীতে সেই "নতুন জীবনের" অনুসন্ধানে। রুক্ষ উস্কোখুস্কো চুল, সহজিয়া এক অবমুক্তের ভাব, চোখ দিয়ে যেন আগুনের জ্যোতি ঠিকরে বেরোচ্ছে। এই রূপেই ভেরলেন র‍্যাঁবোকে প্রথম দেখেন, প্যারী-কম্যুনের যুগে।

কিন্তু র‍্যাঁবোর সেই আজন্ম হাজার সাধনা করেও গেল না শান্তি, অথবা করল শুধু মরিয়া এক মৈরাশ্য। সেই মৈরাশ্যের মধুর ও বহ্নি-চেতনার যাদুর তাঁর সমস্ত কাব্যে—কী "মাতাল তরণীতে" কী অসমাপ্ত "নরকর্ণ" সনেটগুচ্ছে, কী "নরকে এক ঋতুতে", কী "দীপাবলীতে।" আশ্চর্য ছবির জগত এই, ও এ এক আশ্চর্য সাধনার অনাময়ধী।

এক জায়গায় লিখছেন র‍্যাঁবো "নরকে এক ঋতুতে": "আবার আমি। আমার মূর্খতার আরো একটি কাহিনী। বহুদিনের গর্ব আমার, সতত-অসতত সমস্ত নিসর্গ শোভার ওপরই আছে আমার মরণ—আধুনিক কাব্য ও চিত্র-কলার পদস্পর্শী খ্যাতির আড়ালে ঢেকেছি তার চূড়ান্ত অসারতা।...যার করেছি স্বরবর্ণের হত—আ কৃষ্ণ, অ শ্বেত, ই রক্ত, ও নীল, উ সবুজ—নিরূপণ করেছি প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণের গতি-প্রকৃতি। আর সহজাত প্রেরণার হুকেই আজ আবার লাগাদিত হয়েছি কাব্যিক এমন একটি যুগল পদ্ধ আবিষ্কার করতে যা' একদিন না একদিন প্রবোধ্য হতে পারবে সমস্ত অর্থে। এই আমি অনুবাসের সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত করে রাখলাম। প্রথমে সে ছিল শুধু সমীক্ষণ। রূপ দিয়েছি মৌনকে, বাণী দিয়েছি স্নায়ুকে, লিখে গেছি অনির্বচনীয়কে—হৈর্যে বেঁধেছি চিত্রচকল ঘূর্ণিকে।...আমার পদ্যের এই ফলাফলে কাব্যের যত পুরানো আদাড়োরা নিমিত্তের ভূমিকা। নিজেকে সইয়ে নিয়েছি সরল বভিভ্রমে—সত্যি, দেখেছি আমি কারখানার আঙিনায় মসজিদ, দেবদূতের পরিচালনায় যন্ত্র-সঙ্গীতের বিদ্যালয়, আকাশ পথে শকটের মিছিল, হ্রদের গভীরে বৈঠকখানা; কত যে দৈত্য, কত রহস্য। কী এক প্রহসনের নাম চোখে আমার বিভীষিকা ঘনিয়ে তুলেছে। এ ছাড়া শব্দের ছায়াবাজিতে ঘুচিয়েছি কুহকের যত কূটতর্ক। অবশেষে আমার চেতনার এই বিশৃংখলার মধ্যে খুঁজে পেলাম পবিত্রকে। ফুকার ছটফট করেছি, আক্রান্ত হয়েছি প্রবল জ্বরে—ঈর্ষা করেছি পশুর সুখ, তাঁয়োদোকার নিরপরাধ বিস্মৃতি লোক, শত-বৃশ্চিকের কৌমার্যময় তন্দ্রা। তিক্ততায় ছেয়ে গেল আমার চরিত্র—করেকটা গাথার মত কবিতায় পৃথিবীকে বিদায় জানালাম।...অপূর্ব এক আজগবি গীতিনাট্য হয়ে রয়েছি।"

এ শুধু ছবির জগতই নয়, অপ্রকাশ্য এক মৈরাশ্যের মর্মবাণীই নয়, এ এক আলাদা জগত যা' র‍্যাঁবো কবিতার তৎকালীন ও পরবর্তী কবিতায় সঞ্চারিত

করলেন। "নরকে এক ঋতু" শুধু কবিতাই নয়, একদিক দিয়ে কবির জীবন-বাণীও। এ ছাড়াও, কবিতা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য সরাসরি তিনি বলেছেন "ঐন্দ্রিয়" চিঠিটিতে ১৮৭১ সালে, যে চিঠির আলোচনায় আগামীর কবিতা কম প্রেরণা পায় নি।

"আজ আমি কী করে সুন্দরকে নমস্কার করতে হবে"—একথা বললেও র‍্যাঁবো জানতেন তাঁর দক্ষ বিদ্যা, তিনি জানতেন: পাওয়া গেল না। তাই, শুধু এই আশা রেখেই তিনি চিরবিদায় নিলেন কবিতা হতে: "ভোর-বেলা বীর এক আবেগে সজ্জিত হয়ে আমরা পৌঁছোব আশ্চর্য নগরীতে।"

এই আশা, এক অর্থে, চিরকালের কবিতার, যে কবিতা আজকেরও, আমাদেরও। গত শতাব্দীর শেষার্ধের এই তিনজন কবি নানাভাবে পথের খুঁজেছেন পরবর্তী কবিতার যাত্রার। তাঁদের বার বার আলোচনায় তাই একটি বিশেষ সংগতি আছে আজকের কাব্যিক পরিস্থিতিতে, ও বাংলাদেশেও। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা তাঁদের সব কথা আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি নি—শুধু যা' দেখাতে চেয়েছি, তা' তাঁদের সাধনার কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ। তাঁদের কবিতা বা ছবির জগতের চেহারার আমরা সুধাই উদ্ভূত হতে চেষ্টা করব আজ, যদি না একই সঙ্গে যুক্ত হতে চাই শিল্পের সেই আজীবন সাধনাটিকে, যদি না নমস্কার করতে পারি তাকে।

কবিতাবলী

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

কয়েকটি কবিতা

অনুমান

তুমি কি আসবে তবে বলো।
চোখ ছলোছলো।
হাতে হাত রাখবে আবার ?
ফুল ঝরে গেছে যে শাখায়
সেখানে ধরবে ফুল কের ?
মোহ কিরে এসে আমাদের
আবার করাবে স্নান প্রীত অন্ধকারে ?
আকাশ-বীণায় লক্ষ তারে
আগমের বার্ত্তা যেন পাই !
মানে যা তাদের তুমি নাই ॥

আহ্বান

তোমার মুখের ছবি নাম, তুমি নির্বাক এখন !
স্বপ্নে দেখি, কেঁদে ওঠে মন।
কোথায় তোমার সেই উজ্জ্বল আলাপ—
সত্যি কি বধির হয়ে গেছ, বলো কার অভিশাপ !
সে কি শুধু প্রত্যাখ্যানে তুমি আর সেই তুমি নও !
কও কথা কও
মনের অতলে যেন শুনি তার ধ্বনি,

বরেণ্য রমণী
বলো, কার বিয়ে সব ফুল।
আমার বাগানে আজ প্রস্তীক্ষিত বসন্তের ফুল॥

হাওয়া

হাওয়া যেন বৈরিণী রমণী।
কুমারী-বুকের তীক্ষ্ণ ব্যথি
আসে যা সে, লুঠে নেয় দু'হাতে আমাকে।
তার বুকে থাকে
যেন এক মরুভূমি, শুধু অগ্নিময়।
ভেঙে ফেলে ঘর
সে চায় সবারে নিতে তার বৈরী বুকে।
আমি এক অপার কৌতুকে
নিয়ে আছি এই চৈত্র হাওয়া,
আমার সকল দেওয়া পাওয়া
শেষ হল তার আলিঙ্গনে,
মৃত্যুর আঘাত পাই যেন ক্ষণে ক্ষণে
এ মরণ আনন্দের কণা
প্রেত পুরাতন আবর্জনা
মুছে ফেলা দীর্ণ মন হতে
বৈরিণী হাওয়ার বৈরী স্রোতে॥

রূপকথা

দূরের রুপোলি নদী, তার জলে রূপকথা বোনা
মনে মনে তাই শুধু শোনা
রক্তের আলস্য নিয়ে যেন অবিরাম।
কে সে রাজকন্যা, কি যে নাম
কোথায় যে ঘর তার জানিনে কিছুই।

তবু হাতে হাত যেন ছুঁই
তবু যেন পাই তাকে বুকে।
সে-ও কী উৎসুকে
আমাকে আমার তার অন্ন ইতিহাস—
আমি তার পাই মৃদু শ্বাস
সুখী আমি এ অন্ন পাওয়ায়।
তারপর সব ছবি ছুঁয়ে যায় বিকেলের হরণ হাওয়ায়।

গোপাল ভৌমিক

পরশুরাম

আগাছায় ভরা চারদিক
তাই পথ চলি দাবধানে ;
হাতের কুঠারটাকে ঠিক
দুদিকে চালাই অভিযানে।

গাছ না আগাছা কাটে, আমি
একবার দেখি না তা ফিরে ;
যখন অবশ দেহে থামি
বুঝি করা দেখি মাঠটিরে।

পথ খুঁজে কাটি গাছ, বন
অথচ তা বুঝি মাঠে হারা ;
তখন তো বুঝি কেন মন
আঁধার আকাশে খোঁজে তারা।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দারুণ অগ্নিবাণে

এক

তুমি আমার আরোগ্য চন্দন
ভেবেছিলাম। তোমার কোলে মাথা
রাখবো ব'লে রাত্রি জেগেছিলাম
সারা অঙ্গে কঠিন জ্বর নিয়ে।

সারা অঙ্গ আমার জ্ব'লে গেছে
হলুদের মাটীর দিনে। আমি
অন্ধ, শুধু খুঁজেছি শীতলতা
কখন তুমি সকল দুরে নেবে।

সারাটা দিন রক্ত বমি ক'রে
মৃত্যুর রাত আমি জেগেছিলাম;
প্রার্থনার মতন আছ পেতে
আমার মাথা লুটিয়ে দিয়েছিলাম।

দুই নয়নে মাটীর বিষ, আমি
দেখতে পাইনি শুকালে চন্দন॥

দুই

চন্দন শুকালো সখি। শুকালো নিমপাতা
যন্ত্রণায় মাথা রাখতে পারিনা তোর কোলে।
দারুণ বসন্তে আমার অঙ্গ যাচ্ছে জ্ব'লে,
যা তুই। বিছানো তোর অন্ত ঘরে পাতা।

যা তুই, যেখানে চ'লে গিয়েছে ঈশ্বর
স্পর্শের নির্বাক স্তবে! আমলকীর ডালে

দেখ, হিরণ্ময় কলসগুলি মাঠে এ'সে,
সখী রে। দশদিক্ ঘন অন্ধকার কর।

ফাল্গুন বসন্তে আমার অন্ন মাঠে এ'সে,
ঈশ্বর সিঞ্চেছে, তুই আছিস্ কী-বসে?

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

আবির্ভাব

১ বিস্ময়ের কাজল আজ বিলায় দু' চোখে,
মনে হলো পেঁপে গাছটা মাথা নাড়ছে।
মনও মাথা নাড়ছে, বলছে—হলো না, হলো না।
কেউ আসবে অথচ এলো না।
এই ছায়াগাঢ় নিকেল এখুনি মুখ ঢাকবে অন্ধকারে।
এ চৈত্র চিন্তার। এই চিৎ রাত্রিময়।
এই রাত্রি 'তুমি'-মত প্রতীকায়—
পেঁপে ফুলের গন্ধও তন্দ্রার, ক্রমতিমিরায়মান আচ্ছন্নায়।
অভুক্তার্শ উঠোনের গাছগুলোর শরীরে।
ছায়া আসছে নিকটের বাতাসে
দূরের বাতাসে বাষ্পায়িত অন্ধকারের আত্মা—কাছে আসছে।
মেঘের ঘনচিত্র সুদূর আকাশে—অতোদাস।
কেউ আসছে, কেউ আসবে, কেউ এসেছিলো এমনি এক চেতনা।
বাতাস তুমি কেঁদো না। তাহলে সন্ধ্যার মুখের
প্রসাধন যাবে ধুয়ে।
ঝটকেট বাতাস, ওগো বাতাস, তুমি ঘুরোও;
কিংবা ধ্যান করো এমন কোনো মুখের
যে-মুখে বৈশালীর সন্ধ্যা প্রাচীন প্রদীপরাগে লিখিত।

পেঁপে ফুলের গন্ধ, তুমি জেগে থেকো না, ঘুমোও।
তোমাকে জাগিয়ে দেবো যদি কেউ এখানে আসে রাত জাগতে
ঝরা জ্যোৎস্নার প্রস্রাবমন কাকণগাছের তলায়।
তোমায় জাগিয়ে দেবো।
ওগো বিকেলের আলো, বাঁঠ দিয়ে যেতে যেতে
ঘুমিয়ে পড়লে কেন বাগানটার কিনারে?
বুঝি খামার পড়েছে পা?—হেসে উঠি দাওয়ায় দাঁড়িয়ে।
আর ঐ যে আকাশ···
এ আকাশই যার হৃদয়ের প্রকাশ, কোথায় তার মান?
মিঠানো মন, লম্বা লম্বা ঘাস—
শীষ দুলেছে সড়িসের মতো।

২ বিকেলের ছায়ায় সন্ধ্যার প্রসাধনের গন্ধ।
বিকেলের ছায়ায় গত দিনের স্মৃতি—
বিকেলের ছায়ায় আগতদিনের মর্মর।
বিকেলের ছায়ায় কতো দিনের আর্তি—
বিকেলের ছায়ায় কতো প্রতিশ্রুতির প্রাপ্তি।

৩ গাছের জটলা থেকে গড়িয়ে আসে ছায়াশিশু
শেষটায় রেণু রেণু হয়ে শুধু পড়ছে ছড়িয়ে
ছড়ানো পাখার পাখিরা ঘরে আসছে সন্ধ্যার ছায়ায় আলক
যা খসিত হয়ে সব কিছুকেই আপ্‌টে ধরছে জড়িয়ে।

৪ মাঠের সবখলে হাটে বিকেলের আলো খড়,
দু' ক্রোশ দূরে পলাশপুরের গন্ধ।
ব্যাপারীরা ফিরছে গাঁয়ে মাথায় শূন্য পসরা নিয়ে।
দিনের গায়ে ক্লান্ত ভোরে আলো
জাগলো ঢেউয়ে আশে পাশে একটি হ্রদ অন্ধকার—
রাত্রিদের শাড়িটা কার এমন জমকালো?
বাড়বাড়ন্ত তোমারই এখন, ওগো সন্ধ্যার ছায়া,
তুমিই এখন জাগো।

৪ ওগো বৈকালবিহারী, দক্ষিণহুয়ারী হাওয়া, তুমিও থাকো সঙ্গে
কার তনু-পরিমল তোমার নিশ্বাসে নিশ্বাসে ছড়াবো,
কার স্পর্শশিহর তোমার অঙ্গে অঙ্গে জড়াবো ?

৬ বাগানে গাঢ় হচ্ছে অন্ধকার পেঁপে ফুলের গন্ধে।
গাঢ় হচ্ছে অন্ধকার, গাঢ় হচ্ছে অন্ধকার, গাঢ় হচ্ছে
গমগম কার ?
দীপাদীর মণিবন্ধে প্রদীপ আলা পদ্মে।
এখুনি রক্তমণ্ডল জ্বল্ জ্বল্ করবে আকাশে
এখন যদি কেউ আসে—

৭ জেগে আছে চিন্তর চৈত্র,
জেগে আছে রাত্রিবর চিৎ—
জেগে আছে 'তুমি'-ময় রাত্রি,
জেগে আছে কাকার কাকার একটি হৃদ অন্ধকার।
জেগে আছে অন্তরঙ্গ পেঁপে ফুলের গন্ধ,
জেগে আছে লাজ-লুকানো, দীপ-নেভানো রাত্রি,
জেগে আছে বন-ওড়ানো দক্ষিণহুয়ারী হাওয়া,
জেগে উঠছে তনুস্পর্শ উতোলের সারস্তনোর শরীরে।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

শাল বটের ছায়ায়

রাত চারটের পর আর ঘর নেই।
সমস্ত শরীর হিম, নিশুচ্ছ শ্বাসন
প্রদীপের মতো জলে জলে
কোনো হুড নিষ্কম্প নিবেধে
শুদ্ধ হয়ে গেল।

চল্লিশ বছর আমি এই শান্ত বটের ছায়ায়
আদিম শিশুর মতো সমর্পিত।
তিমিরবিনাশী মন্দ মর্মের ধারায়
মুক্ত চোখ কিছু অভিভূত।
আমার রক্তের ঢেউয়ে
সর্বদা করেছি অনুভব
শান্ত পদ্ম, প্রসাধার দেহ সমাসন।
গ্রীষ্ম বর্ষা শীতে
বিশ্বাসে নিয়েছি টেনে রক্তের ভিতরে
অক্লান্তির চেতনার সুস্থ আশীর্বাদ
অলক্ষ্যে, সুচারু পদ্ধতিতে।

বটের ছায়ায় আমি হেঁটে গেছি দীর্ঘকাল,
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত, চল্লিশ বছর ;
করবৃন্তে ষড়োদিমে
যখনই কম্পিত কণ্ঠস্বর,
জেনেছি রক্তের মধ্যে অন্য এক চেতনার ধারা
বিভক্তিত করছে প্রহর।

জানব না কোনোদিন সেই প্রাজ্ঞ বটের শরীর
কখনো আমাকে ছোঁবে কিনা,
যদিও অদৃশ্য বৃক্ষ, শিকড়ের সোপন মমতা
পল্লব রোদের মতো মাঠের শিরিষে
আর্দ্র শান্ত করুণাধারায়
সঞ্চারিত দারা অনুভবে,
আমার শরীরে।

আরতি দাস

অবরোহ

মত সুখের যা কিছু ভরসা
মিথ্যে মনেরই কল্পনা
মণিমালা রাজকন্যে মা
হায়, আমাদের জন্যে না।

কত ঝড় জল রৌদ্র,
ভেঙ্গে নদী সাত সমুদ্র
পেরিয়েও সেই কন্যে না
না, আমাদের জন্যে না।

জানা সেই সেই মন্ত্র, না
ওকা সেই আছে যন্ত্রণা
ঘিরে অন্ধকার যে অঙ্গ
তাকে ঘিরে থাকে ভুজঙ্গ,
হায় এ প্রাণের পণ্যে না
মেলে না সে রাজকন্যে না।

হায় মণিমালা কন্যে না
না, আমাদের জন্যে না।

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

চর্যা

আমি তো ছুরন্ত নৌকা, নদীর অনেক ঘাট ছাড়িয়ে এসেছি,
পাঁচ দাঁড়ে স্রোত চিরি, ঝড়ে ঝাঁকে প্রত্যহও আমি পুষ্ট হই।
সমস্ত বিশ্বকে এই প্রত্যয়ে ধারণ করি, যাইহোক সে নাই,
আমিও নৌকা নই, মাঝিকের প্রত্যয়েই আমি থেকে যাই।

এবং আমিই নৌকা আর পাঁচ দিন :
ভৈরবী, মটী, রক্তকিনী, ব্রাহ্মণী, চণ্ডালী,—পঞ্চকন্যার বিহার।
অথবা নায়িক-ও নই, দুর্ধর্ষ শিকারীর মত ছুটে যাই,
আর পাঁচ হরিণীকে কমল বনের দিকে নিরন্ত তাড়াই।

চিত্ত ঘোষ

বিচিত্র সংলাপ

এক

দূর চিন্তা সততঃ প্রবলে
পূর্বপথ প্রস্তুতঃ আচ্ছাদিত ধূল
কিম্বা স্মৃতি অভিলাষ নিরন্ত হলহে
প্রত্যহ প্রভাত রাত্রি, আবর্ত, অসুখ।

প্রতীক্ষা রেখেছি বনে, সংলোপনে
প্রিয় নাম, প্রিয় ফুল, অপ্রিয় বন্ধুরা
কিছু কিছু উচ্চারিত ইতিবৃত্ত আসে
রাত্রির গলায় ঝরে মন্ত্রের হীরা।

অগ্নিই দূরের দীপ ; দূর চিন্তা, দূর দীপাবলী
মনে আলোড়িত হয়ে দুঃস্বপ্ন এখন
অগ্নি, বায়ু, অন্ধকার, রাশি রাশি বালি
অন্তরঙ্গ রক্তময় খণ্ডিতের আত্মার বমন।

উত্থিত ভীষণ শব্দ, বিকল ইলাহী সমারোহ
শোকাবহ যে নিয়তি নই দ্যুতিহীনা
দর্পণা নিকটতম, নিত্য, অহরহ
লক্ষ্যে সমস্ত দানে তাকে শুদ্ধ করা যায় কিনা !

একক অথবা যুক্ত, যুথবদ্ধ পরিচালনায়
নিসর্গের কাছে যাই উৎসারিত করি শুভ্রমুখ
কণ্ঠে নাবি আনন্দের উপনদ ধারা
শুশ্রূষা, সিঞ্চন, শান্তি, শীতলের উচ্ছল মধুর।

হয়তো এ প্রতিবেশ বিপরীত, প্রতিলগ্ন যাঁরা
অনেকুলভব নদী মরুরেখা লীন
বৃত্তাকার বলয়ের মৃত্যু সেই নদীর যন্ত্রণা
বেগময় সে তরঙ্গ অতিক্রম অত্যন্ত কঠিন।

আমরা তো দেখবই চোখে মৃত্যুচিহ্ন, শব
ইতস্তত: অন্তত্যার দৃশ্যের প্রধান
শীর্ণদল গাছের ছায়া, সে প্রেতলভব
আমাদের প্রত্যাহিত করবে সায়ংবায়।

এ ওর দু চোখে দেখবে অস্তিসন্ধি, হৃদয়ের নিদ
শাপিত প্রহর স্বর্গ দুর্গের দেয়ালে
দুর্বোধ রহস্যভূমি উদ্ভাস মহিম
দশদিকে মন্ত্রতার বক্র শিং মেলে।

প্রান্তরে শস্যও শূন্য, আছে প্রতিধ্বনি
গৃহস্থের মন্ত্র শান্তি আজো বর্গীয়োল
অলোড়ালে রুদ্ধ হয় রৌদ্রের ধমনী
পার্থিব না অপার্থিব আদল প্রবল।

শিল্পভূমি ভেসে যায় তমসুই জলে
অন্তচূড়া প্রত্যহের সিক্তল পাহাড়
নৌকায় পদ্মায় বয়ে জলধ্বনি চলে
তরণ্যহীন একা, বিকল সাঁতার।

দিনে দিনে মৃত্যুগতি উৎসবের স্রোত
হাসি পাশ অন্যমৃত্যু সন্তাষণময়
চক্রবৃদ্ধি ক্ষণ যাত্রে, বসন্ত, শরত
বয়ে যায় তিথি লয় নিয়ত সময়।

দুই

দর্পণে দেখেছে মুখ বার বার আবৃত আলোয়
চূর্ণ চূর্ণ রক্তরেখা চন্দ্রহার পুরী
একাকী হাতার সঙ্গী অস্ত্র অগ্নিময়
জলেস্থলে অন্তরীক্ষে পাই নি কস্তুরী।

বিলম্বিত হৃৎপিণ্ডে বিষণ্ণ মিলন
ক্রত, ক্রততম ক্ষণ অপসৃয়মাণ
শুধু যাত্রে দিনে দিনে অমিত অক্ষয়
দৃষ্টির সম্মুখে দূর তার পরিমাণ।

প্রত্যহ সকাল কাটে অগ্নিময় চোখে
অনিদ্রা আহত রাত্রি ঘুম কাটে দাঁতে
বিস্তীর্ণ মাঠের প্রান্তে একাকীত্ব শোকে
কম্পিত বুকেতে চায় স্তম্ভিত করাতে।

রেখেছ রৌদ্রের রঙে শুধু কিছু পাহাড়ে মহিমা
ধূসর বিকারগ্রস্ত ক্ষণকাল, হয়তো অমর
খুঁজে খুঁজে অন্ধকার, অসাবৃত উৎসমুখ, সীমা
কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ছুইয়াতে কুসুম শিহর।

তার নামে কী প্রতিজ্ঞা? উত্তরণ দিন
যায় যায় বৃন্তহীন ভেসে যায় জলে
সমস্ত আকাশ বাজে—কে ভালবাসিস্
অন্ধকার শনিগর্ভে, রাত্রির অতলে?

সেই যজ্ঞ প্রতিচিহ্ন এখনো তো আছে
অবশিষ্ট আবেগের ব্যবহৃত অন্ন অগ্নিতপা
একদিন মোহনার সেই দুর্বাদলবের কাছে
কেটেছে নিস্পন্দিলস্ত তারাময় তাদের কথা।

আর্ত যা আহীর আমি মৃত এ মণ্ডলে
মেদমজ্জা রক্তিকায়, ধূলি মাংসতায়
রাত্রিদিন অস্থিমাংসা অসে, অসে, অসে
আমাদের ইতিবৃত্ত দুরদৃষ্ট নিশ্চিন্ত পাহাড়ে।

ভেঙেছে বক্ষের শঙ্খ, ভেঙেছে তরঙ্গ
তেমনি প্রফুল্ল স্রোতে দুকূলের দিকে
আবার ঘুমেছি আমা, আহত প্রত্যঙ্গ
কতবার নিরাময় হয়েছে মিরিখে।

সে বৃক্ষ বেড়েছে শীতে নগ্নতল নিকনে
যুক্ত বোধ চেতনায় সিঞ্চিত ধারায়
সহসা অন্তর দৃষ্টি—সে অপুরীক্ষণে
কীটদষ্ট পত্র ফুল, করত, হারায়ে।

এ আলয়ে উপনীত কে তুমি আরেক
সহজ সরলরেখা টেনেছিলে হাতে
সেই রাজা একদিন যার অভিষেক
প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল স্মরণীয় রাতে।

সে অন্বেষা ধারবাস, দক্ষ নিবাস
উচ্চকিত কলরোল উৎসব আলোকে
আমাদের স্থির মন বিশ্বাসের সত্যপ্রতিভায়
সংযুক্ত করেছি লয়ে মুহূর্তে সে পক্ষীপালকে।

তারপর ? আদিকালে আজ এক ছবি
প্রহাতে নদীর উৎস, কীর্তিতত্ত্ব বিবা
ফুলে ফুলে পল্লবিত উজাস অটবী
বিচ্ছুরিত দিব্যবর আলোড়ন, বিভা !

তবু কি বিমুক্ত আত্মা, ভঙ্গ দায়াদেহ
দিকচক্রে অন্তকার তারার বিদ্যুতে
উত্তরে দক্ষিণে কারা, কাছাকাছি কেহ
একবার মণিপদ্ম পায় নাকি ছুঁতে ?

একবার হৃদয়ের নীলগুচ্ছ পদ্ম পুষ্প যদি
তুমি এলো এই লগ্নে, সন্তাহরী, তুমি এলো তুমি
অন্যথা কী পরিণাম ? প্রযোগের উত্তত অশনি
পিশাচের গীতরাগে মুখরিত হবে বন্যভূমি ॥

প্রণব মিত্র

বিষণ্ণ হলুদ ছায়া

(কোন একটি বিকেলকে স্মরণ করে)

বিষণ্ণ হলুদ রং মনে
আজ সেই নিলিপ্ত মনমে ;
পরম করুণ ছায়া মুক্তিহীনতায়
প্রসারিত জীবনে যৌবনে।
মনে হয় এইসব বিষণ্ণতা নিয়তির মত
আমাদের সময়ের কলরেতে সুপ্রতিকলিত ;
তখন প্রত্যয় নয়, ব্যবহৃত বিশ্বাসেও সংশয় নিয়ত
আমাদের ক্লান্ত করে ; আর সব জিজ্ঞাসাও মৃত ॥

হে প্রভু করুণাময়, তোমারই আশ্বাসে
সূর্যের আলোর গান পৃথিবীর শ্বাসে :

হে প্রভু করুণাময়, তোমারই বিশ্বাসে
যুবতীর দুইচোখে নবীন প্রেমের স্বপ্ন
সোনালী মেঘের মত ভাসে :

হে প্রভু করুণাময়, তবুও আমার
বিষণ্ণ করুণ ছায়া বুদ্ধিহীনতার
মিনতির মত হয়ে প্রেম-স্বপ্ন প্রত্যহকে
গ্রাস করে একান্ত গোপনে—
এবং সময় তার গুরুভার বোঝে এক ইঙ্গিত মরণে।

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

গরবিনী

চিলের পালকের রঙ,
তোমার চুলে
তোমার ঠোঁটে রক্তকরবীর
হাসি
তোমার গায়ে অশথের
কচিপাতার আভাস
তুমি অস্থির, তুমি চঞ্চল
কিন্তু আমার মনে
তোমার প্রতিমা
সন্ধ্যার প্রদীপের মতো
নিঃশব্দ, স্থির।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

কবিতা, কমকমুম…

কালো পাথর

কেন এই অন্ধকার স্পর্শগ্রাহ্য মমতায় আমাকে ডুবোলে
রমণীয় আদর্শের পর্দায় রাগানো বর্ণা রক্তিম বিকেলে
অনায়াসে কেটে যেতে পারে বহুদিন, যন্ত্রণায় যার
বিষাদের স্পষ্টতায় সপ্তাহে বিরাম-বার খোলে—
প্রেমে কি নিকট সেই পরিচয়পত্রটুকু আছে
কারুর গ্রামের বাড়ি শহরের পাশাপাশি হলে
দুকোণ ভেতর রক্ত গাঢ়তম, লোহিতাভ গালে
বিষণ্ণ মাছির ছায়া ঝুলে বসে শিহরণ পড়ে যায় :
দাঁত দিয়ে হাসতে হয় হাসির কথাও সেটা বটে
দাঁত দিয়ে কাটা যায় অন্ধকার অযানো পাথর…
গলবে না কোন কিছু, যেহেতু বরফ নয়, নয় জমা-জল
নক্ষত্র-বীক্ষণে যদি সাধ থাকে, অন্ধকার হবে কি তরল ?…

লাল ধুলো

ঘরে থাকা বড় শাস্তি…চিড়িয়াখানার সেই বার্ষিক ছবিটা :
পাহাড়ের দেশ থেকে চলে-আসা মরাদীর আকাশ দাবানো
কোটোর বিকৃত মনে হয়, তবু স্টাফ রিপোর্টার
হাতিবগলের ঝিপ্র পণ্ডিতমশাই যিনি মগয়ে এখন
ক্রস্ত বিচরণশীল…ক্রমাগত বাইরের লাল আকর্ষণ
কাজল জাগায় মনে, মনে, আর হৃদয়ের সব ঠাণ্ডা ঘরে—
কোনো এক অস্থিরতা, বিক্ষেপের অন্তরঙ্গ ধ্বনি
থেকে থেকে বেজে উঠছে, কাচে যাদে কর্কশ ঝাঁকর
দিঃশ্বাসে গভীর শব্দ কোন ছাদে ঠোকর লাগিয়ে
বিদ্যুত-পাখার মধ্যে অপগত মুহূর্ত-সময়ে…

বাইরে কে জল চালছে কুলবাগানের মত অজস্র গোলাপ
সিরিঞ্জ রক্তের মধ্যে কাঁটা দিয়ে গন্ধ দিয়ে আসে…
ছিন্নমূল কি যৌবন…কার চোখে আলা, অন্ধকার
বাইরে প্রবাহ বেশি…প্রবাহেই রক্তের প্রদাহ।

ক্যাসিং পোর্ট

ছন্দহীন লকঘাটা…কাঠপুলে তিনটি ভিখিরী,
প্রণয় স্মৃতিরূপে শেষরাত জলের শব্দের
তটপ্রান্তে অভিঘাত…আকাশের নক্ষত্রেরা মলিন পুরনো,
দোকানের উল্টোদিকে পুরনো দোকানগুলি অনাকর্ষণীয় :
এখন যবেদী সেই প্রচলিত শরীরের স্মৃতিগীতার
মূল্য নেই : রাত্রি কেন ছায়াবাধা মুরকের মনে
দিনের দহন ছবি, ভাঙা মুড়ি—উদ্ভাস্ত নদীরে
মস্তিষ্কের গভীর প্রবাহ থেকে ছুটে চলে আসে ঐ মৌকো, গন্ধ ঘোড়া
কিন্তির বিচূর্ণ চিন্তা, মিলহীন আত্মমতভাব
কেবল নদীর গলা ধরে রাখে কোনো উচ্চ সুর
কাঠপুলে তিনজন তিনটি পাখির রূপে আবিষ্কৃত হবে ?

ভোরের নগর

নগরের পাকদণ্ডী নক্সার চেয়েও ভীষণ
নগরে জাতিমতলা নেই, তবে কার বিস্মৃত বিবেক
ধূলিমুষ্টি ছিন্নভিন্ন…রক্তহীন ভোরবেলাকার ট্রাম যায়
স্টেশনে আত্মজিবে পড়ে—কার প্রিয় অভিরুচি আছে…
অন্তিম আদর্শে যদি শেষ লক্ষ্যের আলো ঝাঁকা হবে থাকে…
জলের শব্দের সঙ্গে পাহারাওলার ক্লান্ত দীর্ঘ পদক্ষেপে
ঘিঞ্জু-ঘিঞ্জু বাড়িগুলি ; তারে, আলে ঝাপসা-ঝাপসা কাকের আকাশে
হৃদয়ে রক্তাক্ত সেই চিরচেনা মুখরতা কার
সেরিনেড বাজিয়ে কে চলে গেছে ঐ জানালার নীচে থেকে
কেন ঝাউগাছ, কেন মর্মর ; তারায় রূপে চিত্রিত সকলই
সিংহলের দহনতা এতগুলি নিঃসঙ্গ প্রতীকে—

সময়ের দুর্গতি ছায়া···কার চোখ আকর্ষণ করে
গভীরে শীতল সেই স্রোতোধারা, জল, জলে হাওয়ার পলল।···

অরুণকুমার সিকদার

দুটি সনেট

দক্ষিণ ভারত

কল্পা থাকে রক্ষিত প্রস্তরে গুহায় দেউলগাত্রে ;
নটরাজ ঘটনের গঠন বা তাণ্ডবলীলায়
শিল্পী হয় তন্ময়চেতা। অবসর আততায় কারায়
মহাবলিপুরমের বিষ্ণু জাগে অন্ধকারে। রাত্রে
লাস্য ঢালে দেবদাসী অন্তরীণ মন্দিরে একাকী
দেবতা প্রণয়পাত্রে ; উন্মথিত অঙ্কিত রেখায়,
অনুরূপ খোদিত পাথরে বিস্ময়ে বিহ্বল পায়
অমর শিল্পিতনুস্পর্শ। সন্তরত ভাবে, "যাঁদি রাখী
স্বল্পপ্রাণ এর সাথে জীবিত যে বহু পরিমাণ
অলিন্দে বা ভিত্তিচিত্রে এই বাঁচা অমৃত অমর
মুহূর্তে স্খলিত করে।" এই ভাবে, কেমনা অজান,
কেমনা জানে না তারা শোকের যে অযোঘ অক্ষয়
মানুষীরে চিহ্ন দেয় নেই তাকে সেই অপমান।
দেবদাসী ভরা মনে, শিল্পীকৃত মৃত্যুই অজর।

"What we did till we loved !'

এ প্রশ্ন করেছি তাকে। অন্ত অন্ত যে সব প্রেমিক
এবং প্রেমিকা, যারা অন্ধকার খুঁজে খুঁজে বসে
যদিও যাপনে পারে টুকরো টুকরো কথার প্রদোষে
এক একটি স্মৃতিজোড়া দিন, তারাও ঐতিহাসিক

পূর্বকথা প্রশ্ন করলে যে বিমূঢ় চুপে ডুবে যায়
সেও তেমনি নীরব মিথ্যুক। সে আর বলে না কথা ;—
যখন সাম্রাজ্য নামে, অনির্বচনীয় উজ্জ্বলতা
মুছে দেয় তামাহীন দুজনের ঘামের প্রচ্ছায়,
তখন আমারই মত সুরজের মুখে মিশিত সে
দুরন্ত পুরোনো দিন ভুলে গিয়ে 'এ সব এ সব'
বলেছে, কেবলি তাকে মনস্তত্ত্ব দিল যে প্রশ্রয়
তার টীকা সে অতীতে নেই। বিস্মৃতির লুপ্ত কোষে
যে-সকল দিনরাত্রি প্রেমে প্রেমে যুক্তপাণি নয়
মিথ্যে সেই স্তব্ধতল, নিষ্ফল সেই অসীম সময়।

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

কে আমাকে দেবে ঘন অন্ধকার

কে আমায় দেবে ঘন অন্ধকার ? জলের শরীরে !
শব্দহীন তন্ময়তা। আমাদের অন্ধ পৃথিবীর
আবর্ত, বিষাদ, শূন্য, বক্ষমা বিষাদ চারিপাশে
ঘাসের প্রাণের গন্ধ তবে-থাকা সমস্ত আকাশে
কে আমায় দিয়ে যাবে ? নীল আলো-অন্ধকারে একা
যে সব নির্জন মেঘ ঘুরে দেবতার মত আসে
কৈশোরে হারানো রাতে, হায় তার তন্ময়তা স্মৃতি,
সময়ে ঘুলোয় সীম। শৈশবের আশ্চর্য হাওয়ায়
যখন মায়ের চোখ চেয়ে থাকে তারার তারায়
নক্ষত্র নির্জন রাতে স্বচ্ছ নদু হাওয়ার প্রতীতি !
হায় সে বিরল স্বর্গ কোথা থেকে আসে চলে যায়
কোথায় তাকাবো আমি ? আমার তারের মুখে আমি
তাকাতে পারি না। একি ! যন্ত্রণায় কুঞ্চিত শরীর

সোঁদামাটি, রক্তলেখা। আহত কোবল কালো চোখে
একি আর্তি অন্ধকার! ঘাসের মতন কাঁপে দেহ
নির্জন দেয়ালে একা কণ্ঠস্বর। নির্বাক বিলাপে
শিরীষের মূকতায়, বন্দীদাহ বন্ধ্যা পৃথিবীর…
কোথাও যাবে না সেঁত, আষাঢ়ের ছায়াতে আলোতে
কে দেবে, কি দিতে পারে, কোনখানে কি আছে চাওয়ার?…

• • • •

ঈশ্বর, আকাশ, জল আদিম নিঃশব্দ অন্ধকার
তোমাদের গভীরে কি ঘুমের মমতা? মমতীড়
বিশ্বাসে, বিরামে, স্নিগ্ধ মমতায়? তরুরেখা তীর
অদ্রির তরঙ্গ থেকে, তটের কাঠিন্য থেকে জল
উচ্ছল জলের ধারা। তোমরা কি স্থির, অবিকল
সব প্রার্থনার শেষ, অনিমেষ, অবাক নির্বাণ
সমস্ত প্রশ্নের, সব বন্ধ্যা ব্যর্থতার পর প্রাণ
তোমার গভীরে পাবে চন্দ্রঘন আশ্চর্য শরীর?…

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

দুটি সনেট

১. আমার কোরো না স্পর্শ। মাথা কুটে শিকল পাথরে
বিদ্রোহ নগর আমি; নিশাতের হাওয়া হাহাকারে
ঘুরে যায়: তপ্ত, রুক্ষ; কারও সাড়া নেই কোনখানে;
প্রেতের সংসর্গে দিন কাটে শুধু ঘৃণার প্রহারে।
অভিমান বলতে পারো, তবু তা-ই মিশে যায় চলে—
চিহ্ন নেই, স্মৃতি নেই; অন্ধকারে থাকি বন্ধমূল;
পোষিতের আশটে গন্ধ মিশে আছে পরিধেয় পরলে।
আমি আমি দিতে হবে অকৃতজ্ঞ জন্মের মাশুল।

ছুয়ো না, ছুঁয়ো না তুমি। কেন তুমি শোন না বারণ ?
শাপগ্রস্ত শতাব্দীর বহতী যাত্রির চরাচরে
আমার উদ্ধার নেই। মৃত্যুর দারুণ আকর্ষণ
পঙ্কজের মতো জলে মণিকের বিমূঢ় বিবরে।

যন্ত্রণার গর্ভে জন্ম। কেন ডাকো সমুদ্রে আমার ?
তোমার সে ডাক শুনে আমি হই বিদীর্ণ বিদার ॥

২. জানিনে করুণা এ কী ! আমার কী বলে সম্ভাষণ ?
কী করে বইব বলো বিস্ময়ের দুরন্ত সম্ভার ?
এ কি পরাজয় ? প্রেম ? নাকি এর নাম উত্তরণ ?
তবে কি সত্যই ঠোঁটে স্পর্শে যাকো প্রিয়ঙ্গু সম্ভার ?
তবে কি কিন্নর-কণ্ঠী সব নদী আজও প্রবাহিত
তোমারই রক্তের গানে ? সমুদ্রের সৈকতিক পুঞ্জ
তোমারই দুচোখে জলে ? রেখেছিলে তবে কি সঞ্চিত
তোমারই নিঃশ্বাসে যত ফুলের সুরভি দ্রাক্ষকুঞ্জ ?

একান্ত দুখের স্বপ্ন বিদ্ধ করে আমার হৃদয়।
উজ্জীবন, অভ্যর্থনা, প্রতিশ্রুতি প্রাণের মৃণালে
অনুরাগ ফুটে ওঠে ; মর্মরিত নিস্পন্দ নির্ভর ;
বুকের নিভৃতে যদি পুড়ে যায় বিহ্বলে নিকালে।

মৃত্যুজয়ী প্রাণী আমি, অন্ধকার করেছে মঞ্জুর।
জানিনি কখনও আগে পরাজয় ভীষণ মধুর ॥

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

রক্তাক্ত দিগন্তে ওই

রক্তাক্ত দিগন্তে ওই দিগন্তে, রক্তাক্ত
অফুল সন্ধ্যায় আমি কার

রক্তাক্ত একলহমার
স্বপ্ন ও বাসনা তীব্র বাসনা ও স্বপ্নের অন্তর্বাস
তরঙ্গের দোলা কিরে পাবো।

যাকে কোনদিন দেখিনি অথচ
যার নীল মাথার মুকুট
আমার চোখের সামনে চিরদিন মেঘের আড়ালে
হারিয়ে গিয়েছে। যার খোঁজও
অতঃপর পাইনি কোনদিন,
কিন্তু যার চিবুকে ও গালে
আমার ঠোঁটের স্পর্শ মজ্জিত সোনালি রঙীন
এখনও মিশ্চিত আমি আছে।

সেই সোনালিরই রাঙা সিরবধি সন্ধ্যার রক্তাভ
ছড়িয়ে রয়েছে, সেই রক্তাক্ত একলহমার
তরঙ্গদোলায় বুঝি তার
স্বপ্ন আমি আমারই খুঁজে পাবো বুঝি কিরে পাবো
ওই রক্তদিগন্তের মাঝে!

শান্তি লাহিড়ী

নরকবাসের শেষ অধ্যায় : অমরতা

আরে কে, তুমি সা আমি? হাওয়া হাতে চতুর্দিকে রক্ত কাচে বাইরের দেয়ালে,
ঘরে ঝিম সময়ের ম্লান এক প্রতিবিম্ব, ধূসরতা অবেদ পেন্টিং এ।
কিছু কাগজের নৌকা, ভাসবেনা বৃষ্টির জলে হয়ত কখনো,
অন্তরে মৃত্যুর সাথে বাইরে জ্যোৎস্নার দৈত্য খুঁজেও পাবেনা।
একটু স্মৃতির সূত্র। কোন ক্ষীণ প্রতিচ্ছবি, চেহারার মিল।

যদি সেত তবে ঠিক ঘরের ঘুলঘুলি চাঁদ নীল হত—আকাশের নীল।
নদীর উদ্ভুক বুক পড়ে আছে, সুচিহ্নিত অথাধ সুদারে
একটি নদীর নাম মরে গেছে, নিভে গেছে একটি দীপের নীল আলো,
সে প্রেমিক ঘরছাড়া, অর্ধমৃত সে বিপদি কবে উঠে গেছে।
তবু ওঠে—কত ওঠে নদীর উদ্ভুক বুকে, কাগজের নৌকা সেই কোথাও, কোথাও
কাশের শিথিল বনে ফুটে থাকে সময়ের নির্মম ইশারা।
সব্জ কে, তুমি মা আমি? হাওয়া হানে চতুর্দিকে, রক্তকাশে, বাইরের দেয়ালে।

দিব্যেন্দু পালিত

তিনটি কবিতা

সবাধারে নষ্ট ফুল

চেতনা উদ্ভত করে বেদনার নীল অনুভব।
করতলধৃত স্মৃতি : যে আমার করিত অধর :
পাথরে শিল্পের ক্ষত, ধুলো জমে, ভগ্নাশ আকৃতি—

যতো তাকে ডেকে আনি : স্থির-মুখ, ব্যর্থ প্রতিকৃতি
শিয়রে দোলায় মৃত শলকের 'ক্ষণপূর্ব' ভয়—
প্রমূর্ত বিষাদ, দেবী, ঢাকে সোতে ম্লান উত্তরীয়।

সবাধারে নষ্ট ফুল, অন্ধকার গভীর থেকে ভিজের পুতুল
কোতে, আর্তনাদে ভাঙে, রক্তের চীৎকার কেঁদে ওঠে।
বিপুল মেদিনীপৃষ্ঠে দেবতা কে! অসুর রমণী
তমাস্রে সৃষ্টিত করে জন্মের বীজাণু : ক্ষুধা, কৌটা কৌটা ক্ষয়ে।

জন্মের দেবতা, আগো, আর্তের শরণে; সব ফুল—
রমণী, রমণ, কিংবা গৃহসুখ, বহুলতা বিষিত বে-ঠাঁটে,
তার কব বেয়ে ঝরে লোল স্মৃতি; স্পর্শাতুর ধ্বনি।
কাপালিক কবি ব'সে, শবাসন, স্খলিত অন্তরে।

বুকের আকাশ হ'তে

চীৎকার ছুঁয়ে গেল সব—
রাত্রি আর অন্ধকার, নারী।
কথা, কার কথা দুই চোখে
সঙ্গোপনে। প্রেমিক, বৈভব
মেলে না কোথাও, তাই পারি—
বুকের আকাশ হ'তে শোকে।

তবু আমি রব অনুদার।
বৃষ্টিপাত, শব্দ হোক। ভালো-
বাসেনা কোথাও কেউ জেনে
হৃদয়ের গর্হিত উৎসার।
কে আমার অন্তহীন আলো
রংগের ভিতর টেনে এনে।

লোকাচারে মগ্ন বহুজন
ইতিহাস ল'য়ে যায় ঘুরে—
ব্রাকারস, অহিফেন, জল
বাষ্পায়িত; শোষিত করুণ:
নিজেরই ছায়ায় মাথা ঠুকে
মূর্তি গ'ড়ে তুলি অবিকল।

দেবতা আমার, তবু ভয়ে
প্রেমিকের সম্মান লুটায়
রেস্তোরাঁয়, হাউসে, উদ্যানে।
একদল কুমারী বিজয়ে
প্রতিধ্বনি প্রতীকে কেয়ার—
হৃদয়-পদ্মের কাছে গানে।

বুকের ভিতর স্নেহ

বুকের ভিতর স্নেহ এখনো অনেকদিন বড়ো কষ্ট দেয়।

কষ্ট হ'লে যতো আমি চ'লে যাবো নিজ গৃহে যেখানে আমার
মৃত্যুর অনেক আগে জন্মদাত্র উন্মোচিত জরায়ুর তালে,
মায়ের সমূহ রক্ত প্রাবনে আসার শাদা গোলাপের দল—
পৃথিবীর ভীত এক হরিণীর মতো দ্রুত শব্দে ছুটে যায়
কান্তারে কাননে ; পাপ স্মরণে শাদার নিত্য ; বৃষ্টির পতন
উন্মোচিত ক'রে হালে জন্মা-যোনি, প্রেতায়িত প্রখর নিঃশ্বাস—
শোকার্ত জননী আমি তোর শোকে ভুলেছি ক্রন্দন।

এমন অনেকদিনে স্বপ্নের ভিতর কার রক্তের ছটায়
সূর্য জ্ব'লে ওঠে, সূর্য লগ্নে রশ্মির রথে শিরোহ্ন জন্মায়
জাগরূক করে। পরে কার অট্টহাসি শুনে অন্ত জেগে উঠি :
আমার শয্যায় আমি নিহত চতুর্থ দীর্ঘ প'ড়ে থাকি।
মরণে মরণে বন্ধু রটায় আমার মৃত্যু, শাস্ত্রশাস্ত্র ভেঙে—
নিজের দর্পণে আমি জন্ম-মৃত্যু সত্যি হত কিনা।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

পাখি জানে

১ বাইরে অবাধ মুক্তি ;
জানালা খোলো দরোজা খোলো, আলো,
ছড়িয়ে পড়েছে তাখো,
কেমন নিশ্চিন্ত ছুতে অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ সকাল ;

দরোজা খোলো, তাখো, অদূরে শিরোহ্ন বেঁকে
পাবে চলা স্বাধীন পথ, যত খুশি যেতে পারো
যত দূরে ইচ্ছা বিপুল, কাঁপিলে ঠেকবে না পা, দেখানে
সিঁড়িতে কিংবা উঠোনের শক্ত ভয় নাম ;
এখানে পুড়বে না জানবে, পা কিংবা মন কিংবা দেহ,

আশ্চর্য ঘুলোর দোষা : সুপদী বট, আসলকি বন
নীলকণ্ঠ পাখি জানে, পা বাড়ালে বলে দেবে
সে পথের সবুজ ঠিকানা।

২ জানালা খোলো, তাখো, কেমন বন্যাহীন হাওয়া
শান্তশীল অভ্যাসে খুশি হয়ারে আলো, তাখো :
অন্ধকারের অন্ধকারে ইতস্তত অস্থিরতা কত পরিহাস,
অসুখ রাত নুয়ে হলে তারমুক্ত অবাধ প্রভাত বেলায়
জানালা খোলো দরোজা খোলা, আলো
হাতিবে পড়েছে তাখো,
কেমন নিগড় ভুলে অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ সকাল :

৩ দরোজা খোলো, তাখো
ইচ্ছে হলে যেতে পারো ওই পথে, অফুরন্ত হারানীল পথ :
জানালা খোলো, তাখো
বিচিত্র খুশির হাওয়া, ইচ্ছে হলে ওর সঙ্গে কথা বলো, বিচিত্র সংলাপ
বাইরে অবাধ মুক্তি
পাখি জানে
সে পথের সবুজ ঠিকানা।

সমীর চক্রবর্তী

অঙ্গীকার

শোন্, যদি দেখতে চাস্ সপ্তর্ষির আলো,
কিংবা সোনার সকালে কোনো আদিগন্ত রূপের বিভ্রম,
চেয়ে তাখ—নদীর হৃদয়ে কাঁপছে হরিণীর মুখ
দুচোখে নক্ষত্ররেখা। উৎসবের নরম বিপণী—
এ সবকে ভুলে রেখে, আমি ছাপ্পান্নি উজ্জ্বল শরীরে।

শোন্, যদি দেখতে চাস্ সপ্তর্ষির আলো—
আমার ঘরে আয়। মাটি কিম্বা নীলাভ আকাশ
কোথাও পাবনা পদ্মদীঘির সান্ত্বনা,
আমারি কান্তিতে শুধু অমল উৎসব।

সতত দেখেছি আমি প্রাতঃস্নান ছলের শিকড়ে।
জরা মৃত্যু সহোদর, তবুও আরেক অঙ্গীকার
অংগের শোণিতে আছে। সুখ!
আমি শুধু দিতে পারবো রাত্রির পলাশ।

বিনয় মজুমদার

আমার বাতাস বয়

আমার বাতাস বয়; সদ্যোজাত মরুভূমি থেকে
কেবলি বালুকা ওড়ে, অবাহিত পিপাসা বাড়ায়।
ওরা দিয়ে ফিরে আসি মরূদ্যানে পরিশ্রান্ত তীরে।
কী আশ্চর্য, খুসি হয় কুকুর, উটাদ, রাজপথ।
ভেবেছি, সভার মাঝে একটি কুসুম আপনার;
ব্যথিত আগ্রহে দেখি, এত ফুল, কোনটি বুঝি না।
যে কোনো অপাপবিদ্ধ তারকারও জ্যোৎস্না আছে ঢেকে
কারো কাছে যেতে চাও, হে চকোর, বহুচারী, বৃথা।
যে পাপের অভ্যর্থনাকারীদের মাঝ দিয়ে হেঁটে
বিদেশী ব্যক্তির মতো কে জানে কোথায় যেতে হবে।

বিজয়কুমার দত্ত

দুটি কবিতা

মৃত্যু

শৈশবে অবের চিহ্ন, আধৈকশোর শোকের প্রতীক
হে মৃত্যু। জীবনে তুমি চুপি চুপি বন্ধু হয়ে এলে :
জীবন প্রেয়সী হয়ে প্রণয় হাসির রেখা মেলে
তোমাকে দেখতে চায়।
তুমি কি রমণ-ক্লান্ত কোমলিম হবে না মরণ ?
মাতালের মত হাসি হা হা রবে আকাশ কাঁপাব—
আমরা নিশ্চিত জানি হয়ে যাব স্থাপত্য হিংসায়।

পৃথিবী

আমরা সবাই তবে চলে যাবো অন্ধকার ঘরে
বাইরে উজ্জ্বল আলো, নীলকণ্ঠ পাখীদের গান,
যুবতী পৃথিবী ঘিরে সুন্দরের অমেয় সন্ধান
যেমন আজকে দেখি।
সংসারে বাজবে সুখে দুঃখময় অনুভূতির সুর
জটিল জটিল সব চিন্তাগুলি মানুষের মনে
তীব্র করবে কঠিন যাতনায়
আমরা বিস্মৃতি হব, মানিতের অবলুপ্তভায়
এই আজ বেঁচে আছি রমণী শরীর তোলে
ভালবাসা প্রেম বা প্রণয়, (কি যেন লিখেছি নাম !)
বালখিল্য যুবকের মাঝে মাঝে হয়, দৈহিক যন্ত্রণা হেতু।
তারপর কিম্বদন্তী, ইতিহাস কিংবা সময়
কি হবো শতাব্দী পরে, মানুষের রক্তে তার বাণী লেখা হবে।
আমরা নিশ্চিহ্নিত সাময়িক ভুল যৌবনের,
উজ্জ্বল পৃথিবী বুকে কলঙ্কের দাগ রেখে যাব।

ইহলোকসম্ভব কুণ্ঠা

ভদ্রতার কাছে

সংযত জিহ্বার মিঠে মেলা করছে অসংবৃত সুর
ওদের শিরেই ভয়, সহসা হাতের চিল ছুঁড়লে অন্ত পথ নেই আর
বাস্তব বিমুখ হবে, নির্বিবাদ মানিকাও দাবদীপ্ত ক্রুর
হাসি হেসে বলবে, এই ভালোবাসা কারো কারো পক্ষে শুভতার।

জ্যেষ্ঠের শাসন মানতে কৈশোরক কেটে গেল বিনা রক্তপাতে
শিক্ষার আচারে শুধু সংশোধিত হল কই অসংবৃত বেশ
চকিতে প্রগল্ভ হই, ইচ্ছে হয়, চপল হাওয়াতে
খণ্ড খণ্ড করি তুচ্ছ ভদ্রতার রীতি নির্বিশেষ।

সকলেই অবতার, কঠিন শিরবে কোনমতে পা ফেলেন
ঘরে যান ক্ষুব্ধচিত্ত সম্মানের শুধু ক্লান্ত উন্নত গৌরব
পরিচিত মুখ পেলে মেপেমেপে হাসেন কিন্তু তফাতে রাখেন
ভিতরের সহজাত একান্ত আপন জনে—ধন্য ইহলোক!

হৃদিপদ্মদল তাই খুলেও খোলেনা কৃষ্ণাক্তের মৌমাছি
নির্মম মুষ্টির নিচে গুমরে মরে, অন্তরিম দ্যুতি
কোথায় ছড়াবে আলো বর্ণহীন মিথ্যে মোহ দিয়ে ঘেরা আছি
স্বাসরোধী অন্ধকারে ভালোবাসা নিষন্ন আকৃতি।

শোভন সোম

অন্তিম ইচ্ছার কাছে

তোমরা দাঁড়াও স্থির সন্তোষণে, তিমির বিলাসী
যাদের দুচোখ মেলে দেখতে পারনিকো তারা কাছাকাছি এসো…

অনেক ক্রোড়ের মুখে, ধূলোয় উড়ন্ত হাতে মহে গেছে রেখা,
বিকল্প বিহীন বহু বাসনার বর্ণ-বিবরণ…
তোমরা দাঁড়াও স্থির পাশাপাশি, তিমির বিলাসী।
না, আমি আলয়না আলো, ঘরে কোনো দীপাধার নেই
শৈশবের দীপাধার কে কখন কেড়ে নিয়ে গেছে
রঙীন খেলনা হাতে তুলে দিয়ে আমরা ভুলিয়ে
এমন কি সেই খেলনা তারপর হারিয়ে ফেলেছি…
খুঁজিনা দাওয়ত পীতে মহুয়ার ধূলোর সান্ত্বনা…
তোমরা দাঁড়াও স্থির দীর্ঘ দেহী তিমির বিলাসী
তোমাদের ছায়া নেই, তাই মোর তিমিরের গাঢ় অন্তরাল :
না, আমি আলয়না আলো, ঘরে কোনো দীপাধার নেই
আঙুলের অস্তিত্বটা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চেনাবে চেহারা।

মৃত্যুকে করিনা ভয়। মুহূর্তের মৃত্যুর সম্মুখে
দাঁড়াইনা ; নই কাপুরুষ।
স্বপ্নে কোনো শব নেই…পূতিগন্ধ আজীবন দায়।
মরুকের স্পৃহা নেই…কিংবা কোনো আগত বিষাদ।
স্বর্গের করিনা সাধ। ঈশ্বর কী শয়তানেও রাখিনা বিশ্বাস।
স্মৃতির তাড়না চাইনা…যেমন ঘাটের লোকে মোংরা মাছির,
কৃমির ক্লেদাক্ত সুখ। অনিশ্চিত নৌকো হতে শুধু সাধ মন্থরের ঠিকানা বিহীন।

জীবন স্বয়ং শিল্প, হইনি তবুও পৌত্তলিক।
অনুভূতি আসে মৃত্যু বাহু রূপে যেমন চন্দন মুখে ঈপ্সিত মদির…
আমার অখণ্ড ক্ষেত্রে আমি একা চির জাগরূক।

তোমরা দাঁড়াও স্থির সন্তোষমে, তিমির বিলাসী।
না, আমি আলয়না আলো নিরুপম তিমিরের নিবিড় গহনে
তোমরা দাঁড়াও স্থির, যারা বাকি তারা উঠে এসো…
শুধেছি অন্তিম লয়ে একবার জেগে ওঠে সব বিস্মরণ
শুধু একবার।

মৃত্যুকে চিনি না আমি, অবিকল দীপ্ত সেই ক্ষণ
জীবনে একবার আসে, অবিশ্বের মৃত্যু আমি জীবনের অস্তিম প্রতিভা।
তোমরা দাঁড়াও এসে কাছাকাছি, তিমির বিলাসী
তোমরা আমারই অংশ, আমার তন্ময় চিন্তা, মুহূর্তের দানে
তোমাদের সৃষ্টি ; যেন আমি এক অমোঘ-বিধাতা...
হা মূর্খ, হা মূঢ় আমি, নই অমর তবু উজ্জ্বল পিপাসা
বুকে নিয়ে নিরবধি মগ্ন এই সৃষ্টির খেলায় :
আমি যেন ধূলি সম দিয়েছি বীজের অন্ধ প্রাণের গভীরে।

শেষ লগ্নে থাকবেতো ! স্মৃতির ছলনা কেন ! মিহি মিশ্রিত
মৃত্যুকে করিনা ভয়, মৃত্যু ঘুণিবায়।
পুঁজিনি করিতে যুক্তি : কোনো চিহ্ন রেখে যেতে চাইনা এ নাম
শেষ বিস্মরণে ডুবে যাবার আগের লগ্নে শুধু দেখতে চাই
তোমাদের, কাছে এসো, আমার বুকের কাছে, তিমির বিলাসী
তোমাদের সর্বদেহে আমার আনন্দ, অশ্রু, আমার সমস্ত পরিচয়,
শেষবার দেখতে চাই তোমাদের মতো কাছাকাছি...
না, আমি আলেয়া আলো, ঘরে কোনো দীপাধার নেই
আঙুলের অস্তিত্বতা দিবে আমি চিরন্তন চেহারা
তোমাদের মত আমি তারপর যেতে পারব মৃত্যুর আড়ালে

মৃত্যুর পাখির মৌকো কাউকে যাতনা দিয়ে পুনরায় ডাকের মন্তরে।

মানস রায়চৌধুরী

স্বাগতাম

সংকুচিত হয়ে আছি এই দীর্ঘ শয্যাধারে, রয়েছি পতিত
স্বাগত নেই কেন বলবে হে অগ্রজ, আমি চেয়েছি যাদভূমি ?
এমনই স্তম্ভিত যাবে কারো বেলা, স্বাগতম এখনি অনিশ্চিত

আশা কি কুণ্ঠিত গ্রীবা নুয়ে রয়, কেন ক্লান্ত হৃদয়ের তৃষি
বিশ্বাস উড়িয়ে বলো এইখানে এইদিকে নেভেছি আগুন।

নেভেছো আগুন তুমি কার জন্যে, কোন্ সিংহাসনে,
বিড়ালের মতো দুর্ভ দেখা যায় শুক্লরেখা, মার্জার জীবনে
উদ্বিগ্ন ব্যতীত কোনো প্রাপ্তি নেই, আমি কি মার্জার মতে থাকো
তোমার দুয়ারে দুগ্ধ রয়াহত, উৎসব স্নেহের তোরবেলা
বিষণ্ণ সানাই শুনে কেন মোরা আস্তাকুড়ে দাস করবো খেলা।

এইতো সুন্দর আছি, বিস্ফোরক আগ্নেয় পাথরে
কোনো একদিন আশা উঠে আসবো তামসিক বাস্তবে। হাতরে
তবু হাত বাড়াবোনা—'ঈশ্বরের মত আপনি দয়াময়' এই কথা বলে
আমি কি চেয়েছি শুধু ধূলোমাখা মন্ত্র করতলে
কয়েকটি করুণাকণা, দয়াতামা, একমুঠো ছাই বারেবারে।

আলোক সরকার

হেমন্তগোধূলি

হেমন্তবেলায় দু-টি ফুল ঝরলো। চারিদিকে নিস্পৃহ কুয়াশা
তার মাঝে বিষণ্ণ পর্বত জ্বলে স্ফুরিত অক্ষর।
অকম্পিত মাধবীলতার ভালপালা। ভ্রমরের ক্লান্তিময় ভাষা
যখন নির্জন রাখে অবরুদ্ধ কান্নার বীরুধে :
অন্তিমাস লুকোতে পারোনি সদ্য যাগাম কীর্ণ আহত নির্ঝর।

যেন রাত্রি অরুণ পক্ষের সাদা জ্যোৎস্নায় আর্ত অপলকে
দুইটি বৃক্ষের একা নিবে আসে বিচ্ছিন্ন প্রার্থনা।
উদার প্রান্তর নিঃস্ব কাশবন জীর্ণপাতা অরণ্য পাহাড়।
মহিমা, অলক্ষ্য ধূপ কোন্‌খানে আলো। ? সৌরভের সুপ্ত আরাধনা
দিগন্তের ক্লান্ত চেহারা কাদে—অশ্রুতারানত উপচারে।

ফিরিয়েছো কঠিন শপথে মুখ কালো চুলে স্থির প্রত্যাশায়
অতন্দ্র নিবিড় একাকী।
গোধূলিবেলায় দু-টি ফুল হলো, সবতন্ত্র একাগ্র নির্বাণ
অথচেলো নিস্পৃহ নীরব ছিঁড়ে আলোকিত উষা :
স্বপ্ন এসেছে আজ মিলনযামিনে, দীপ জ্বালে আমরা জোনাকি।

লোকনাথ ভট্টাচার্য

ততক্ষণ শিমুলগাছটিকে

এখনো আসার আছে মুহূর্ত, আরম্ভ হওয়ার আছে গান।
এখনো চাওয়ার আছে মৃত্যু, আর সূর্যাস্তের হাহুতাশ।

যাদের দেখেছি চলে যেতে, ছায়ার ছায়ায়, তাদের ফিরে আসার আছে।
তখন শুধুই সূর্যালোকের বেদের কথা। শুধুই নিশ্চয় জানি,
কী এক বিদূর বিস্ময়ে বিভাসিত হবে আমাদের দৃষ্টি,
আসব অন্তিমের এক প্রস্তুতির প্রতিভাষ।

আজ নয়। আজ তাষাটে আকাশ সূর্যাস্তের পরে, সে বিরাট কুঞ্চিত
কপাল এক বুড়ো নট-দৈত্যের, যে বিভীষিকায় ঢেকেছে শিহরণ ; আর এই
আসন্ন ডিমিরকে হনন করার কোনো বজ্রই এখানে উদ্যত নেই।

আমি, এদেশ এক অন্ধ সূর্য-চাষের, এক অন্ধ বালুর-কান্নার, এক অন্ধ
মুহূর্তের—যেখানে আমরা।

ওরা কবে ফিরবে, জানি না। জানি না তখন এই শিমুলগাছটা থাকবে কিনা,
থাকলেও তার পাতার কারুকার্যে আর খুঁজে পাব কি না একই পরিচয়ের নিবিড়
চাউনি। যা' জানি, তা' তুমি-আমি থাকবই, নইলে ওদের ফিরে আসা হবে
অর্থহীন, ওদের ভ্রম ও সাধনার যাম হবে ব্যর্থ।

এসো দেবী, প্রেম আমার, আমার সহোদরা, আমরা দুজনে এই দীর্ঘ রাতটা কাটিয়ে দিই পরস্পরকে ঘিরে পরস্পরের হৃদয়ের উষ্ণতা, নতুন ভোরের সঙ্গেই আমাদের দিনগত পাপিৎ হারাবে। সময়কার করি এই প্রতীক্ষার মুহূর্ত, যাও পূর্ব, যাও সুন্দর, কারণ সে চেয়েছে।

আর, ততক্ষণ, ভালোবাসি আমাদের শিমুলপাহাড়িকে।

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি ছড়া

(অঙ্গণ ভট্টাচার্য ও বীরেন চাটুজ্যের জন্য)

গরমে আইঢাই প্রাণ—
জীবিকায় পড়িল কুয়াশা
ক্ষণে ক্ষণে রোষে শ্বাস,
আমাদের পুরুষার্থ চরিতার্থ হয় শুধু
অপরের দেখে অপমান,
দুবাহুর ঝকঝক আকাশ—
এখনি আশার মেঘ গড়ে তোলে,
তাতে ধাম্ ধাম্।
বিবর্ণ মোড়ক খুলতে মনে পড়ল
শান্তিনিকেতন
প্রসন্ন বন্ধুর মুখ, শালবনে হাওয়ার শন্ শন্
চকিত মন্তব্য যত, বেলরোদ্দা
হাসির ফোয়ারা
অদূরন্ত ভদ্রভূমি—দূরের সাহারা,
সব মনে পড়ে গেল—
এখন পরীক্ষা-ঘরে ইনভিজিলেশন্
—'এই ছেলে টুকোনোক'
কতদূর শান্তিনিকেতন।

রাম বসু

প্রজার কথা

ওই দিকে যাও রাজা
তাখো আরও একজন মরে আছে অন্যায় কিনারে
জল ঘুরছে জটাধারী চুলের সোতায়
বিস্ফারিত দুটি চোখে বিষিত আলেখ্য
সে যত কৃতার্থ ছিল
দাওনায় তার বুক ভরে যাবে বলে
দুরন্ত নক্ষত্র থেকে আসছিল একদা।

ওই দিকে যাও রাজা
অতিপদ মহীগ্রহ ভাঙাচোরা মুখ
জন্ম মৃত্যু ক্লান্তি ও কামনা দিয়ে
প্রতারিত পৃথিবীকে এখনও রাজার।

ছেড়ে দাও পক্ষীরাজ শিকড়িত আঁধারের দ্বারে
পাখনালা খোলা আছে বুকের তলায়
মেঘের মুকুট রাখো ঘাসের ওপর
খুলে ধরো শৈশবে আবৃত তলোয়ার।
যে বৃক্ষ পুতেছি আমি, আমি যাকে
ঈশ্বরের করুণায় পেয়েছি নির্জনে
মাথা রাখো তার গাঢ় সুষমিত জটিল শিকড়ে
মাতৃরাতে সে তোমার ক্লান্ত মুখে ছবি এঁকে দেবে।

আমরা মৃত্যুর রাজা বহুদিন বসে আছি আলের ওপর
জোনাকি, লতার মধ্যে পা ডুবিয়ে কতকাল ; রাজা
যাবার সময় তুমি আমাদের গন্ধ করে দিও

যাবার সময় রাজা ওই মৃত লোকটিকে তুমি
করে দিও প্রবাহিত মৃদু কণ্ঠস্বর
গন্ধ ও ধ্বনিতে পূর্ণ হোক পুণ্য নিষ্কল বীথিকা।

অরুণ ভট্টাচার্য

ধ্বনি রঙ অক্ষরের রেখা

তোমাকে উপলক্ষ্য করে একবার কয়েকটি কবিতা,
মনে পড়ছে, লিখেছিলাম। বসন্ত অথবা শীত
বছরের বিভিন্ন ঋতুতে পীতবর্ণ মৃদুলতা।
অগোছালো আকাশকে দেখে তুমি বলেছ তখন
কবিতার সঙ্গে ছবি কী গভীর অর্থে আলো
পরস্পর মিলিত উপমা। আমি লিখেছিলাম শুধু।

স্পষ্ট নয়, অন্ধকারও নয়। হৃদয়ের অসুখ যদি না
সারে, যদি যাও সারে তুমি কি বুঝবে কেন শব্দ,
শব্দের ঘনিষ্ঠতর অর্থ, অর্থবহতার ঝিনুক।
মনে পড়ছে কবিতার শেষ ছত্রে এমনি ইঙ্গিত
ছিল। তুমি ভেবেছিলে আমি মিথ্যা কয়েকটি রঙে
অবশিষ্ট ছবিটা এঁকেছি। মনে আছে তুমি ক্লান্ত।

একবার দেখা হলে ভালো হোত। কেমনা অপরিণত
বয়সে যা ভেবেছি তখন কিছু তার প্রথাগত,
বাকীটা দুঃসাহসের। তোমাকে উপলক্ষ্য করেই
কিছু নতুন কবিতা লিখবো। ধ্বনি রঙ অক্ষরের রেখায়।

সাহিত্যের ধারণা

অমিয়ভূষণ মজুমদার

কোন কোন সাহিত্যিকের কাছে কেন লিখি—এটা একটা সমস্যা হ'তে পারে। এ সমস্যার অর্থ এই নয় যে লেখক হতাশ হয়ে পড়েছে লিখে কোন লাভ নেই দেখে। বরং যেন এমন একটা ঝোঁক আছে যে হতাশা থাকা সত্ত্বেও লেখা হচ্ছে। এবং তারই কারণ অনুসন্ধান করেছেন অনেকে।

কোন কোন লেখক বলেছেন না লিখে উপায় নেই ব'লে লিখে থাকেন তাঁরা। তাদের এ কথা শুনে প্রথমেই যা মনে হয় সেটা হচ্ছে এই কেউ যেন কিছু যেন তাদের পেয়ে বসেছে, সেই লিখতে বাধ্য করে। এ শ্রেণীটা পাঠক-সমাজকে অতীন্দ্রিয় সাহিত্যে এমে চমকিত করতে পারে কিন্তু এ রকম কোন প্রেরণার উৎসে মানুষ আজকাল আর বিশ্বাস রাখে না। লেখকদের এ বক্তব্যেরই আর একটি রকমফের আছে। তাতে বলা হয়েছে অন্তরে প্রয়োজনের বেশি বাড়তি খানিকটা কিছু আছে ব'লেই সাহিত্য করা। সেই বাড়তি কিছুর স্বরূপ নির্ধারণ কঠিন তো বটেই কিন্তু বাড়তি কিছু থাকলেই তা সাহিত্যের দিকে টানবে বা ঠেলে দেবে এমন নিশ্চয়তা দেখছি না। একই যুগে মানুষ এই বাড়তি কিছুর চাপে জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ হয় কেন? বাড়তি কিছু নিশ্চয় থাকে—সেটা অন্যের চাইতে পরিশ্রম বেশি করার সাহস ও সামর্থ্য—এক রকমের বাড়তি জোরও যেন। কিন্তু এ বাড়তি কিছু পথ ব'লে দেয় না। পথে চলার শক্তি যোগায় বরং।

এ কথাটা সোজাসুজি বলে দেয়া ভালো সাহিত্য করার পথটাকে আমরা সজ্ঞানে যাহাই ক'রে নিয়ে থাকি। আর যাহাই করার ব্যাপারটা হয় পুরো মন দিয়ে। মনের চেতন বা অবচেতন অংশে কে কাকে কতটুকু সাহায্য করলো এ ব্যাপারে তা বলতে যাওয়া বৃথা। সাহিত্যকে যদি যখন সারা জীবনের সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করবে, তখন বাড়ির কে কতটুকু সাহায্য করবে, আয়োজনে কি তাদের প্রস্তুতি সেটা নিয়ে বেশি আলোচনা করলে অভিধি বিড়ম্বিত বোধ করতে পারে।

বাছাই করার কথা যখন বলা হয়েছে তখন এটা বুঝতে হবে সে আর যাই হ'ক অন্তত অজাতকুলশীল নয়। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—মানুষের বেলায় যেমন সাহিত্যের বেলাতেও তা হতে পারে—অনেকের কাছে সে অনেক ভাবে পরিচিত এবং সব পরিচয় যে কোন একজনের জানা নয়। এটা স্বীকার করাই ভালো তার কোন পরিচয়টা সত্যিকারের পরিচয় এ নিয়ে এখনও তর্কাতীত অবস্থায় পৌঁছানো যায় নি। কিন্তু এ কথাও সত্য তার একটি পরিচয় সত্য ব'লে লেখকের কাছে প্রতিভাত হয়েছে এবং সেটাই তার—কেন লিখির—উত্তর হতে পারে। এ বাছাই করার ব্যাপার থেকে আরও একটি বিষয় এই বলা যায় যে লিখবার একটা উদ্দেশ্য আছে।

এ রকম একটা উদ্দেশ্যের কথা শোনা যায় সেটা হচ্ছে সৌন্দর্য সৃষ্টি। বলা হয়ে থাকে বহির্বিশ্বে সৌন্দর্য আছে—শিশুর হাসিতে পাখির ডানায় চমকে ওঠা রোদে, কোন হিমযাহের শুভ্র গাম্ভীর্যে। মহতেও আছে, ক্ষুদ্রেও আছে। মানুষ তার অনুকরণ করে যেমন অজন্তা চারুশিল্পে তেমনি সাহিত্যেও। তাহ'লে সৌন্দর্য সৃষ্টির কারণ কি এই অনুকরণ প্রবৃত্তি? পশুজগতে পরিবেশকে অনুকরণ করার একটা রীতি আছে—সেটা অনুকরণের জন্যই অনুকরণ করা নয়। আমাদের এই অনুকরণের ঝোঁক যদি অনুকরণের জন্যই অনুকরণ না হ'তে থাকে তবে তার সার্থকতা কোথায়? ঈশ্বর বহির্বিশ্বের সৌন্দর্যের স্রষ্টা। মানুষ ঈশ্বরের অনুকৃতিতে সৃষ্ট, সুতরাং ঈশ্বর যেমন বিশ্বজগতে সৌন্দর্য নিয়ে মাখামাখি করেছেন, আমরাও সাধ্যমত তা ক'রে থাকি। ঈশ্বরের সৌন্দর্যসৃষ্টির হেতু যেমন অনির্দেশ্য আমাদের সৌন্দর্য-অনুকৃতির কারণও আমাদের কাছে তেমনি দুর্জ্ঞেয়। এ ব'লে কিছুক্ষণের জন্য প্রশ্নকে নিবারক ক'রে দেয়া যায় বটে। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস যার নেই সে তবে সৌন্দর্যসৃষ্টি করবে কেন? অনুকৃতির যুক্তিটাকে রেখে বলা যায় প্রকৃতির কথা। মানুষ প্রকৃতির সূত্রে একান্ত ভাই প্রকৃতিকে অনুকরণ করে। কিন্তু ঈশ্বর থেকে প্রকৃতিতে আসা দুর্জ্ঞেয় থেকে পরিজ্ঞাতে আসার সামিল। তুল সুন্দর কেন এর ঐশ্বরিক ব্যাখ্যা আর প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা এক নয়। তুল সুন্দর, প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক বলবে, এইজন্য যে পতঙ্গকে আকৃষ্ট করতে হবে। সন্ধ্যার মেঘ সুন্দর এই জন্য যে সূর্যের আলোটা বিচিত্রভাবে পড়েছে মেঘে। দেখা যাচ্ছে সৌন্দর্যের কারণ আছে প্রকৃতিতে, উদ্দেশ্যও আছে কোন কোন ক্ষেত্রে। এ থেকে এ রকম

একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানর দিকে ঝোঁক দেখা দিতে পারে—ঐশ্বরিক মুক্তিহীনতার কিংবা প্রাকৃতিক পরিত্রাণতত্ত্বের অনুকরণে শিল্পে সৌন্দর্যসৃষ্টিরও একটা উদ্দেশ্য আছে। অতুপা বলতে হয় মানুষ বহিরঙ্গটুকুই অনুকরণ করতে পেরেছে, অন্তরঙ্গ অনুকরণ করার শক্তি তার নেই।

তা সত্ত্বেও এ রকম শোনা গেছে সৌন্দর্যই সৌন্দর্যের শেষ কথা। সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যই সৌন্দর্যসৃষ্টি! এ মত মানতে হ'লে বলতে হবে বহির্বিশ্বে যে সৌন্দর্য রয়েছে তা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এবং যথেষ্ট নয় বলেই এ ধরণের সৌন্দর্যসৃষ্টির একটা সার্থকতা আছে। যথেষ্ট হ'তো যদি বহির্বিশ্ব, সে সার্থকতা থাকতো না। কিন্তু এ যুক্তিটাকে খুব সরল ব'লে বোধ হয় কেউই উপস্থাপিত করে না। কারণ এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মতো মাথা তুলে দাঁড়ায়—যে বহির্বিশ্বের ব্যাপ্তি ও গভীরতার অনুভবকে অ-যথেষ্ট বলার মতো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে বলা যায় সৌন্দর্যকে সৌন্দর্য হিসাবেই দেখতে গেলে সেটা বহির্বিশ্বে প্রতিভাত সৌন্দর্যেরই হেরফের। হয়তো ফটোগ্রাফ না হ'য়ে চিত্র। কিন্তু মনে রাখতে হবে চিত্রও এক রকমের অনুকৃতি। যদি পরিপূর্ণতাই যথেষ্ট বিবেচিত না হয় তার একটা অংশের অনুকৃতি কি ক'রে তা হবে?

এ যুক্তিটাকে অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা ক'রেই বরং সৌন্দর্যবাদীরা ব'লে থাকে—সৌন্দর্য এই জন্যই যে সৌন্দর্যই সত্য, এবং কেউ কেউ আর একটু এগিয়ে গিয়ে বলেছে—তাই কল্যাণ। (আর এ বলা থেকেই কি প্রমাণ হয় সৌন্দর্য তখনই দাঁড়াতে পারে যখন তা সত্য এবং কল্যাণ?)

এ যুক্তিটাকে বুঝতে হলে আগে সৌন্দর্য, সত্য এবং কল্যাণের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হয়। সেটা এক দার্শনিক দুরূহতা—যার শেষ নেই।

বলা বাহুল্য সৌন্দর্য, সত্য এবং কল্যাণ সম্বন্ধে এতক্ষণ যা বলা হ'লো তা সবগুলির সাধারণ জ্ঞান বোধের উপরে নির্ভর ক'রেই। বিশুদ্ধ সত্য বা কল্যাণ অথবা সৌন্দর্যের সংজ্ঞা দেয়া কঠিন হ'লেও দেয়া যায় এবং বিশুদ্ধ অবস্থায় সেগুলিকে যুক্তির মতো মনকেও আমরা কল্পনা করতে পারি। এবং হয়তো সেই বিশুদ্ধ অবস্থায় সত্য, সৌন্দর্য ও কল্যাণ একই হয়ে ওঠে। কিন্তু দুটি কারণে সাহিত্যে সেই বিশুদ্ধত্বের স্থান নেই। প্রথম কারণ এই যে সেই বিশুদ্ধত্বে পৌঁছালে সৌন্দর্য, কল্যাণ ও সত্যের বোধ পৃথক থাকে না।

যেখানে সত্য এবং অসত্যে, কল্যাণ ও অকল্যাণেও পার্থক্য নেই, সুন্দর ও অসুন্দরের প্রভেদ সেখানে লুপ্ত। দ্বিতীয়ত এই বিশুদ্ধ শিবে সংসারে এবং সাহিত্যে দু-পাও চলা যায় না। পক্ষান্তরে এ কথাও সত্য, সৌন্দর্য্য সত্য এবং কল্যাণের বোধ জন্মে জন্মে পৃথক। কিন্তু এ সত্যকেও আমরা সংসারে ও সাহিত্যে গ্রহণ করি না। তার কারণ আমার এবং আমার পাঠকের বোধে পার্থক্য আছে এই যদি ধ'রে নিই, আমার কথা বলা হ'বে দাঁড়ায় নিরর্থক। আমার কল্যাণবোধ যদি রাষ্ট্রের অন্ত সকলের কল্যাণ বোধ থেকে পৃথক হবে ধ'রে নেই তবে রাষ্ট্রের অন্ত আমি কিছুই করতে পারি না। রাষ্ট্রের বেলায় আমি যদি ধ'রে নিই আমি যাকে কল্যাণ তাহাই অন্যেও তাকেই নিজের কল্যাণ ব'লে গ্রহণ করবে তবেই কল্যাণ করার দিকে আমরা অগ্রসর হ'তে পারি। সাহিত্যেও তেমনি একজন বিশুদ্ধ পাঠক কল্পনা ক'রে নিয়ে কথা বলা হয়—যার বোধ সাহিত্যিকের বোধের সঙ্গে সমান। এবং তার বোধকেই সাধারণ গ্রাহ্য বোধ বলতে হয় কারণ সেই সব পাঠকের সাধারণ প্রতিভূ। এ দিক দিয়ে বিচার করা যেতে পারে। সুন্দর ও সত্য কি এক? সত্য তো অপ্রিয়ও হ'তে পারে এবং অপ্রিয় বিষয়কে কখনও সুন্দর বলা হয় না। সুতরাং সত্য মাত্রই সুন্দর নয়। প্রিয় মিথ্যাও আছে। 'সুন্দর' একটা সুপ্রকাশিত মিথ্যাও হ'তে পারে? সুরার প্রিয়তাকেই উদাহরণ হিসাবে নেয়া যেতে পারে। কারো কারো কাছে সুরা নিশ্চয়ই প্রিয়। সুরা সর্বনাশের প্রান্তি জন্মায়। এটা কি সুন্দর অসত্য ব'লে নেয়া যায় না? মৃগতৃষ্ণিকাকেও এখানে বিষয় হিসাবে নেয়া যেতে পারে। মৃগতৃষ্ণিকা সুন্দর—দৃশ্য হিসাবে নিশ্চয়ই এবং তা মৃগতৃষ্ণিকা হিসাবে সত্যও বটে। কিন্তু নীল বনরাজির সুজল আভাস হিসাবে তার চাইতে মিথ্যা আর কি আছে, মিথ্যা তার চাইতে ভয়ঙ্কর অকল্যাণই বা কি হ'তে পারে?

সব 'সুন্দর' সত্য নয়, এবং কল্যাণের কিনা তাও সন্দেহ আছে। 'সুন্দর' কল্যাণেরই বা কি ক'রে হবে? সোনা দেহে নির্ঝরের মর্মর-জাত সৌন্দর্য কোন রমণীর মুখাকৃতিতে ছাপ রেখেছে। বলা বাহুল্য এটা চিরায়ত সার্বজনীন সত্য হিসাবে উল্লেখ করা হচ্ছে না। কিন্তু সীমায়িত সত্য হিসাবেও এ কবি-চিন্তার কতটুকু তাৎপর্য? দুনিয়ার দুঃখে যে শান্তির স্নিগ্ধতা দেখতে পাচ্ছি সেটা কি সে সময়ে এলে পৌঁছালেও থাকবে? অন্য কথায় সৌন্দর্য যে কল্যাণ

করেছে তুলির সেটা কি একটা কাব্যগত প্রত্যয় মাত্র নয়? যেহেতু সে প্রকৃতির কোলে মানুষ হয়েছিলো তার সেই স্নিগ্ধ সৌন্দর্য উপলব্ধি কল্যাণ কি তাকে পথ দেখাতে পারবে? কপালকুণ্ডলাকে পেয়েছিলো? সৌন্দর্য কল্যাণে পৌঁছে যাচ্ছে এর অন্য একটি উদাহরণও দেখানো হ'য়ে থাকে। গ্রীক সুন্দরীরা বলেছে ট্রাজেডির যেসব মাধুর্য মানুষকে বেদনা সম্বন্ধে সচেতন ক'রে, মঙ্গল ও অমঙ্গলের দ্বন্দ্বের উদাহরণ তুলে ধ'রে মানুষকে কল্যাণ চিনতে সহায়তা করে। কিন্তু প্রকৃতই কি সেটা সৌন্দর্যের অবদান। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে কল্যাণ যা করে সেটা ট্রাজেডিতে বর্ণিত মানবিক অভিজ্ঞতা। এবং অভিজ্ঞতা হিসাবে তা যে খুব সুন্দর তাও নয়।

যা কিছু সুন্দর তাই সত্য এবং কল্যাণের এটা বলা যেমন বিপজ্জনক, কোন 'সুন্দর'ই সত্য এবং কল্যাণের নয় বলাও তেমনি ভ্রমাত্মক। এমন কোন কোন প্রান্তিক উদাহরণ আমরা কল্পনা করে নিতে পারি যেখানে একটি নিছক যতখানি সুন্দর ঠিক ততখানি সত্য এবং ততখানি কল্যাণ। তা হ'লে সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি এই প্রান্তিক উদাহরণ সৃষ্টি করা?

বরং এর বিপরীতটাই যেন সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়। সাহিত্যে সৌন্দর্য সত্য এবং কল্যাণ সর্বত্র সমানভাবে বিরাজ করছে এটা আমাদের অভিজ্ঞতা নয়। রামায়ণে সৌন্দর্য আছে, কল্যাণও বলতে পারি তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনা করে, কিন্তু সত্য? এ কথা আমরা বহুবার শুনেছি অযোধ্যার রামের চাইতে বাল্মিকীর রাম অধিকতর সত্য। অযোধ্যার রাম ও বাল্মীকির রাম পৃথক সত্য হ'তে পারে, কিন্তু একে অন্যের চাইতে অধিকতর সত্য হ'বে কেন? সুন্দরতর বলে? তাই যদি হয় তবে সেটা ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হওয়ার সামিল হবে—যেহেতু সুন্দর সেজন্যই সত্য এই হবে একমাত্র ন্যায়। রামায়ণে সত্যকে বরং যেন দ্বিধাগ্রস্ত দেখতে পাই। কখনও 'সুন্দর'কে ম্লান ক'রে দেবার জন্য কখনও বা কল্যাণের শাদামিতে সত্য আত্মগোপন ক'রেই থেকেছে। বলা বাহুল্য রাবণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়াতে আমাদের সত্যবোধ পীড়িত হয় না। রাবণের কেন পরাজয়? সে পাপী বলে? পাপী কি পৃথিবীতে পরাজিত হবেই এমন কোন কার্য-কারণ তত্ত্ব আছে? পাপ কি? তথাপি রাবণের পক্ষেও মৃত্যুটাই কল্যাণ—এই তত্ত্বই যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এটা শুধু প্রাচীনকালেই হয়েছে তা নয়। আধুনিকতর দিনে

সেকস্‌পীয়রীয় চিন্তায় 'সুন্দর' সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য ধরে এমন ক্ষেত্রেও কল্যাণ অবলুপ্তির প্রশ্ন সু-কুএর নাম নিয়ে সত্যকে বিড়ম্বিত করেছে। লিয়র তার নির্বুদ্ধিতার জন্য যখন বিব্রত বিড়ম্বিত, প্রস্পেরো তার অসদ্‌গুণ প্রবৃত্তির হাতে যখন নিহত, তখন সীমাবিত মানবিক চেতনার জন্য আমরাও হাহাকার ক'রে উঠি। কিন্তু সেই অলোকসামান্য সৌন্দর্য এবং আংশিক কল্যাণবোধের মধ্যে এই প্রশ্নও জেগে ওঠে এই অব্যবস্থিতচিত্ত চরাচরে 'কু' কি পরাজিত হবে। অন্যায় কি বিজয়ী হবে না অন্তত তাতবারই যতবার ন্যায় জয়লাভ করে?

বস্তুত সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ রকম ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে সুন্দর, কল্যাণ ও সত্যকে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত করার স্পৃহা কালের সঙ্গে সঙ্গে কমে আসছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও গর্কি কল্যাণকে রক্ষা করতে গিয়ে সত্য ও সুন্দর থেকে সরে এসেছেন, জোলা সত্য ও কল্যাণকে খাটো ক'রে দিতে গিয়ে সুন্দর থেকে বিচ্যুত, ফ্রয়েডীয় সত্য ও সুন্দরকে বিকৃত ক'রে কল্যাণকে বিকৃত।

[এখানে ব'লে রাখা ভালো সাহিত্যে 'সুন্দর' বলতে তার ভাষার প্রাঞ্জলতা প্রকৃতি গুণাবলী সুষম প্রয়োগকৌশল, কিংবা যথোপযুক্ত অলঙ্কারের সদ্ব্যবহার বোঝাচ্ছি না। এগুলি সাহিত্যের এমন কতগুলি বহিরঙ্গ যা যে কোন শিল্পীকে আয়ত্তে আনতেই হবে সাহিত্যের আসরে প্রবেশাধিকার পেতে হ'লে, তার সাহিত্যকে আলোচ্য হবার গৌরব পেতে হ'লে।]

এটা আমার বলবার উদ্দেশ্য নয় যে সাহিত্যে সুন্দর কল্যাণ সত্যের সমন্বয় অবস্থিতি সাহিত্যের মূল্যহরণ করেছে। বরং বিপরীত। সাহিত্য এই স্বীকৃতি পাওয়ার পক্ষে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের সমন্বয় অবস্থিতি অপরিহার্য নয়। আর এই বিষম অবস্থার দিয়ে আসাটা ব্যুৎপত্তিগত বা অন্য কোন অক্ষমতার ফলও নয়। বরং যেন পছন্দ করার ব্যাপার, পথ বেছে নেবার ব্যাপার। সাহিত্যিকের শিল্প যদি পাখীর গান হ'তো, বলা যেতো তাদের বৈচিত্র্য প্রকৃতিদত্ত, ওর উপর তার হাত নেই। পাখির গান পাখির সৃষ্টি নয়। সে রহন করেছে একটি ইতিপূর্বে নির্ধারিত সংকেত। সাহিত্যিকের এমন সুবিধা নেই। তাকে কিছু বলতে হবে এবং তা বলতে গিয়ে সে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের স্থির অবস্থানে আলোড়ন জাগিয়ে তোলে, বিচ্যুতি ঘটিয়ে বসে। আর এ সবই সে করে দায়িত্ব নিয়ে সজ্ঞান মানসে। সেকস্‌পীয়র দিকে

মুখে ভালোভাবে আসতেন যেদিন যদি সত্য হয়, পাপ যদি তার মৃত্যুবীজ নিজেই বহন করে, পৃথিবীতে পুণ্যের অবও বিশেষভাবেই বিদায়গ্রস্ত। কয়জেলিয়ার মৃত্যু হয়। আর কয়জেলিয়ার মৃত্যু হয় ব'লেই এই পৃথিবী ট্র্যাজিক। সিজরের নিজের মৃত্যুর ব্যাপারটা সাহিত্যে বীকৃতি পাবার মতো উল্লেখযোগ্য নয়। আর ব্যাস আমতেন এই পৃথিবীতে পুণ্য বলো কিম্বা 'সু' বলো, তার বিজয়লাভের পথ আপাততঃ আয়হনন ব'লেই মনে হবে, কিন্তু পৃথিবী ট্র্যাজিক কিছু বললেই শেষ কথা বলা হয় না। ট্র্যাজিক প্রাকনির্ধারিতকে চেতনা দিয়ে লঙ্ঘন করার পরীক্ষায় নামার মতো উদার ব্যাপ্তিও আছে পৃথিবীতে। লক্ষ্যবীর ব্যাস এবং লেকৃস্পীয়রের চেতনায় সু এবং কু এর দ্বন্দ্বে 'সু'এর দিকে তাদের পক্ষপাতিত্ব থেকে গেছে, যদিও তাঁরা জানতেন সু এবং কু-এর পরাজয়ের সমান সম্ভাবনা আছে। লেকৃস্পীয়রের কল্যাণবোধ 'সু'কে বিজয়ী করতে গিয়ে বেদনাদায়ক সত্যের সম্মুখে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। কিন্তু সুন্দরের খাতিরে সত্যকে উদ্ঘাটন করে নি। পক্ষান্তরে ব্যাস যেন জানতেন একটা ট্র্যাজিক ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে দাওয়ার চাইতে জীবন গভীর। আর অনন্তকালের ব্যাপ্তির তুলনায় মানবীয় ক্লাইম্যাক্সের সংঘটন সময়টুকু এত অকিঞ্চিৎকর যাকে সুন্দরের খাতিরেও মূল্য দেয়া যায় না।

বস্তুত সত্য, কল্যাণ, সুন্দর প্রভৃতি যেন সাহিত্যিকের হাতে ধরা তুলির রং কতটুকু কার প্রয়োগ হ'লে সাহিত্য ওঁর মনের মতো হ'য়ে ওঠে, অর্থাৎ ওঁর সাহিত্য-ভাবনা বিমূর্ত হ'য়ে ওঠে এ তিনিই জানেন। আমরা শুধু সম্পূর্ণটাকে দেখে মোহিত হ'তে পারি, আশ্চর্য,—এই কথাটা ব'লে উঠতে পারি। আর তার বেশি সচেতন হওয়ার মতো যদি সামর্থ্য থাকে সাহিত্যিকের সাহিত্য-ভাবনা আমার নিজস্ব হ'তে পারে। এর এটাই হয়ত শেষ কথা, সাহিত্যের সার্থকতা।

কিছু একটা সাহিত্যিক বলতে চান। এই পৃথিবীতে বাস ক'রে এর অন্নতে এবং সমস্যায় তিনি কিছু দেখে থাকবেন অন্য অনেকে যা দেখে নি। সে কথাটাই তিনি প্রকাশ করতে চান! এবং যেহেতু সমগ্র চরাচরকে তূর্জপত্র কিম্বা কাগজের পিঠে স্থাপন করা সম্ভব নয়, কলা-কৌশল ক'রে তারই ভ্রমোৎপাদন করতে হয়। এই ভ্রমোৎপাদনই তার আর্ট। তার হাতের রং হচ্ছে সত্য কল্যাণ ও সুন্দরের সাধারণ গ্রাহ্যবোধ।

চিত্রণের উপযোগটা রেখে আরও বলা যায় রঙের প্রয়োগের তাৎপর্য শুধু পরিমাণগত নয়, আপাতত এবং গুণগতও বটে। তিন রং তেত্রিশ রং হ'য়ে দাঁড়ায়নি শিল্পীর হাতে। লোহিত যেমন একশ' রকমের লাল হ'তে পারে, কল্যাণ বা সুন্দরও তাই হ'তে পারে। একেই অন্য কথায় কল্যাণ ও সুন্দর কিংবা সত্যের বিভিন্ন নাম আখ্যা বলা হয়ে থাকে। পিকাসোর রচিতে কতখানি কোন আপাতরূপের কোন রং আছে, রেখার কোথায় কোন বক্রতার সুষমা,—এ কৌতূহল নিবৃত্ত হওয়ার পর কারো কারো চেতনায় ধরা দেয় চিত্রটিতে বিধৃত পিকাসোর নিজস্ব চেতনা। পিকাসোর সব প্রয়াস তখন সার্থক হয় এবং চিত্রে বিধৃত পিকাসোর এই চেতনাই চিত্রটির স্বরূপ। এই স্বরূপকে এক চেতনা থেকে অন্য চেতনায় সামান্তরিত করা যেমন পিকাসোকে পিকাসো করে তেমনি সাহিত্যিককে নামের যোগ্য ক'রে তোলে। সৌন্দর্যসৃষ্টি করা কিংবা সৌন্দর্যকে সত্য ও কল্যাণ ব'লে প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য নয় সাহিত্যিকের। নিয়তির পরিণতি কিংবা অন্য কারো পরিণতিই লেক্‌স্‌পীয়র নয়, পৃথিবীর ট্র্যাজিক ধারণাটাই লেক্‌স্‌পীয়র-চেতনা এবং সেটাই সাহিত্য।

কিন্তু এই বাদ। স্বরূপকে সামান্তরিত করার এই প্রয়াস কেন? এই প্রশ্নের মুখোমুখি হ'লেই আবার নিজের অন্তরে ফিরে যেতে হয়। এই প্রয়াসের মূলে যে তাগিদ সেটাকে মূলের ব'লে বোধ হ'তে থাকে। কেন হয় তার উত্তর নেই যেন। আর উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না ব'লেই ইতিপূর্বে অনেকে বলেছেন অন্তপ্রকৃতির কথা। কিন্তু যা চরাচরে আছে তারই অনুকরণ? যেন—সর্বব্যাপী একটি চেতনা যে তাগিদে চরাচর সৃষ্টি করেছে সাহিত্যিকও সেই একই তাগিদে সৃষ্টি ক'রে চলেছে। সেই সর্বব্যাপী চেতনার অংশ সাহিত্যিকের চেতনাও। সেজন্যই সাহিত্যিকের চেতনা এবং ধারণা-বিধৃত ঈশ্বরের চেতনার তাগিদও এক—সে তাগিদ নিজেকে আবিষ্কার করা। সর্বব্যাপী চেতনাই বা কেন করে এই প্রয়াস? আপাতত অনেক ইহুদি দার্শনিকের মতো বলতে ইচ্ছা হয়: ত্রিভুজের তিন কোণ মিলে দুই সমকোণ হবেই। এটা অন্য কোন উপযুক্ত ভাষার অভাবে বলা যায় প্রকৃতিগত। তেমনি চেতনার এই আত্মানুসন্ধানও, সেই অর্থে তাও খানি প্রকৃতিগত। এই আত্মানুসন্ধানের জন্য কখনও সত্য সুন্দর ও

কল্যাণের প্রচলিত প্রস্তাবকে লঙ্ঘন ক'রে ক'রে সাহিত্যিক অগ্রসর হতে থাকে। পথে হয়তো পৃথিবীর ট্র্যাজিক ধারণাটা আবিষ্কার করা হয়। কিন্তু সেটাও শেষ কথা নয়।

কিন্তু ঈশ্বর একবার ভুল করেছিলেন। তিনি একটা প্রকল্প খাড়া ক'রে সেটিকে পরে বেদ প্রমাণ করতেও চেয়েছিলেন। মানুষকে তিনি ইডেন উদ্যানের চতুঃসীমায় আটকে রাখবেন ভেবেছিলেন। এটা যেন তাঁর আত্ম-আবিষ্কারের পথে ভ্রান্তির চিহ্ন। ফল ভালো হয়নি। আদমের অসীম বেদনার মূল্যে সেই প্রকল্পকে বাতিল করতে হয়েছিলো। সাহিত্যিকরা যে অনুরূপ ভুল করে না তা নয়। মানুষকে কখনও কখনও প্রকল্পের ছকে ফেলে দিয়ে প্রাক্‌নির্ধারিত করার প্রয়াস করে সে। কিন্তু সাহিত্যিকের বারবার এই ভুল ক'রে গেলে বোধ হয় চলবে না। তার আত্ম-আবিষ্কারের এখনও শেষ নেই। কোন প্রকল্প বলার সময় এসেছে—এ বলা শুধু ভুলই নয়। মনে রাখা বোধ হয় দরকার আমাদের সমস্ত প্রকল্প, এমনকি সত্য সুন্দর কল্যাণ সম্বন্ধেও, দাঁড়ায় বুদ্ধির উপরে। আর বুদ্ধি চেতনার একটা খণ্ডাংশ মাত্র। নিজেকে আবিষ্কার করার ব্যাপারে বুদ্ধি খানিকটা বোধহীন। আর বুদ্ধি যে দায়-দায়ের দায়ভার বহতে পারে না দর্শন অনেকবার এ স্বীকারোক্তি করেছে। সেজন্যই আত্ম-আবিষ্কার আপাতদৃষ্টিতে দর্শনের "ধার" বলে ভ্রান্তি জন্মালেও মানুষ সাহিত্যের দিকে না ঝুঁকে পারে না। সেজন্যই সেবা।

অশিষ্টতা, আচরণবোধ ও আধুনিক সভ্যতা

রোমাঁ গ্যারী

[রোমাঁ গ্যারী একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ফরাসী ঔপন্যাসিক। কয়েক বছর আগে তাঁর 'দি রুটস্ অব্ হেভন্' উপন্যাসের জন্য বঁকুর পুরস্কার লাভ করেন। নীচের প্রবন্ধটিতে যথার্থ মানবিকতাবাদী ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত লেখক গ্যারী শিষ্টাচারিতার প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়ার যে হৃদয়স্পর্শী আবেদন করেছেন তা সমর্থোচিত সন্দেহ নেই। প্রবন্ধটি তাঁর সাহিত্য প্রতিভার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও বটে। মূল ফরাসী থেকে প্রবন্ধটির ইংরাজী অনুবাদ বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র 'দি ন্যাশনাল হিউম্যানিটি'-এ প্রকাশিত হয়েছে।]

আমাদের এই অনিশ্চিতি এবং সন্দেহবাদের যুগে পরম বিশ্বাসের দৃঢ়তার কোনও মত প্রকাশের প্রচেষ্টা বিরল। আমি কিন্তু আমার নিম্নবর্ণিত বিশ্বাসটি নির্দ্বিধায় পেশ করছি: কিছুকাল আগে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সভাকক্ষে দাঁড়িয়ে হুশ্চেভ সাহেব যখন জুতো তুলে দেখালেন, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে যুগ-চরিত্রানুগ মনোভাবই প্রকাশ করেছেন। হুশ্চেভ সাহেব সেদিন যাথার উপরে ধ্বজার মত যে জুতোর পাটি ধরে তুলেছিলেন—পরে শুনেছি ওটা নয়ন মোকাসিনের ব্রাউন রঙের জুতো ছিলো—সেইটাই, আমার দৃঢ় ধারণা, এ' যুগের পক্ষে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের চাইতে যোগ্যতর দৃষ্টি-কলক। এবং আমি এও বিশ্বাস করি যে ব্রাউন মোকাসিনের মালিকের ইহলোক ত্যাগ করার অনেক পরেও লক্ষ লক্ষ লোক ফ্রেবলিনের দরজায় ভীড় করে এ' যুগের ধ্বজা ঐ জুতো দেখতে আসবে। আমার এই বিশ্বাসের কারণ: সেই বিশেষ উপলক্ষ্যে হুশ্চেভ সাহেব দুনিয়াকে যে বাণী শুনিয়েছেন তার সত্যতা সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। তিনি এ' যুগের নির্ভেজাল অশিষ্টতাই প্রকাশ করেছেন।

আশা করি এমন ধারণা কারোর হবে না যে, সোভিয়েট রাজনীতিজ্ঞ কেবলমাত্র প্রাচ্যের সাম্যবাদী সমাজের তরফেই কথা বলেছেন। অশিষ্টতার কি কোনও রাজনীতিক সীমানা আছে? অশিষ্টাচার কোনও ভৌগোলিক

সীমানা মানে না, মানে না কোনও জাতিগত গণ্ডী কিংবা শ্রেণীগত বিভেদ। আমাদের যুগে সৌভ্রাতৃত্ববোধের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা বোধ হয় অশিষ্টতাই। মূৎসুদ্দি ও দোষক্রিয়ার মত এটাও মানবজাতির ব্যবহারের এক সামান্য লক্ষণ; এবং পৃথিবীর তাবৎ অধিবাসীর মধ্যে যথার্থ যোগসূত্র। ওস্লো কিংবা মিউইয়র্কের রাস্তায় মাতালদের দেখে আসুন; কিংবা যা'দ সভ্যতার তব্য কস্তানী বা ইতালীয়কে দেখতে কেমন ক'রে গাড়ীর আড়ালে আপনার প্রতি ঘৃণায় থুথু ফেলে তারা; অথবা আসুন যে কোনও আয়গার বিরোধী পক্ষের যে কোনও রাজনৈতিক সভায়—দেখবেন কত সত্যি আমার কথা। দেখবেন জাতি, ধর্ম, গাত্রবর্ণ নিরপেক্ষ সব দেশের সব লোক ব্যবহারের দিক থেকে কেমন এক হ'য়ে গেছে: কী আশ্চর্য ভাবে আচরণে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা অর্জন করে প্রমাণ করেছে মানবজাতি বৃথাই ঐ সব স্বপ্ন দেখেনি!

সার্বজনীন অশিষ্টতাই এ' যুগের বিশিষ্টতা।

আজকের সোভিয়েট রাশিয়ার ঘৃণা প্রকাশ করতে 'bezkulturno'র চাইতে জোরালো শব্দ কম্যুনিষ্ট শব্দ-ভাণ্ডারে আর নেই—(শব্দটির অর্থ, গাড়োল, অশিক্ষিত, বর্বর)। কিন্তু একজনের আরেকজনের প্রতি ঘৃণা কিংবা নির্লজ্জ বিবেচনাহীনতা যে অনুপাতে মস্কোয়, তেমনি প্যারিসে অথবা টোকিওর রাস্তায় সুলভ। লণ্ডনের এক 'টেডি-বয়' যখন রাস্তায় কোনও বৃদ্ধাকে ঠেকায়, তখন সে, আর কিছু নয়, কেবল নিজেকে সমাজে চলতি আচরণবিধির সংগে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে মাত্র।

ক্ষমা করে আমায় ভুল বুঝবেন না। মনে করবেন না নিজেকে আপনাদের চেয়ে আলাদা বলে আহির করছি। সমাজে নিজের ঠাঁইটুকু বজায় রাখার জন্য বহু আগেই আমিও খেলার শিবম তালোভাবেই রপ্ত করেছি। বেশ ভালো করেই শিখেছি বৃষ্টির দিনে কোনও বিদেশী পথিকের প্রথমে ডাকা ট্যাক্সি কেমন করে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যায়। শিখেছি কেমন করে গাড়ী রাখার জায়গায় অগ্রবর্তীকে অগ্রাহ্য করে নিজের গাড়ীটা ঢুকু করে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। কোনও পথচারীর অনবধানতায় পথ-নির্দেশক সবুজ বাতি আড়াল পড়লে আমিও ঠিক আপনাদের মতই হয়ত গাল দিই। আর, যদি নিজের

আসবে বসে যেতে যেতে যখন কোনও পঞ্চাশোর্ধ্ব মহিলাকে দণ্ডায়মানা দেখি, তখন তিনি যৌবনবতী নয় বলেই 'সীট' ছেড়ে দিতে পারছি না ভেবে মনে মনে আমিও ঠিক আপনাদের মতই আক্ষেপ করি, এবং চোখাচোখি হ'লে তবেই, একটু মধুর হেসে, আসনটা ছেড়ে দিই, যদিও আর কারোর মত 'আপনি বসুন, ভাববেন না যেন কেবল সুন্দরী তরুণীদেরই আমি আসনটা ছেড়ে দিই'—এ-জাতীয় মন্তব্য করি না। হায়, আজ সাতচল্লিশ বছর বয়সে শৈশবের এক শিক্ষা আমি ভুলতে বসেছি: সজাগ চেষ্টায় নিজেকে নিরন্তর স্মরণ করাই যেন শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনার্থে কোনও মহিলার হস্ত চুম্বন না করে বসি!

এই ব্যাপারে, স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমি নিজেকে এখনও ঠিক মানিয়ে নিতে পারিনি। আমেরিকার আমি বহুকাল সুখে অতিবাহিত করেছি। আমার ধারণা, প্রতিদিনের পারস্পরিক আলাপে আচরণে মার্কিনীরাই সবচেয়ে সৌজন্যপরায়ণ ও শালীন: এবং, এদেশের গাড়ী-প্রহরীরাই সবচেয়ে বিনয়ী। বাইরে যখনই মার্কিনী রাজনীতির বা অন্যান্য ক্রটির সমালোচনা শুনেছি তখনই আমি আমেরিকার পক্ষ নিয়েছি। এবং সেই সব ক্রুদ্ধ সমালোচকেরা, দেখেছি, ওদেশের সু-ভাষী গাড়ী-প্রহরীদের সৌজন্যপরায়ণতার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেই আর কথা বলতে পারেন না। কিন্তু গাড়ী-প্রহরীরা যতই চমৎকার হোন, অস্বীকার করবো না যে আমার আমেরিকা-বাস আরও আনন্দের হ'য়ে উঠতো, যদি ওদেশের মহিলারা আমায় তাঁদের হস্ত-চুম্বনে অনুমতি দিতেন। আশঙ্কিত হবেন না, আমার যৌন-বিকৃতি ঘটেনি। উক্ত আক্ষেপোক্তি আমার শৈশবকালের শিক্ষার ফল, আর কিছু নয়। শৈশবে আমি শিখেছিলাম মহিলার প্রতি শ্রদ্ধা ব্যবহারের সেরা নিদর্শন তাঁর হস্ত চুম্বন করা, যে রীতিটি আজ সর্বাংশেকরণে বিলুপ্তিত।

মার্কিন-বাসের প্রথম দিকে আমি এজন্য চেষ্টা করেছিলাম, কারণ রীতিটি, অন্ততঃ আমার কাছে, একটি পবিত্র প্রথাবিশেষ। চল্লিশ বৎসরেরও পূর্বে আমার মা আমাকে শিখিয়েছিলেন যে, বিবাহিতা মহিলার হস্ত-চুম্বন করলে পৃথিবীর সব মায়েদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। রীতিটি মায়েদের প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রতীক। কিন্তু আমেরিকায় আমি যখনই কোন

মহিলার হস্ত চুম্বনের পরিবর্তে আমাকে হাত মুচড়ানোর কাহাকাছি এক প্রচেষ্টায় অভিনয় করতে হ'য়েছে; এবং আমার এবম্বিধ প্রচেষ্টার জন্য প্রতিবারই অপ্রস্তুত হতে হয়েছে: হয় মহিলাটি ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে স্বামীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন, নয়তো, লজ্জায় রাঙা হয়ে, মৃদু আওয়াজ হাসি হেসে বহুক্ষেত্রেই মন্তব্য করেছেন, 'অ, বেশ বেশ ধন্যবাদ' এবং তখন বিব্রত আমি মুক্তবাক্ বনেছি। এরূপ হতাশা সত্ত্বেও আমি কিন্তু আজও বিশ্বাস করি যে, নারী এবং নরের স্ত্রী-পুরুষ হিসাবে যে অপরিহার্য্য সুন্দর পার্থক্য রয়েছে তা' সূচিত করতে অন্যবিধ ছোটখাটো অন্য আচরণের মধ্যে মহিলার হস্ত-চুম্বনবিধি একটি অমূল্য প্রথা। এই সমানাধিকারের শ্লোগানের যুগে উক্ত রীতিটি নরনারীকে পরস্পরের কাছে নিয়ে আসে এবং উভয়কে পরীয়ান করে তোলে।

স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার সম্পর্কিত অধুনা-প্রচলিত ধারণাসমূহের অনেকগুলোই ভুল ও অযৌক্তিক। এইসব লোক-আমৃত ধারণার অবাস্তবতাই সমকামিতা, রতিমাল্য ইত্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ—অন্ততঃ মনোবিদেরা এর চাইতে সন্তোষজনক কোনও গ্রাহ্য কারণ এখনও খুঁজে পাননি। একাডেমী অব্ সাইকোসোমাটিক মেডিসিনের এক সাম্প্রতিক সভায় ফিলাডেল্ফিয়া শহরের মানস-স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ডাঃ মরিস লিভেন রতিমাল্যের কারণ হিসেবে নর-নারীর সমানাধিকারপর তথাকথিত ধারণাসমূহের উল্লেখ করেছেন। নারী-প্রগতির আধুনিকতম আদর্শের তাড়াঘ আজ ঘরে-বাইরে স্ত্রীলোকের কর্মধারা একেবারে বদলে গিয়েছে। মায়েদের তরফে এইসব পুরুষালী কাজই সন্তানদের মধ্যে সমকামিতার বীজ বপন করে। সম্ভবতঃ ইদানীংকালে রোগ হিসাবে সমকাম ও রতিমাল্যের বহুল প্রাদুর্ভাবের বিশিষ্টতম কারণ এইটাই। ডাক্তার লিভেনের মতে, সমস্যার সমাধান হ'চ্ছে রোগিনীকে স্ত্রীলোকরূপে প্রতিষ্ঠিত করায়।

আমি অবশ্যই এমন কথা বলতে চাইছি না যে, মহিলার হস্ত-চুম্বন প্রথার পুনঃপ্রবর্তনেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'বে। তবে পুরুষ এবং মেয়ে উভয়েরই আচরণের পরিবর্তন আবশ্যক; উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বদ্ধমূল ধারণাগুলোর পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। মেয়েদের প্রতি অভদ্রতর ও আরো অশ্লেষ—একটা আদর্শ মনোভাব হয়তো এ' সমস্যার

আংশিক উত্তর। ছেলেমেয়েদের ইদানীংকালে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা' সম্পূর্ণ অ-রোমান্টিক। তারা দেখে বেহদ্দ গঠন বাদে মেয়েরা সর্ব বিষয়ে ছেলেদের সমান। সোজা কথায়, ছেলেরা ছেলে আর মেয়েরা মেয়েছেলে। এ জাতীয় শিক্ষা নরনারীর মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত দ্বন্দ্ব, মানসিক ও যৌন-সম্পর্ক গড়ে ওঠার পক্ষে মারাত্মক।

পুরুষ স্ত্রীলোক অপেক্ষা গরীয়ান, এ কথা স্বীকার্য; কিন্তু বিপরীত সিদ্ধান্তও সমান সত্য। এবং এই কারণেই পুরুষ ও নারী পরস্পরের ক্ষেত্রে কম বৈশিষ্ট্যের উত্তরের সমান। বস্তুতঃ মানবিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী মানুষকে কখনও ছোট করে দেখে না। ইতিহাস সাক্ষী, মানুষ সম্পর্কে মানবিকতাবাদী প্রত্যয় শ্রেষ্ঠতারোদ্ভাত। মানুষের প্রতি সুগভীর মর্যাদা-বোধ-প্রসূত যে আদর্শ, রোমান্টিসিজম্ সেই আদর্শ বোধের এক প্রকার-ভেদমাত্র। এবং সৌন্দর্য—বিষয় ব্যবহৃত শব্দটি ইদানীংকালে ব্যবহার করতে ভরসা পাই না—সৌন্দর্য রোমান্টিসিজমের ব্যবহারিক বাক্ রূপ।

বাচ্যের পক্ষে কিছু অতি কথা ও প্রতীক যেমন অপরিহার্য, তেমনি অত্যাবশ্যক সৌন্দর্যোপলব্ধিশক্তি, যার অভাবে মানুষ হিসাবে জীবন-যাপন অসম্ভব। সেইসব অপরিহার্য অতিকথা এবং প্রতীকসমূহ বিষয়ই হ'লে বুঝতে হ'বে কোনও মনোচিকিৎসকের কাছে বা উন্মাদাগারে যেতে প্রস্তুত হয়েছি আমরা; অথবা বুঝতে হ'বে, ক্ষুৎ-পিপাসা জাতীয় কিছু আন্তর প্রয়োজনগুলি মেটাবার এমন কোনও চৌচালিটারিয়ান রাষ্ট্রের নাগরিক হতে আমাদের মেই আর কোন অনীহা। মানুষ সম্পর্কে, বিশেষ করে নরনারীর সম্বন্ধ সম্পর্কে মুটো-ফ্রয়েডীয়, অন্তর্বাদী এবং স্থূল বাস্তববাদী এক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্কীর্ণতার ফলে কিছু প্রতীক, অতিকথা ও রোমান্টিক-প্রতিফলন প্রতিরুদ্ধ হ'য়ে এক ব্যাপক ব্যাধির সৃষ্টি হ'য়েছে আজকের দুনিয়ায়। যান্ত্রিকতা ব্যাধি দূষিত যৌবন-বোধের বিকৃত রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। চরমভাবে পর্যুদস্ত রোমান্টিসিজমই এর কারণ।

এ যুগের অভব্যতা নিয়ে যাঁরা চিন্তা করছেন তাঁদের "স্বাভাবিক" ব্যবহার সম্পর্কিত প্রশ্নটা এই কারণে বোধহয় আরেকবার ভেবে দেখা উচিত। সকল সময়ে "স্বাভাবিক" ব্যবহার করে এমন লোককে নরমাল করা আমার পক্ষে দুষ্কর। এঁদের "আন্তরিকতায়" এবং "স্বভাব-সংগতি"-তে

আমি পীড়িত এবং ক্লান্ত: স্বভাবে অকৃত্রিম হওয়ার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে যাঁচা হয়তো সহজ হ'য়ে যায়, কিন্তু ফলতঃ দুঃসহ হ'য়ে ওঠে অপরের জীবন।

অকৃত্রিমতা সভ্যতার উদ্দেশ্য নয়। কেউ স্বভাব-সিদ্ধ ব্যবহার করছে কি না তা নিয়ে আমার কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই। আপনার বা আপনার সঙ্গিনীর যৌন-জীবনের বিখুঁত ও বিশদ্ বিবরণ শুনতেও আমার বিন্দুমাত্র স্পৃহা নেই। শুধু আমি চাই না আমার মেয়েকে—পরম সৌভাগ্য আমার একটিও নেই—আপনি বোঝান যে, অবাধ যৌন-জীবন যাপন না করে সে প্রমাণ করেছে সে অস্বাভাবিক। প্রেম বা অন্য কোনও ব্যাপারে কোনও রোমান্টিক অদীক্ষতাকে আপনি ঘৃণাহেন না এ কথা প্রমাণ করার জন্য, যে মুগ্ধ যুবক, আমি চাই না যৌন-জীবন সম্পর্কে আপনি নাস্তানীয় চংএ সাক্ষ্যাত বলতে সুরু করে দিন।

বাস্তবিক ব্যবহার, এমন কি অকৃত্রিমতা ও প্রায়শঃই দেখা গেছে একটি মাত্র সত্তা ধরণ। এই ধরণ সেইসব সমাজেরই বিশেষ চেহারা যে সমাজ অপজাত, যেখানে সৌজন্যবোধ পরিত্যক্ত, নির্বাধ হওয়াই যে সমাজের মূলমন্ত্র। উক্ত ধরণে প্রতিবাদী যারা তাঁদের পক্ষে এমন সমাজ অতি দ্রুত এক বিভ্রমমায় সামিল হ'য়ে ওঠে। আমি আপনাদের আন্তরিকতায়, অকৃত্রিমতায়, চারিত্রিক সংগতিতে উৎসাহী নই। আমার একান্ত বাসনা আপনারা বিনয়ী হোন, আমার পোষিত বিশ্বাসগুলোকে সম্মান দেখান, সযত্ন-লালিত আমার সংস্কৃত বিকৃতির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হো'ন; আর যদি কখনও 'মন খুলে ধরার' তাগিদ সামলাতে না পারেন তবে দয়া করে আমায় রেহাই দিন।

কয়েক বছর আগে এক ব্যক্তিকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। মনে আছে আমার সেই অমনযোগিতার কী আক্কেল-সেলামী দিতে হ'য়েছিল: খাওয়া-দাওয়ার পরে সেই ভদ্রলোক অকস্মাৎ আন্তরিক হবার আবেগে আক্রান্ত হ'লেন এবং কাল-বিলম্ব না করে অতিথিবৃন্দকে বলতে সুরু করে দিলেন তাঁদের সম্বন্ধে তাঁর ঠিক ধারণাটা কি। তাঁর মতে সমাগত ভদ্রজনেরা সব এক একটি বাক্-সর্বস্ব ফোতো উন্নাসিক, ধাপ্পাবাজ বুদ্ধিজীবী। তাঁদের মধ্যে শিল্পী যাঁরা, তাঁরা সব আর্টের ব্যাপারী; আর লেখকরা?—তারা তো সব সুবিধাবাদী। আর যাঁরা কিনা চিত্রকর,

কপাল ঠুকে একটা ছাঁদ একবার আবিষ্কার করার পর রবি ঠাকুর যাকে যা করছেন তা বেহায়াবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। হা দুর্ভাগ্য, বক্তব্যকারীর একবারও খেয়াল হ'লো না যে আন্তরিকতা সম্বন্ধে তাঁর মতো মতিগতি-ওয়ালা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক স্নাতকের চাইতে আমার বৈঠকখানার শিরীষের জানা কোনও যাদবপিসীর উপস্থিতিও আমার অধিকতর কাম্য। সম্ভবতঃ সেই স্নাতক 'ভদ্রলোকের দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে তিনি "সত্য" ভাষণ করেছেন এবং যেহেতু নিজে একজন "সৎব্যক্তি", বোধ হয় তাঁর অন্তরতন্ত্রির অনুকূলতি হচ্ছিল এবং নিজেকে ভাবছিলেন পরম সাহসী, সুতরাং প্রশংসার্হ। কিন্তু আমার তাঁকে মনে হয়েছিল বর্বর, ব্যক্তির মানস-নিষ্কৃতিতে যার পাশব প্রবৃত্তি লুকিয়ে আছে।

সর্ব-গুণান্বিত দেবতা আমরা কেউ নই। মানুষ হলেই আমাদের কিছু অসুবিধা আছে: রয়েছে প্রতিভার অসামান্য আর অপূর্বতার আর্তি, রয়েছে বিকৃত-যাচনা এবং চরিত্রের অন্তহীন ত্রুটী-বিচ্যুতি। সেইসব অপরিণত ন্যূনতার কথা স্মরণে না রেখে যাঁরা কেবল অভ্রিষ সত্য-ভাষণে দীক্ষা নিয়েছেন সেইসব ব্যক্তিরা আদতে পৌণ্ডা এবং স্বভাবে চরম অসহিষ্ণু ছাড়া আর কিছু নন। ও' জাতীয় সত্য ভাষণে কিঞ্চিৎ সংযত হ'লে বিশ্বের কি ক্ষতি জানি না। আর যাই হোক, এমন আশা খুবই সম্ভব যে মানুষ যদি সত্যিই কোনদিন নিজের সম্বন্ধে সব সত্য জানতে পারতো তাহলে আগে হতাশায় মরে যেত মনুর বংশধরেরা, ছিন্নভিন্ন হতো মনুষ্যসমাজ।

কিন্তু কেমন করে অপরের প্রতি এই অন্তহীন অবজ্ঞা দূর করা যাবে জানি না। ক্রমেডীত ইস্কুলে পাঠ দেওয়া পণ্ডিতেরাই তো আমাদের ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা শেখায়! যেদিন থেকে বালকেরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখে সেদিন থেকেই তাদের নির্ভীক হওয়ার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করা সুরু হয়। একবার এক বালককে তার বাপ-মায়ের চোখের সামনে সভাস্থলের আড়ালের সিঁড়ি এক পক্ষি-শাবককে ফাঁসি দিতে দেখেছিলাম। সহ্য করতে না পেরে যখন ঐ ফুলে-আল্লাদের দিকে ছেড়ে দেলাম তখন আমি তার পিতামাতা কর্তৃক এই ব'লে তিরস্কৃত হলাম যে বালকের কর্মে বাধা দিলে তাকে মানসাঘাত দেওয়া হবে। পক্ষিশাবক নিধনে প্রবৃত্ত উক্ত বালক যে নির্দয়তার প্রশ্রয় পাচ্ছে

এবং আমার মনের ওপর অত্যাচার করছে, এজন্য কিন্তু শিশু-মনোবিদ্যার বাজার চলতি পাঠ্য-পুস্তক-পড়া উক্ত শিক্ষাবাক্তার কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা নেই।

ঘটনাটি ঘটেছিল প্রায় তের বছর আগে। আজ আমি নিঃসংশয়ে যে উক্ত নামধেয় গোষ্ঠির অন্যান্য অপরিণতদের সংগে হাত মিলিয়ে নির্দ্বিধ চিত্তের চরম প্রমাণ দিতে প্রস্তুত—আপনাকে গাড়ী চাপা দিতে বা খুন করতে সে আর পরাঙ্মুখ নয়। পরিসংখ্যানে দেখছি উন্মাদালয়ে আশ্রিত দলভুক্তদের মধ্যে (বালবৃদ্ধির ও যৌন-ব্যতয়ী সমেত), নির্দ্বিধ হবার সাধনায় রত একালের যুবকবৃন্দের সংখ্যাই বেশী। এর জন্য অংশতঃ দায়ী তথা-কথিত শিক্ষক ও শিশু-মনোবিদ্‌রা যারা বিশ্বাস করেন না যে, সমাজে সকলের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য ব্যক্তির কিছু পরিমাণে আত্মদমন হওয়ার প্রয়োজন আছে। শিশুমানুষগুলিতা যখন কঠোর ছিল, যেকালে শিশু-শিক্ষালয় থেকেই ছেলেদের তন্ত্র-আচরণে, আত্ম-সংযম-অভ্যাসে শিক্ষা দেওয়া হ'তো, তখন, আর যাই হোক, ছেলেরা অল্প বয়সেই খুনে হতো না। চলতি শিক্ষাপদ্ধতি যদি আমরা বদলাতে না পারি, বয়সের প্রত্যূষকালেই যদি আত্ম-সংযম শিক্ষা সুরু না হয়, তাহলে আমাদের এই দেশের স্বাধীন গণতন্ত্র ভবিষ্যতে ভেঙে একাকার যাবে; এবং পরিবর্তে, শিল্পক প্রয়োজনের তাগিদে আসবে চৌচ্যালিটারিয়াস হাতের কঠোর নিয়মের বেড়ি।

আচরণ-ভ্রষ্টিত এইসব সমস্যায় গণতন্ত্র আজ সঙ্কটের সম্মুখীন। মানুষের প্রতি মানুষের অতলস্পর্শ অবজ্ঞার অন্ধকারে নিহিত রয়েছে এ কালের অশিষ্টাচারিতার মূল কারণ। তুলনায় মার্কিনরাই যদিও অধিকতর সভ্যতর, তবুও, আমার মনে হয়েছে, তাঁদের অশিষ্টতর হওয়ার প্রচেষ্টার অনেকখানিই নেকী। "ওহে ম্যাক" জাতীয় অসাক্ষর সম্বোধন, মার্কিনরা যেমন করে থাকেন, অথবা তাঁদের আড়ষ্টতা-বর্জিত সপ্রতিভ আচরণ সব সময়েই সমদর্শিতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ বলে মনে হয় না। বরং আমার ধারণা, মানুষে-মানুষে কোনও তফাৎ নেই—সব সমান—মূঢ়বাদী-মনোবৃত্তিপ্রসূত যে ঘৃণাবোধ, তাই-ই প্রকাশ পায় এ' জাতীয় অসাক্ষর ব্যবহারে।

দু'মিনিটের পরিচয়ে কেউ আমায় ডাক-নামে সম্বোধন করতে সুরু করলে আমি কষ্ট হই। আমার এই রোষের হেতু নয় কোনও ঋষিতুল্য বোধ; কিংবা এমন নয় যে আমি নিজেকে মনে করি বিশেষ পাঁচজনের মধ্যে পঞ্চম।

বরং উল্টো। আমার সম্পর্কে কিছুই জানেনা অথচ সামান্য পরিচয়েই ডাক-নামে সম্বোধন করতে সুরু করে যে ব্যক্তি সে আসলে আমাকে এড়াতে চাইছে বুঝতে হবে। সে আমাকে বোঝবার ঝক্কাট নিতে রাজী নয়, আমার রুচি-পছন্দ আমার উদ্দেশ্যে সময়ব্যয় তার পক্ষে অনুচিকর। বস্তুতঃ ইয়ুথ আচরণে আমার ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। যে আমায় অচিরে ভুলবে, ভবিষ্যতে যার সঙ্গে কখনো দেখা হবে না সে যদি বহুকালের আলাপীর মত পিঠ চাপড়ে কথা বলে, ডাক-নামে ডাকে, তাহ'লে তার ব্যবহারে একটা মনোভাবই স্পষ্ট হ'য়ে উঠে: সে আমার সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে পরিচিত হওয়ার দায়িত্ব চুকিয়ে দিতে চাইছে। এটা ধৃষ্টতার বিজ্ঞাপন মাত্র।

মেকী অন্তরঙ্গতার বদলে সংযত আচরণ আমার অধিকতর আকাঙ্ক্ষিত কারণ, গণতন্ত্রকে আরেকটু মহত্তর দৃষ্টিতে দেখার পক্ষপাতী আমি। যে পশুদেবতা আমার প্রতিবেশী, যাদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা ক্রমেই খাদ্যরোধকারী হয়ে উঠছে, শিষ্টাচারবোধের অভাবে তাদের সাথে দিন-যাপন অচিরেই পীড়াদায়ক হয়ে উঠবে।

এক শান্তিহীন যুগের সংশয়ী যাত্রী আমরা: অজানিত আমাদের পথের ঠিকানা, অনিশ্চিত আমাদের ভবিষ্যৎ। সার্বজনিক এই হিংস্রতায় যে-পরীক্ষায় জন্য আমার আর্তি তা হলো সহিষ্ণুতা, সহমর্মবোধ। ধনবাদ-সাম্যবাদের তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্বের বিতর্ক করার চাইতে আমাদের ছেলেদের সাধারণ মানুষের সহিষ্ণুতায় শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজন তাই জরুরি হয়ে পড়েছে আজ। প্রতিজনের জীবনকে মনোরম করে তোলা যদি সভ্যতার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে সহিষ্ণুতা—প্রতিদিনের ক্ষেত্রে যার অপর নাম শিষ্টাচার—আজ অপরিহার্য। কোনও দূর লক্ষ্যের চাইতে উপায় ও মাধ্যম মূল্যে-মূল্যে গরীয়ান, সভ্যতার ইতিহাসে একথা প্রমাণিত। দৈনন্দিন অভদ্র আচরণ কিংবা সর্বধ্বংসী পরমাণবিক দুর্ঘটনা—মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ফলতঃ সহিষ্ণুতার, অভাব ঘটলে এর কোনটাই দূর করা সম্ভব নয়।

অনুবাদ: সৌম্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদেশী কবিতা

শেক্‌স্‌পীয়র

(সনেট ১৯) : Devouring Time, blunt thou the lion's paws,

সর্বগ্রাসী মহাকাল, ভঁতা করো সিংহের নখর ;
পৃথিবী করুক গ্রাস যতো তার কোলের সন্তান ;
বাঘের চোয়াল হতে হিংস্র দাঁত তোলো না প্রখর ;
চিরায়ু ফিনিক্স হোক রক্তদাহে ভস্ম-অবসান।
তোমার গতির চাপে সুখ-দুঃখ করুক ওঠ্‌তে ;
এবং দারুণ কাল, করো তুমি যা ইচ্ছা তোমার
বিপুলা এ পৃথিবীর দীর্ঘশ্বাস মাধুর্য-মরুতে ;
কেবল নিষেধ এই, করো না এ পুণ্য সাপাচার :
আমি যাকে ভালোবাসি ছুঁয়ো না সে সুন্দর আনন,
সেখানে এঁকো না রেখা ওই তব আধিম কলমে,
তোমার যাত্রার পথে কলঙ্কিত করো না সে ধন—
যাতে লোকে ভবিষ্যতে আসে রূপ বাঁধা কী নিয়মে !
তবু যদি ধরণে দেবে, যাও, বৃদ্ধ কাল। সে তাণ্ডবে
জেনো, যাকে ভালোবাসি এ কাব্যেই সে অমর র'বে ॥

(সনেট ৩৪) : No more be grieved at that which thou hast done

আর দুঃখ করো না যা-করেছ সেজন্যে একবারো :
গোলাপে কণ্টক আছে, রূপোলি বর্ষায় কতো কাদা ;
মেঘ আর গ্রহণে তো চন্দ্র সূর্যে ছায়া পড়ে গাঢ় ;
সুগন্ধ কুঁড়ির বক্ষে কীটকুল থাকে বাসা-বাঁধা।

সব লোকই ভুল করে, এমন কি আমিও এই ভাবে—
তোমার অভাব কাজে নামা ছাঁদে দিই-যে তুলনা।
ক্রটিতে প্রলেপ দিতে আমি তাকে ভূষিত প্রভাবে;
পাপকে শোধন করি এত বেশি, পাপ সে যত না।
ইন্দ্রিয়জ দোষে তব আমি আমি যুক্তির বিচার—
যে তোমার প্রতিবাদী সেই যেন তোমার উকিল—
এবং আমারই সাথে যোকর্দমা আমি বারবার;
এত গৃহযুদ্ধ বাধে প্রেম আর ঘৃণাতে সামিল
যাতে আমি অনিবার্য হ'য়ে যাই সহযোগী তারি
যে দুই ডাকাত, আহা, মিলে যায় সর্বনাশ করি'॥

(সনেট ২৬): Lord of my love, to whom in vassalage

প্রেমের ঈশ্বর, আমি সামন্তের প্রথা অনুযায়ী
তোমার শক্তির কাছে কর্তব্যকে বেঁধেছি আমার,
তোমারই উদ্দেশে আমি লিখিত এ বিবৃতি পাঠাই
সে শুধু কর্তব্যভাবে, রসজ্ঞের স্পর্ধা নেই তার।
কর্তব্য সে এত বড়, যা আমার ক্ষীণ রসজ্ঞতা
সাজাতে নিরাভরণ, উপযুক্ত ভাষার অভাবে;
কিন্তু এক আশা, তারা পাবে যদি তব প্রসন্নতা,
তোমারই আত্মার ধ্যানে, সর্বনগ্ন, যোগ্য সাজ পাবে।
অবশ্য এ ততদিন যতদিন রাশিচক্র ঘুরে
না আনে যাত্রার পথে সুফলের স্থির সম্ভাবনা;
এবং এ শততিরা প্রেমে যেন রাজসজ্জা মুড়ে,
যাতে আমি বৃত্ততটে ও প্রভার অযোগ্য হয় না।
তখনি সদর্পে বুঝি বলা যাবে কত ভালোবাসি;
তার আগে সেথা চাও সে রাজ্যে আমি না যেন আসি॥

(সনেট ৬০) : Like as the waves make towards the pebbled shore

উপল-সৈকতে যথা ঢেউগুলি ভেঙে পড়ে এসে
তেমনি মুহূর্তগুলি ক্রতপরে ছোটে সমাপ্তিতে ;
পূর্বগত দ্বিমেষের স্থান নেয় পরের দ্বিমেষে,
ক্রমিক সংগ্রামে তারা প্রতিযোগী আগে যোগ দিতে।
জন্ম, যার আদি-লগ্ন ছিল এক আলোর সাগরে,
হামাগুড়ি দিয়ে যাত্রে, পায় যৌবরাজ্যের মুকুট ;
গ্রহণের ছুই ছায়া তবু তার গৌরবের 'পরে ;
এবং সময়, যা সে দিয়েছিল, সবই হরে মুঠ।
সময় যৌবনশিল্পী দ্বিরতির ছিন্ন ক'রে যায়,
এঁকে দেয় বলিরেখা সৌন্দর্যের কপালে গভীর ;
যা-কিছু দুর্লভ সত্য সবই তার ত্রাসের খাদায় :
তার কাস্তে কেটে দেয় সংসারে যা-কিছু উচ্চশির।
তবু সময়েরই বুকে আশা নিয়ে আমার কবিতা
দাঁড়ায় তোমার তরে, সেখানে আক্রোশ তার বৃথা।

(সনেট ৭৬) : Why is my verse so barren of new pride

কেন যে আমার পদ্য থাকে রিক্ত নতুন গৌরবে !
না থাকে বৈচিত্র্য কিংবা বাঞ্জনার ক্রত রূপান্তর !
কেন বা, সময়ধর্মে দায় দিয়ে, চোরাচোখে তবে
আমিও খুঁজি না নিত্য নবসজ্জি, শব্দের সম্ভার !
কেন আমি একই কথা লিখি, একই পুনরাবর্তনে !
এবং যা-কিছু তথ্য রাখি সেই বিখ্যাত শাসনে,
প্রতিটি শব্দই যাতে আমারই এ নাম শুধু ভনে,
বলে বংশ-পরিচয় এবং কী লক্ষ্য তারা জলে !
আহা, জেনো, হে প্রেয়সী, লিখি নিত্য তোমাকেই কথা যে,
তুমি আর প্রেম আছো চিরস্থায়ী বাসনা আমার,

তাই তো সযত্নে যতো আশা-কথা বলি নবদানে,
ঢেলে যাই যা-দিয়েছি বহু আগে কল্পনা উজাড়।
কেননা, যেমন সূর্য প্রতিদিনই নূতন-প্রাচীন,
তেমনি আমার প্রেম বলা-কথা বলে শ্রান্তিহীন॥

অনুবাদ : মণীন্দ্র রায়

য়োহান্ ভোলফ্‌গাংগ্ ফন্ গ্যেটে

ভাগ্যদেবীর গান

দেবতাদের তরে কোরো গো, মানব-সন্তান,
রয়েছে ওঁদেরই হাতে শাশ্বত শাসন।
যখন যে-ভাবে খুশি ওঠান বসান
ওঁরাই যে নতধর।

যাদের ওঁরা ওঠান, তাদের বিত্তণ
ভয়ে ভীত থাকাই উচিত।
হুড়োহুড়ি মেঘের বেলে পাতা
আসনগুলি সোনার চৌকিস-ধারে।

দেবতাদের গৃহবিবাদ হলে
অতিথিদেরই পতন অন্ধকারে।
অবজ্ঞা আর ঘৃণার দুর্বচনে
মুখাই ভারবিচার খোঁজা।

দেবতারা সব সোনার চৌকিস ঘিরে
নিত্যকালের ভোজসভায় মাতেন;
ডিঙিয়ে চলেন পাহাড়, খাদ থেকে
আসছে আর্তক পতিতজনের স্বাদ।

প্রভুরা আর চেয়েও দেখেন না
একদা কৃপাদত্ত অনুগামীর
তপণদার তন্দনের দাবীর
অধঃতন সৌম্য পরিবারে।

ভাগ্যদেবী গাইছিল এই গান।
নির্বাসিত বুড়োটা অন্তত্তাপ
সে-গান শুনে কেবলই মাথা দোলায়,
হায় কী দশা আমার শান্তিপুত্তির।

অনুবাদ : অরুণকুমার সরকার

পল ভালেরি

পরক্ষেপ

আমার নৈঃশব্দ্য-শিশু তোমাতেই ও পরক্ষেপ ঐ
পবিত্র, নীরব বিরাজিত—
বরফদদৃশ ঠাণ্ডা, বোবা
চলে যাচ্ছে আমার সতর্ক ঐ শয্যাটির দিকে :
পবিত্র অস্তিত্ব আর ঈশ্বরের ছায়া—কত আশ্চর্য মধুর
তোমার চলার ছেদ টানো!
ঈশ্বর, এখন সব অনুষ্ঠিত দাসি-অবদান
আমার নিকটে যেন আসে ঐ নগ্ন ছুটি পায়ে ;
আমার চিন্তার মধ্যে অবস্থিত হাসিদাকে তুমি
শান্ত যদি করে দিতে চাও
সে কারণে যদি তুমি চুমেছই আরোগ্য সাকো ও
এবং ঝাড়িবে গন্ধো তোমার ছুঁচোট.

সেই কমনীয় কর্মদাবশে করো না বড় হয়া,
মাধুর্য বিস্তৃত আছে হওয়া না-হওয়ায়,
কারণ আমার বাঁচা ছিল যেনো তোমার জন্যেই
আমার হৃদয় ছিল শুধুই তোমার পদক্ষেপ।

অনুবাদ : সংকর্ষানন্দ মুখোপাধ্যায়

ফেদেরিকো গারথিয়া লরকা।

আমহর্ষ

(ঘটলো কারণ দস্তরমত তুমি তোমার অ্যামিডি জানতে না)

চেতনা ঝাপসা হয়ে আসছিল ব্রেসেটার।
তখন দশটা সকাল।

তার বুক ভ'রে উঠছিল
ছিন্ন ডানায় ডানায় আর ফ্রিজিয় ফুলের গন্ধে।

তার মনে হল তার মুখে একটা
শুধু একটা কথা র'য়ে গেছে।

যন্ত্রণা ঘুলে দিতেই তার হাত থেকে
হালকা কোমল বলয় ঘাই ক'রে পড়লো।

জানলা থেকে দেখা যাচ্ছিল এক দুর্গচূড়া।
তার নিজেকে মনে হল সে সেই জানলা সেই দুর্গ।

সে নিশ্চয় দেখেছিল ব্রেসে-বন্দী মিশ্চল
ঘোড়ি তার দিকে স্থির তাকিয়ে আছে।

সে দেখেছিল তার দীর্ঘ নিষ্কম্প ছায়া,
শাদা রেশমী গদীর উপর রয়েছে লুটিয়ে।

আর সেই অনমনীয় অ্যাম্বিডিক ছেলেটা,
কুণ্ডলের ঘায়ে চুরমার করে ফেললো আয়না।

ভাঙবার পরে পুঞ্জ পুঞ্জ ছায়ার
তার অলীক ঘরখানা ভ'রে গেল।

অনুবাদ : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই আমি

একটি মিশ্রো কবিতা : সেই স্বর্গীয় ক্ষণ

সেই স্বর্গীয় ক্ষণ তোমার আলিংগনে
আমি কেঁপেছিলাম কত
নিরুদ্ধনিঃশ্বাসে,
আর মধুপ্রকৃতি যে সেও
নিথর হয়েছিল।
মধুকণ্ঠী কোকিলটাও তার
গান থামিয়েছিল,
আর পাতায় ঝিরিঝিরি
হয়েছিল স্তব্ধ।
শিরশিরে কোন তালের পাতাও আর
একটাও সেই সন্ধ্যে দোলায়নি।
সমুদ্র তার গম্ভীর গর্জন ভুলেছিল,
সেই স্বর্গীয় ক্ষণটিতে॥

অনুবাদ : মনুজেন্দ্র মিত্র

রবীন্দ্রনাথ । উত্তর পথ : সম্পাদনা : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক : ইণ্ডিয়ানা, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥

বারো বৎসর বয়সে 'অভিলাষ' কবিতা প্রকাশের কাল থেকে মৃত্যু দিবস পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের লেখনী ছিল অবিরামশ্রম্ভ। এবং এই সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে তিনি যেমন স্বদেশ ও বহির্বিশ্বের অজস্র চিন্তা ও প্রভাব আয়ত্ত ও অঙ্গীকার করেছেন তেমনি স্বয়ং রূপ দিয়েছেন মানবসত্তার-ই নতুন দিগন্তকে, প্রভাবিত করেছেন ইতিহাসকেই একক প্রভাব। এবং এই স্বীকার ও সৃষ্টি ছিল একটি অবিচ্ছিন্ন অবিরাম প্রক্রিয়া শ্রান্তিহীন ধারাবাহী : গোয়েটের মতই সর্বগ্রাসী মানসিক ক্ষুধায় নিত্যদায় ক্ষেত্র ছিল সর্বতোমুখী, সর্বদা বিবর্তমান ; এবং গ্যোয়েটের চেয়েও আরো অনেক উল্লেখযোগ্যভাবে স্বদেশের ঐতিহাসিক পুনরুজ্জীবনে ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট ! এবং সৃষ্টির মধ্যে সমস্তকে আপন ব্যক্তি-চৈতন্যে বিধৃত করার ধারণাতীত দুঃসাহসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এমন এক আত্মবোধ ও রুচির ঔৎকর্ষ যা প্রাকৃত ধারণায় কেবলমাত্র বিশ্ববিচ্ছিন্ন নন্দন-কামনিকের আয়ত্তগম্য শুধু। বিস্ময়কর প্রাণধাত্রী আপন স্বভাবের প্রেরণাতেই আপন ব্যক্তিসীমা উল্লঙ্ঘন করেছে, আত্ম-উত্তরণ করেছে বারবার।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টি ও ব্যক্তিত্বের আলোচনা তাই এত বিপজ্জনক। প্রায় অনিবার্যভাবেই আলোচককে বিভ্রান্ত এমন কি বিপথগামী করে। অনিবার্যভাবেই আলোচকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় রবীন্দ্র-সৃষ্টির কোনো বিশেষ এক অংশ বা খণ্ডের উপর ; সেইটাকেই ভিত্তি করে তিনি আপন প্রবণতা অনুযায়ী কতকগুলি সাধারণ সূত্রে উপনীত হন এবং তারপর বহু চিন্তাবিভাসের মধ্য দিয়ে যখন কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছন তখন হয়ত রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃততর সৃষ্টি তাঁর সিদ্ধান্তকে মিথ্যা প্রমাণ করে নতুনতর সত্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বর্তমান প্রবন্ধসংগ্রহের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, গ্রন্থে একাধিক লেখক এই সমস্যার বিষয়ে সচেতন; এবং এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই রবীন্দ্র-প্রতিভার আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। বিশেষতঃ উল্লেখযোগ্য মোহিতলাল মজুমদারের "রবীন্দ্রনাথের কবিপুরুষ" যার সূচনা নিম্নোক্ত প্রশ্নের মধ্য দিয়ে…"তাঁহার কল্পনা নবনব ক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়া সেই ব্যক্তিত্বকে বহুরূপী করিয়াছে; তথাপি সে কল্পনা কি চিরদিন তাহার একটা কেন্দ্র-মধ্য-বিন্দুতে সংবদ্ধ ছিল না?" অতঃপর বিস্ময়কর অবশ্য ঐক্যের সঙ্গে রবীন্দ্র চেতনার মৌল বিন্দুতে উপনীত হয়েছেন, "সেই নানা ভাব ও নানা রূপের সমন্বয় চেষ্টাও যে ভাবে হইয়াছে তাহার মূলে আছে…বিশ্ব বা ভূমা।" কিন্তু এও শুধু কথার কথা হ'ত যদি মোহিতলাল এই বিশ্বচেতনা বা ভূমাবোধের কাব্যরূপ ও রসগুণের প্রকাশ পরিচয় উদ্ঘোষিত না করতেন,…"রবীন্দ্রনাথের এক কোণো তত্ত্ব নয় সে তাঁহারই আমি…সে চিত্তের যত কিছু ভাবোদ্যম—সকলই একটি অন্তঃস্থির দীপশিখার রশ্মি বিকিরণ মনে করিতে হইবে।" এবং আজকে যখন রবীন্দ্র প্রতিভার উৎসমূল ও জাতি পরিচয় নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই তখন মোহিতলালের এই উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, "সে সাধনা দেশকালকে অতিক্রম করিবার সাধনা তাহা কখনও এমন করিয়া দেশকালেরই অবিরাম চলচ্চিত্র ধারাকে কাব্যের প্রেক্ষাপটে প্রক্ষিপ্ত করিয়া এমনতর সিদ্ধি লাভ করে নাই। ভারতীয় সাধনার যে বিশিষ্ট ধারায়—যে মহত্তম জটিল ঐতিহ্যের গভীর গহনে ইহার মূল নিহিত আছে তাহা হইতেও পূর্বে এ জাতীয় কবিপ্রতিভার উদ্ভব হয় নাই; ইহাই বোধহয় এ প্রতিভার আধুনিকত্ব।"

রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরপক্ষ গ্রন্থের অন্যান্য রচনার মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্তের "আমাদের ছাত্রাবস্থা ও রবীন্দ্রনাথ" ঐতিহাসিক মূল্যে অসাধারণ। সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার দলিল হিসেবে এই রচনার মূল্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে মনে করি। অমিয় চক্রবর্তী "রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি" প্রসঙ্গে রবীন্দ্র মানসের একটি মৌল উদ্ঘাটনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, "বাস্তব কাকে বলে আমি না, সত্যকে দেখবার তেজ রবীন্দ্রনাথের রচনায় বহ্ন্যাশক্তির যোগে আত্মীকৃত প্রকাশিত হয়েছে।" কবিকাহিনী থেকে উদ্ধৃতি সহযোগে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের "সংবেদনশীল সত্যদর্শিতার" যে প্রমাণ পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা আজ ক্রমশ স্বীকৃত হচ্ছে যদিও এ বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনার

ক্ষেত্র আজো অবধি। অন্নদাশংকরের "রবীন্দ্রনাথের অপরাধ" শীর্ষক আলোচনায় তাঁর স্বাতন্ত্র্যিক দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রমাণতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া গেলেও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এর চেয়ে বিস্তৃত ও মূল্যবান আলোচনা তিনি ইতস্ততঃ করেছেন বলে মনে পড়ে। মূলতঃ আমরা রবীন্দ্র প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বিচারে পরিণত ইতিহাসবোধের পরিচয় দিয়েছেন এবং সর্বভারতীয় পটভূমিতে রবীন্দ্র সাধনার একটি সুষ্ঠু মূল্যায়নে অগ্রণী হয়েছেন। বাঙালী পাঠকের কাছে এই প্রবন্ধটির স্বতন্ত্র একটি মূল্য থাকবে আশা করি। ইতিহাস বোধের গভীর পরিচয় বহন করে শঙ্কর ভট্টাচার্যের "বিতর্কের স্বতন্ত্রতা" শীর্ষক প্রবন্ধটিও। এবং শুধু ইতিহাস বোধই নয় রবীন্দ্রনাথের বাকি মানসের যে বিশেষ প্রকৃতি সে বিষয়েও গভীর অন্তর্দৃষ্টির স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর রচনায় যে উপলব্ধি কোনো ধর্মগত প্রাণে ব্রহ্মবাদ বা ব্রহ্মানুভূতি এনে দিত তা রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছে 'বিতর্কের স্বতন্ত্রতা'।...এই সমাধির অবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন অনুভূতিরূপে, তত্ত্বরূপে নয়।" অবশ্য শঙ্কর ভট্টাচার্যের যে সিদ্ধান্ত যে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু উনিশ শতাব্দীর উপর এই শেষ যবনিকা টেনে দিল, এই মতের বিরুদ্ধ বক্তব্য যুক্তিযুক্ত তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'শেষ অধ্যায়' প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের শেষ দশ বৎসরের রচনাকে ভিত্তি করে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা রবীন্দ্র সম্পর্কিত বর্তমান বিতর্কের মূলে আলোকপাত করবে বলে মনে করি, "বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন হয় রক্ষণশীল; রবীন্দ্রনাথের বেলায় হয়েছে ঠিক তার উল্টো। গভীরতর অর্থে মানুষ ও পৃথিবীকে ভালবেসেছিলেন বলেই এই অব্যাহত পরিণতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছিলেন। পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির অংশ যে এগিয়ে আসবে তা তিনি বুঝেছিলেন এবং তার সম্পূর্ণ অর্থও ভালো করেই জানতেন। এই জ্ঞান যে কোনো মানুষের বিশ্বাসের ও ভালোবাসার ভিত্তিভূমিকে টলিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু রবীন্দ্র-মানস পরিণত বয়সে এমন একটা বোধের অধিকারী হয়েছে যার বলে কবি জেনেছেন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোন একটা বিশেষ পর্যায়ের জন্যে শাশ্বত মানবাত্মার যাত্রাপথে একটি ছেদ, নূতন সভ্যতার নবজন্মের একটি বেদনাপর্ব মাত্র। এই বিশাল উদ্ধৃতির প্রয়োজন হল এই কারণে যে এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের একটি সার্থক ব্যাখ্যা উপস্থিত। বর্তমানে

অনেক পশ্চিম ইয়োরোপীয় লেখকের মত রবীন্দ্রনাথ হতাশায় আক্রান্ত হন নি তার কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম ইয়োরোপীয় অথবা অন্য কোনো সভ্যতার সঙ্গেই নিজেকে সম্পূর্ণ একাত্ত করেন নি—তাঁর জন্য সকল সভ্যতারই সত্যানুসন্ধান করেছেন কিন্তু বিচার করেছেন তাঁর প্রজ্ঞালব্ধ বিবেকের অমোঘনীয় মানদণ্ডে, যে বিবেক সাধারণ এক মনুষ্যত্বের ধারণার পর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই তিনি গান্ধিজীরও প্রতিবাদ করতে পেরেছিলেন।

গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ, অরবিন্দ পোদ্দারের 'রবীন্দ্রনাথের হিউম্যানিজম' একটি মহৎ ব্যর্থতার দলিল হিসেবে আমাদের সতর্ক অনুশীলনের যোগ্য। অরবিন্দ বাবুর আলোচনা মহৎ এই কারণে যে তিনি একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে—মার্ক্সবাদীরূপে পরিচিত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে—রবীন্দ্রচিন্তার বিচার করেছেন বিনা দ্বিধায়, প্রশংসনীয় সৎসাহসের সঙ্গে। অরবিন্দবাবুর ব্যর্থতা কোন্ কারণে তা তাঁরা যুক্তির দ্বারা উপনিষদগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের বিষয়ে শ্বাইৎসারের (Schweitzer) আলোচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। অরবিন্দ-বাবু অথবা অন্য কেউ উপনিষদ থেকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন বা হতে পারেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তা হন নি। তিনি তাঁর ব্যক্তিক অনুভূতির সঙ্গে যতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ, উপনিষদের ততটুকু মাত্র গ্রহণ করেছেন, আপন নৈতিক প্রয়োজনে, ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ নতুন এক অন্তঃপাঠ যোজনা করেছেন। ফলে বর্তমান অতীতের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে বরং অতীত এক নতুন অর্থবহ জীবন লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি আবহমায় এই বিশেষ প্রাণলক্ষণ বা বোহিতলাল থেকে শুরু করে আরো অনেকেই উল্লেখ করেছেন তা যে অরবিন্দ বাবুর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে তার কারণ সম্ভবত এই যে, তিনি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ একটি কাঠামোর মধ্যে ফেলতে আগ্রহী। তিনি ভুলে যান যে, আত্মা বা পরম ইত্যাদি শব্দের যে অর্থ তিনি করেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে তার তাৎপর্য সম্পূর্ণ অন্যত্র। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরবাদেরও এক সুস্পষ্ট মানবিক content বর্তমান। [অন্তত্রেতে যেমন বিদেশের ঈশ্বর-উদ্দিষ্ট কবিতাগুলি সমস্তই মানুষী অনুভূতি-নির্ভর] এবং এই সত্য অনুধাবন না করে যদি কেবলমাত্র কয়েকটি প্রচলিত তত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্র চিন্তার সমীকরণ করে সেই সব প্রাচীন ও প্রায় পরিত্যক্ত তত্ত্বের আনুষ্ঠানিক সমালোচনার দ্বারা আর যাই সম্ভব হোক রবীন্দ্র মানসের বহির্বৃত্তও স্পর্শ করা যাবে না। এবং সংস্কার তাঁকে

সেই পথে পরিচালিত করেছে বলেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে ভুল বুঝতে বাধ্য হয়েছেন।

মার্ক্সের একটি উদ্ধৃতি সহযোগে অরবিন্দবাবু চেষ্টা করেছেন Humanism এর মার্ক্সবাদী রূপায়নের। এই চেষ্টার প্রয়োজন আছে। কিন্তু মার্ক্সবাদ মার্ক্সের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয় নি বলে শেষ পর্যন্ত মার্ক্সবাদীরা হিউম্যানিজমকে যে বিসর্জন দেন তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আজও লুপ্ত হয় নি। রুশ বিপ্লবের সমসাময়িক ব্লক (Block) তার 'The Decline of Humanism' প্রবন্ধে যে ব্যর্থতাবোধের স্বীকৃতি রেখে গেছেন তৎকালীন বা পরবর্তী কোনো মার্ক্সবাদী তা অস্বীকার করেন নি এবং আজো করেন না। কারণ মার্ক্সবাদের unit নিছক মানুষ নয়, নিছক শ্রেণী সুতরাং মার্ক্সবাদকে হিউম্যানিজমের মোড়কে ঢেকে নতুন হিউম্যানিজম বলে চালানো চলে না।

গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, যাঁরা···তথু বিংশ শতাব্দীর ধ্যান ও ধারণাকেই নিজেদের চেতনায় বহন করছেন তাঁদের চোখে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যস্বরূপটি উপস্থাপিত করাই···আমার কর্তব্য বলে মনে নিয়েছি। অসুঙ্কোচে বলতে পারি যে, সেই স্বয়ংকৃত কর্তব্য সম্পাদনে তাঁর সাফল্য বিস্ময়কর ও অজস্র সাধুবাদের যোগ্য।

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। মণি বাগচি। জিজ্ঞাসা, ১৩৩৯, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯। দাম ৪·৫০ নঃ পঃ।

সাহিত্যের একটি বলিষ্ঠ শাখা জীবনী সাহিত্য। ব্যক্তিকে আশ্রয় করে নবজন্মের সৃষ্টি এবং সেইসব চিহ্নিত জীবনগুলির মধ্যে যুগচিত্তার ঐক্য ও তার মূল সূত্রের অবিচ্ছিন্ন রূপটি স্পষ্ট প্রকটিত হয়ে ওঠে। জীবনী কেবল আত্মজের পারিবারিক এবং কর্মকর্মের ক্রমিক ইতিহাস নয়, বৃহৎ পৃথিবীতে মানুষের মনুষ্যত্ব যে সত্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার ব্যক্তিজীবনে প্রতিফলিত এবং কর্মে স্ফুরিত হয়েছে তার পরিচয়ও বটে।

জীবনী-লেখকের কর্তব্য কঠিন। উপন্যাস, কাব্য রচনায় স্রষ্টার স্বাধীনতা আছে, সৃষ্টিতে নিজমত প্রকাশে তার বাধা নেই; কিন্তু জীবনী লেখকের সে

স্বাধীনতার অবস্থান কোথায়। যে জীবন কর্মে লক্ষিত হয়েছে তাকে সমস্ত ভাবাবেগ হতে মুক্ত হয়ে গবেষকের দৃষ্টিতে অনুধাবন করতে হবে। কালস্রোতের আবর্তনে বহু চরিত্রের স্বরূপ আবৃত হয়, সন্ধানীর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ব্যতীত তার তথ্য উদ্ঘাটন অসম্ভব। লেখকের ভাবাবেগ যতই পীড়িত হোক না কেন, তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে চলবে না। আইমট্রাইনের মত লেখককেও স্মরণ রাখতে হবে—"একমাত্র মহান ও বিশুদ্ধ চরিত্রের দৃষ্টান্ত থেকেই উচ্চ আদর্শ ও মহৎ কার্য্য হওয়া সম্ভব।" তিনি তার নিবেদনে একথা পবিত্র ব্রতের। নিরপেক্ষ আলোকপাতে উত্তরপুরুষকে পথ দেখালেন তিনি।

তথ্য নির্ব্বাচনে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণী সূক্ষ্ম দৃষ্টিই জীবনীকারের রচনার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। ভাষার কারুকার্য্য সম্বন্ধেও তাঁর মাত্রাবোধের অতিরিক্ত সতর্কতা প্রয়োজন। সাংবাদিক বাহুল্য বর্জন করে কেবল সত্য পরিবেশন করেন, কবি তাঁর মানসিক অনুভূতিকে রসমণ্ডিত বাণীমূর্তি দান করেন আর জীবনীকারের প্রয়োজন এমন ভাষা যা অতিরিক্ত রসমাধুর্য্যে বিষয়কে আবৃত কিম্বা অবহেলিত ভাষায় অপকৃষ্ট করে তুলবে না। ভাষার গভীরতা, গুরুত্ব ও ব্যক্তিত্ব না থাকলে কেবল রচনাশৈলীর গুণে সে জীবনী কখনো সাহিত্য পদ-বাচ্য হয়ে ওঠে না, আমরা এমনও দেখা গিয়েছে যে রচনার ত্রুটীতে মোদ্দা জীবন সার্থক মর্য্যাদায় গৃহীত হয়নি।

বাঙ্গালী সাহিত্যরসিক, তার সাহিত্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধ কিন্তু জীবনীসাহিত্যের যেন কিছু অসম্পূর্ণতা রয়েছে আজো। উনিশ শতকের বহু কর্মীর জীবন এখনো আমরা পাইনি এবং পেলেও তার অনেকগুলিই নিছক জীবনীর মর্যাদা। উনবিংশ শতাব্দী এক পরমাশ্চর্য্য যুগ। সর্বত্র জগৎ ও জীবনকে জানবার একটা প্রেরণা জেগেছিল। বিজ্ঞান, রাজনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শন প্রভৃতির বৈচিত্র্য এই শতককে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছিল। এই বিপুল আন্দোলনে আমাদের দেশেরও যোগ ছিল। পরলোকবিশ্বাসী, জীবনপলায়িত বাঙ্গালী যে তার মধ্যযুগে তন্দ্রা ভেঙ্গে এই জীবনযজ্ঞে যোগ দিয়েছিল তার স্বাক্ষর বহন করছে বহুকর্মীদের জীবন কথা। সাহিত্যক্ষেত্রে মধি বাগচি সুপরিচিত। জীবনী-সাহিত্যে তাঁর অবদান স্বীকৃত। 'আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র' শ্রীবাগচির সর্বশেষ নিবেদন। প্রফুল্লচন্দ্রের চরিত্রে আমরা বাঙ্গালী হৃদয়ে পাশ্চাত্যের শক্তিসঞ্চার প্রত্যক্ষ করেছি। এই বিজ্ঞান তপস্বী প্রাচীন ভারতের আচার্য্যের মতই

যাদবকে নিজসত্তায় গ্রহণ করে আপন শক্তি দিয়ে লালন করে গেছেন। তাঁর ভাব এবং আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন বহু বঙ্গসন্তান। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কর্মময় জীবনকথা দেশের জাতীয় সম্পদ এবং এখানি রচনা করে লেখক দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। লেখনী যাদুটির একটি বৈশিষ্ট্য যে তিনি আলোকপাতে জীবনমহিমাকে উদ্ভাসিত করেন, কিন্তু বর্ণানুলেপনে লেখনীকে সংযত রাখেন। আলোচ্য গ্রন্থেও এ ধারার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

বর্তমান গ্রন্থ পাঠককে কেবল আচার্য্যদেবের কর্ম সম্বন্ধেই অবহিত করবে না, সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের পরিচয়, বাংলাদেশে বিজ্ঞান চর্চা, বাংলার গৌরব কেমিক্যালের ইতিহাস এবং দেশের অগ্রগতির ইতিহাস সম্বলিত তথ্যও পরিবেশন করবে। পরিশিষ্টে প্রফুল্লচন্দ্রের রচনাটি একটি মনোজ্ঞ সংযোজন।

লেখকের ভাষা বিষয়ের উপযুক্ত; গ্রন্থে ঘটনার সন্নিবেশ সুচিন্তিত এবং উদ্ধৃতিগুলি রচনার আকর্ষণকে অতিক্রম করেনি। গ্রন্থটি বিস্তৃত করবার অবকাশ ছিল এবং উদ্ধৃতিগুলি পাদটিকা সম্বলিত হলে অনুসন্ধিৎসু পাঠক উপকৃত হতেন। পুস্তকের সুন্দর বৈশিষ্ট্য জিজ্ঞাসার পূর্বখ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

অমিতা চক্রবর্তী

শতাব্দী শতক—প্রেমেন্দ্র মিত্র ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলিকাতা-১২। চার টাকা।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বৎসরে বিবিধ বেসব সংকলন গ্রন্থ হাতে এসেছে—কোনোটি গল্পের, কোনোটি সনেটের, কোনোটি বিচিত্র কবিতা সম্ভারের,—তার মধ্যে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ও শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'শতাব্দী শতক' একটি বিশিষ্ট ভূমিকার অধিকারী। এতে ১৮০১ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত সময়ানুবর্তী কালের একশ জন কবির একশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। শতবর্ষের নিঃশব্দ প্রবাহিনীর অন্তরালে বাংলা কাব্যসাহিত্য কিভাবে 'অমৃতস্য ঐশ্বর্যের চমক' মনে ধারণ করে আত্মিক মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে, তার ইতিহাসটুকু সম্পাদকদ্বয় এই কাব্যসংকলনে বহনের চেষ্টা করেছেন। এবং বলা নিষ্প্রয়োজন, তাঁদের প্রচেষ্টা উদ্দেশ্যের সাফল্য অর্জন করেছে।

বাংলা কবিতার সংকলন অভিনব কোনো প্রচেষ্টা নয়। ইতিপূর্বে আমরা বিভিন্ন যুগে বাংলাকাব্যের বেশ কয়েকটি সংকলন পাঠ করেছি। ঐ সব পূর্ব-প্রকাশিত সংকলনগ্রন্থগুলোর তুলনায় আলোচ্য সংকলনটির একটি অসাধারণলক্ষ্য বৈশিষ্ট্য বর্তমান। পূর্বেকার গ্রন্থগুলোতে সর্বাধুনিক কবিগোষ্ঠী সমাবেশ প্রতিনিধিত্ব লাভ করেন নি; কিন্তু 'শতাব্দী শতকে' তাঁরা সমাযুক্ত হয়েছেন, এবং আপন নবনবীনতার অত্যুজ্জ্বল ভঙ্গপতন কবিও এই সংকলনে স্থানলাভ করেছেন। এতে কবিদের যেমন আশান্বিত হবার কথা, তেমনি কাব্যরসিক পাঠকও উপকৃত।

বিভিন্ন সময়ে এমনি ধরণের সংকলন প্রকাশ নানা কারণে সমর্থনযোগ্য। বিশেষ বিশেষ যুগলক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য শুধু সেই কালের মুখ্য কবির আত্মপ্রকাশকে আত্মবশকরে অভিব্যক্ত হয় না; মুখ্য হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার মিথুন মানস-ভঙ্গী যাদের অধায়ত্ত, সেই সব গৌণ কবিরাও যুগের ধ্যানধারণা ও বাচন-ভঙ্গীকে অধিকতর সার্থকভাবে আয়ত্ত করতে পারেন। ফলে, তাঁদের কাব্য প্রচেষ্টার মাধ্যমেও বিকাশের ঐশ্বর্যটুকু ধরা পড়ে, এবং পরবর্তী স্তরের কাব্যালোচনার জন্য পাঠক প্রস্তুত হতে পারেন। বিগত শতাব্দীর একজন মুখ্য কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর গীতিধর্মী কাব্যের সহিত সর্বাধুনিক কালের দু'একজন গৌণ কবির শুধু আকৃতির তুলনা করলেই ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে আমরা নিঃসংশয় হই। বিহারীলালের একটি স্তবক

ঐ চাঁদ অস্তে যায়!
বিহগ কলিত গায়,
মঙ্গল-আরতি বাজে নিশি-অবসান:
হিমেল হিমেল বায়
ধিমে ঘুম ভিজে যায়,
শিশির-মুকুতা-জালে ভিজেছে মধাম:
উঠ প্রেয়সী আমার, ফেল নলিন-নয়ান!

এবং সর্বাধুনিক কালের দু'টি গৌণ স্তবক

(১) আর, সেই স্বপ্নের দোলায় দোলায়
তোমার শৈশবের নধুজ, তোমার কৈশোরের কথামালা,
তোমার যৌবনের কোকিল-কণ্ঠ অবধি

এক ঝাঁক পাখীর মত—আমার এই ছোট্ট ঘরের আঙিনাকে
যত বড় আকাশ বলে ভুল করে—
যেন তারা যেদবে সারারাত
যেন গান গাইবে সারারাত।

(২) আমার আকাশে তুমি বৃষ্টি আনো,
প্রাণে প্রাণে তুমি বিদ্যুতের চমক জাগাও।
রিক্ত দগ্ধ অন্তরের গেরুয়া অম্বিতে
কামনা-কদম তার স্নেহ দিয়ে কারুক ভ্রাসন!

বিগত যুগের মিষ্ট সুভাষণ অপেক্ষা চলমান বর্তমানের অভিনব বাক্‌ভঙ্গি এবং সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় বিস্তার যে কাব্যরূপে অধিকতর সরল ও উপাদেয়, এবং আমাদের মানস-জীবনের অতি সন্নিকট তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ বিহারীলাল বিগত শতাব্দীর অন্যতম মুখ্য কবি, এবং অপর দু'জন হাল আমলের একান্তই গৌণ কবি। আর বিহারীলালের কাব্য থেকে এ-কাব্যের দূরত্বও যে অনেকখানি তাও সহজেই অনুমেয়। তাই আলোচনার মুহূর্তে জীবনানন্দ বা সুধীন্দ্রনাথ বা বিষ্ণু দে বা অমিয় চক্রবর্তী আমাদের চোখের সম্মুখে উপস্থিত না থাকলেও, এমন কি সাফল্যের পরিমাপে তাঁদের সমপর্যায়-ভুক্ত অন্যান্য কবিবৃন্দও যদি অনুপস্থিত থাকেন তাহলেও এই কালকে চিনতে অসুবিধা হয় না। সার্থক অসংখ্যের মধ্য দিয়েও কাল কাজ করে যায়, আপন মনের স্বাক্ষর রেখে যায়। সেজন্য, সর্বাধুনিক কালের যথাযথ প্রতি-নিধিত্ব স্বীকার করে সম্পাদকদ্বয় তাঁদের সুবিবেচনা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন; তাঁদের ধন্যবাদ।

একটি মাত্র কবিতা দিয়ে একটি সমগ্র কবি-মানসকে উপলব্ধি করা যায় না; তথাপি বলতে দ্বিধা নেই, কবিতাগুলো একক হিসাবে সুনির্বাচিত। 'শতাব্দী শতক' এ সংকলিত কবিদের মধ্যে একটি নাম আমার অপরিচিত—সেটি দীনেশচরণ বসু (১৮৫০-১৮৯৮); আমি জানি না, এরূপ সংকলনে স্থানলাভের অধিকার তাঁর কতটুকু।

অরবিন্দ পোদ্দার

আলোকিত সময়ের : আলোক সরকার। চিত্রালয়। ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥ প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে : শামসুর রাহমান। বার্ডস এণ্ড বুকস্। ঢাকা-৩ ॥ অজ্ঞাতবাস : শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়। পূর্ব মেঘ প্রকাশ ভবন। কলিকাতা-২৬ ॥ অন্ত এক সমুদ্র : শান্তিকুমার ঘোষ। এসোসিয়েটেড পাব্‌লিশার্স। কলিকাতা-১২ ॥

আধুনিক কবিতার মনোযোগী পাঠক মাত্রই বোধ করি স্বীকার করবেন, কবিতা মানস অনুসরণকারী বিশ্বচিত্তে এখনো, এই বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে, যাঁরা বিশেষ অভিমিহিষ্ট রয়েছেন, সেই সাম্প্রতিক নবীন কবিদের রচনা যুগোত্তীর্ণ কিনা তা সহজে বলা না গেলেও, তাঁরা যে নানাভাবে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ করছেন এই সিদ্ধান্ত আদৌ অতিশয়োক্তি নয়। নবীন কবিদের রচনার টেকনিক্যাল পারফেকশান, এক কথায় শব্দোৎকর্ষের বিচারে অনেকেই সচেতন নন। কিন্তু এটা স্বীকার করতে হবে যে, ধ্বন্যর্থ-চিত্র-অলংকার অথবা শব্দ ব্যবহারের নিপুণতায় তাঁরা পূর্বসূরীদের বহুলাংশে অতিক্রম করেছেন। একটিও নিষ্প্রাণ, নিরাভরণ নিরলঙ্কার পংক্তি লিখতে এঁরা আজ আর প্রস্তুত নন। অভাবনীয় চিত্রকল্প ও সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গের ব্যবহারে অথবা শব্দের অভিধানগত অর্থ সম্প্রসারণের মাধ্যমে এঁরা পরোক্ষে বাংলাভাষাকেও সমৃদ্ধ করে তুলছেন।

এই বক্তব্যের সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবে আমার সামনে যে চারজন নবীন কবির কাব্যগ্রন্থ রয়েছে তাঁরা এখনো সম্ভবত বয়ঃক্রমের বিচারে যৌবনের সীমা লঙ্ঘন করেন নি। যদিও পারিপার্শ্বিক মানসিকতায় তাঁরা যৌবনরাজ্যের নাগরিক কিনা, কেননা আধুনিকতার একটি লক্ষণ শুনেছি অকালবার্ধক্য। 'আমি যুবক' এই স্পর্ধিত ঘোষণা অনেককাল কারো মুখে শুনতে পাই নি। যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় তারুণ্যের একটি ধর্ম হলো—যা আছে, যা প্রচলিত তাকে উপেক্ষা করা ; গত যুদ্ধকে লঙ্ঘন করার এক রক্তাক্ত সংগ্রাম যদি নবীন কবির প্রাথমিক শপথ হয়, তবে বলতে পারি সেই উদ্ভত যৌবনের মুখচ্ছবি পেয়েছি চারটি কাব্যগ্রন্থেই—যা নিঃসন্দেহে এই যুগের মানসিকতা, দ্বন্দ্বের প্রতিবাদী অস্তিত্বকে খুঁজে পেয়েছে। বলা বাহুল্য, এঁদের মানসিক পরিমণ্ডল একরূপ নয়। দুচার পংক্তি পড়ার পর যে কোনো তন্ময় পাঠকই বুঝতে পারবেন যে

একই সময়ের অধিবাসী হয়েও এঁরা প্রতিবেশ অথবা জীবনকে গ্রহণ করেন স্বকীয় ভঙ্গীতে—বর্ণন করার ক্ষেত্রেও এঁদের সেইরূপ প্রাতিস্বিকতা লক্ষ্য করা যায়। এঁদের প্রত্যেকের দেখার ভঙ্গী সর্বত্র গভীর জীবনবোধে রঞ্জিত না হলেও, প্রাত্যহিক জীবনের খণ্ডচিত্র ভালবাসা, কোনো ভালবাসার বিচ্ছেদ-বিরহ বিষাদময় রূপকল্পের আন্তরিকতার সংহত এবং এঁরা অনেকেই প্রায়শঃ অভিজ্ঞতার অবিকৃত ব্যবহারে আগ্রহী।

একটি প্রবন্ধে 'আলোকিত সময়ের'এর রচয়িতা বলেছিলেন: কবিতা রচনার প্রথম সর্ত সরলতা।.....কবিতার যে দুর্বোধ্যতা তা সাহসিক; যে দুর্বোধ্যতা আরোপিত তা কবিতার উন্নয়নের বিপক্ষে যায়।

মন্তব্যটি আপাতবিরোধী মনে হলেও, যুক্তির বিচারে ধরা পড়ে যে একটি গভীর সত্য এখানে লুকিয়ে আছে। কবিতার সারল্য বলতে, অনেক সৎকবির মত আলোক সরকারও যা বোঝেন, সেখানে রহস্যময়তা নিতান্তই প্রত্যাশিত। আর সেই রহস্যের ধাপগুলি অতিক্রম করে পাঠক যেখানে পৌঁছাতে পারেন, তা প্রাত্যহিক জগতের সত্য, যুক্তিগ্রাহ্য আলোয় অবোধ্য না হোক দুর্বোধ্য তো বটেই। আমাদের দৈনন্দিন, সংসারযাত্রা, অফিসের পদোন্নতি-পদচ্যুতির জগতে সেই আকাঙ্ক্ষিত রহস্যময় সারল্য প্রায়শই অনুপস্থিত। আলোক সরকারের কাব্যসাধনার পরবর্তী পর্যায়ে এই মন্তব্যটি বিশেষভাবে বিবেচিত হবার দাবী জানায়। 'আলোকিত সময়ের' অন্তর্ঘনত্ব কাব্যের দ্রুতপঠনে অভ্যস্ত পাঠককে বিপন্ন করে। অথচ সহৃদয় পাঠক জানেন আরোপিত দুর্বোধ্যতা যথাসম্ভব পরিহার করে চলার নিদর্শন এই কবির সমস্ত রচনায় ছড়িয়ে আছে।

'আলোকিত সময়ের'এর কবিতাগুলির কেন্দ্রীয়তে বিরাজ করছে 'প্রেম'—বলা দরকার, এই 'প্রেম' প্রচলিত অর্থে নরনারীর হৃদয়চর্চা নয়। প্রেমিক প্রেমিকা এখানে আর কেউ নয়—কবি নিজে এবং নিয়ন্ত। বিশ্বাসের আলোকিত নিয়ন্তাধারার রক্তাক্ত ইতিহাস তিনি বিবৃত করেছেন। বস্তুত এই প্রয়াস সাম্প্রতিক কবিদের মধ্যে একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়। তবু আলোক সরকার যে ভঙ্গীটি ব্যবহার করেছেন তা একান্তই তাঁর নিজের। ওই কথোপকথনের শব্দিত উচ্চারণ আমাদের পরিচিত হয়েও রহস্যময়—প্রতিবারেই নূতনভাবে 'হয়ে উঠেছে' যেন সম্পর্ক। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি পড়ার পর, মনে হতে পারে একটি রাগিণীই যেন বহু বিচিত্র অলংকারে

পরিবেশিত হয়েছে একাধিক স্থায়ী-অন্তরায়। একটি রূপের আভাস সর্বত্রই পাই, মনে হয় কোথায় যেন দেখেছি, তবু দায়িত্ব পেতে ইচ্ছা করে। আমার বিশ্বাস, তাঁর সব কবিতাই একটি কবিতা, অথবা একটি ব্যাপক অনুভূতিকে অনুরূপের অনুক্ত সূত্রের তিনি বেঁধেছেন।

অনেক সময়ে আলোক সরকারের কবিতায় কাহিনীর আভাস থাকে, মনে হয় একটি বাস্তব অভিজ্ঞতাকে তিনি রূপান্তরিত বা উত্তীর্ণ করতে চান কবিতায়। কিন্তু পরবর্তী চিন্তায় ধরা পড়ে যে আসলে সেই গল্পটি পূর্বোক্ত শিল্পীজীবনের একটা সমস্যার প্রতীকী রূপমাত্র। 'প্রতীক' শব্দটি ইদানীং বহু ব্যবহৃত। বিশেষ কোনো কাব্যাদর্শের অনুগামী কবি যেমনভাবে প্রতীকের ব্যবহার করেন, আলোক সরকার ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটে। কোনরূপ আগ্রহ বা ভঙ্গীর অনুকারক না হয়েই যে তিনি প্রতীকের ব্যবহার করেন এটি বিশেষ তৃপ্তিদায়ক ঘটনা।

চিত্রকল্পের অভিনব উজ্জ্বল ব্যবহারে তাঁর কবিতা যে স্বতন্ত্র এ কথা যে কোনো পাঠকের চোখেই ধরা পড়ে। একদিকে যেমন রক্ত গোধাই-এর জীবন রুক্ষতা, অশোকপলাশ মকারের উজ্জ্বল, মালতী ফুল ঘেরা মাটির ঘর, অন্যদিকে তেমনি রাজপ্রাসাদ, অন্ধকার মন্দিরের মিস্টিক স্বর্ণসম্মোহ, দূর স্মৃতিভারাতুর ধূসরপট মুহূর্তে আমাদের চৈতন্যে কিশোরবেলাকে ফিরিয়ে আনে। সুখের কথা প্রকৃতির সেই মুখচ্ছবি, চলচ্চিত্রের যান্ত্রিক পুনর্লিখন নয়। সেগুলি ভাবে, ভাষায় এবং ধ্বনির মিলনে এমন সংহত হয়ে ওঠে যে তা দ্বিতীয় প্রকৃতি অথবা দ্বিতীয় নূতন সৃষ্টির অভিজ্ঞতা দেয়।

'আলোকিত সময়ের'এর ব্যাপকতা আমাকে বিস্মিত করে। চতুর্দিকের এই ঝাত্যাতাড়িত, অনিকেত জীবনযাত্রার মাঝখানে তিনি যে উত্তরণের প্রয়াসী, তা ভেবে মুগ্ধ হই। কেউ কেউ একে 'কুর্সুদৃষ্টি' বলে চিহ্নিত করতে পারেন। আমার ধারণা ভিন্ন। আধুনিক জীবনের লাঞ্ছিত ব্যক্তিসত্তাকে তিনি অন্তভাবে গৌরবান্বিত করে তুলতে পেরেছেন।

ভিড়ের মধ্যে যাবো না
তুমি যাও,
আমি তোমায় দেখি।

পরিশ্রমে রাঙা ও মুখ—
আমি তোমায় দেখি।'

তাঁর কবিতায় শব্দ নির্বাচনের প্রতিভা, বিশেষণের বিশেষ্যরূপে ব্যবহার অথবা বিশেষণের রূপান্তর সাধন—এ সবই একজন সৎকবির লক্ষণাক্রান্ত। 'ভাঙা ইঁটের পরিশ্রমী রেখা', 'সঞ্চারিত সিঁদুর', 'সপ্রতিভ আলো', অথবা 'তোমার সঙ্গীতের ঝিরি', 'প্রশংসিত লাল' 'প্রান্তরের একা' নিঃসন্দেহে তাঁর মৌলিকতার পরিচায়ক।

কিন্তু এরপরও কিছু আপংকার কথা থাকে। একই শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার তাঁর কাব্যের ঘাসে ঘাসে মালিন্য আনে। পূর্বেই বলা হয়েছে, শিল্পীজীবনের নানা মৌলিক সমস্যা তাঁর কাব্যে বিরাজ করে। কিন্তু এক বা একাধিক শব্দের পুনরাবৃত্তি উদ্দীষ্ট রূপ প্রকাশে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণতঃ, 'হলুদ', 'নীল', 'সাদা', 'লাল', প্রভৃতি রং, 'মেঘলাল' 'আকাশ' 'জল' 'নদী', 'ফল' 'ফুল' প্রভৃতি বস্তু বা সামগ্রী অথবা 'দুপুর' 'অদীম' 'প্রতি-শ্রুত' 'লক্ষিত', 'উদ্ভাসিত', 'সন্ধ্যামিত', 'উজ্জ্বলতা', 'আর্ত', 'মিহিত', 'দীপ্ত' 'লক্ষিত' প্রভৃতি তৎসম শব্দ প্রায় নিঃশ্বাসের মত আনাযাওয়া করে। বাহুল্যের ব্যবহারে অতি তীক্ষ্ণ শব্দও যে তার ধার হারায়, এ কথা কবিকে জানাতে চাই। তাঁর কাব্য নূতন পথের অনুসন্ধানী হোক এই কামনা জানিয়ে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিই যে একদা তিনিই লিখেছিলেন—

'একই ভাষায় যদি তোমায় বলি
তাহলে আমার ভীষণ যন্ত্রণা।
তোমার জন্যে আমি নতুন ভাষার প্রত্যাশী।'

শামসুর রাহমানের কবিতা কলকাতার পত্র পত্রিকায় যথেষ্ট বিজ্ঞাপিত নয় এবং দেশ বিভাগের কারণে তিনি এখন অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক, এ তথ্য তাঁর ভণগ্রাহী পাঠকদের জানার কোনো সহজ উপায় নেই, কেন না তিনি সেই শ্রেণীর কবি যাদের আন্তররূপ ও স্বাধর্ম্য কখনো রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভেদের বিষবাষ্পে কলুষিত হয় না। তাঁর কাব্যগ্রন্থ পাঠ করার পর আমরা এই অনুমান লিপিবদ্ধ করতে পারি যে, এই কবি দেখেন নিজের আবেগের তাগিদে, আর সে কারণে দুঃখশোক অথবা আকৃতির অকপট প্রকাশে তাঁর কোনোও কুণ্ঠা নেই। উৎসর্গ লিপিতে তিনি সেই উদাহরণ রেখেছেন :

'আমার যাবার নেই যেই কোনো গন্তব্যকণা
আছে শুধু একটি আকাশ।
তারই কিছু আলো-নীল আলো হে সুদূরতমা
ভালবেসে তোমাকে বিলাব।'

শামসুর রাহমানের কবিতার সাবলীলতার কথা বাদ দিলে যা চোখে পড়ে তা হলো তাঁর ঘনসংবদ্ধ মনের পরিচয়। নিশ্চয়ই আজ আমরা সাম্রাজ্য প্রশস্তির গান শুনতে চাইনা কবিকণ্ঠে। অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় ও আতঙ্ক তাঁর কবিতায় কখনো বিষাদ কখনো ঘৃণা হয়ে উচ্চারিত হয়।

'সন্তাপ এনেছি ব'য়ে অন্তহীন আশ্চর্য বিষাদে।
যেহেতু সে বিষাদের মূলে কোটে আতঙ্কের ফুল,
আমার সান্নিধ্যে কেউ যেঁষেনা সহজে, ভয় পাছে
তাদের শিয়রে সাথে লিখির বিষণ্ণ অন্ধকার।' (পৃষ্ঠা-৩)

কোনো একজন কবির নিকট আমরা যে সংহতি ও একাগ্রতা প্রত্যাশা করি, নবীন কবির পক্ষে তা সর্বথা সম্ভবপর নয়। দুটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় এই সংকলনের বহুক্ষেত্রে পাওয়া যায়—কবির একটি সত্তা মসৃণ ভালবাসার কণ্ঠলীন হতে চায়, ক্ষুব্ধ অনুরাগ বিরাগের স্পর্শে পূর্ণ হয়ে উঠবে ভাবে, স্পষ্টত বলে ফেলে :

'তোমার হাতের স্পর্শ, কপালের টিপ,
তোমার কণ্ঠের ভগভগ ঘামি, হাসি, কালো
চুল আর অতল চোখের দুটি শিখা দিতে পারে যত আলো
তত আর দেহ মাঝো অন্য কোনো জ্বালের প্রদীপ।' (পৃঃ ১৩)

এরই পাশাপাশি আরেক সত্তা প্রশ্ন করে ভয়ত্রাস্ত অস্থির শিল্পীর গলায় :

'যখন যন্ত্রের মিস্ত্রী আবালবৃদ্ধ বণিতা সবাই
ক্লান্তিতে আদিম নিদ্রায় মগ্ন অকাতরে, আমি কেন শুধু
শয়তানের মতো এক বদ্ধ ঘরে করি পায়চারি'··· (পৃঃ ৪৪)

তাঁর ভালবাসার সাজানো 'চুলের ছায়া, নিঃশ্বাসের সুগন্ধি তাপ' সব বিলুপ্ত হয়ে যায়—কবি বুঝতে পারেন,

'জেনেছি আমার পথ সব কিছু নিষিদ্ধ সকল :

উপরন্তু সর্বনাশা বৃষ্টির নিহিত পরিণামে
বুকের পঞ্জর ছিঁড়ে দিবে স্নেহে দুর্জয় শাসনে' (পৃঃ ৪৫)

এই সত্য যখন উপলব্ধি করেছেন কবি, তখন বিশ্বাস রাখি তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ আমাদের আরো উন্নত শিল্পসম্বন্ধের সঙ্গে পরিচিতি ঘটাবে।

শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় 'অজ্ঞাতবাস' কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। অতি সতর্ক ও কুণ্ঠিত পদক্ষেপে তিনি চলাফেরা করছেন, এমনি একটা ধারণা হতে পারে পাঠকের। তাঁর সঞ্চয় নিতান্ত কম নয়, কর্ষের ওপরও অধিকার জন্মেছে। তবু কোথায় যেন একটা অতিরিক্ত নিয়মতান্ত্রিকতার চিহ্ন লেগে আছে। বস্তুত আমরা কবিতাকে চাইছি আরো মুক্ত বাতাসে, পিঠ ছড়ানো এলো চুলে, দৈনন্দিনের প্রসাধনহীন মুখশ্রীতে। কবিও নিশ্চয়ই সেই স্তরে উত্তীর্ণ হবার প্রত্যাশী, অন্তত তাঁর সাম্প্রতিক কবিতায় সেই বোধটি সূচিত হচ্ছে। কিন্তু আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে তিনি সেই অনুভূতির ইঙ্গিতটুকু রেখেই ক্ষান্ত হয়েছেন। 'চেনা চেনা' কবিতায় 'অন্ধকারের চেনা চেলায় ভাসিয়ে দিয়ে মন' তিনি যখন লেখেন 'সুখ আমার সুখেরই নির্ঘোষ' তখন তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি সেরিয়ে এক সার্বিক সত্য আমাদের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু পরবর্তী পংক্তির 'অমৃত করো আমার ক্রুর বিষে' কেমন সাজানো, কবিতার জন্যে কবিতা মনে হয়। যে কবি 'পরিচিত' অথবা 'একটি অন্ধকার' এর মত কবিতা লিখতে পারেন, তিনি কেন এই অন্ত্যমিলের শৃঙ্খলে নিজের কাব্যশক্তিকে আবদ্ধ রাখেন? শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ এটি। ইতিমধ্যে তিনি বহু কবিতা লিখেছেন যেখানে ভাব ও ভাষা অদ্বৈতসত্তা হয়ে উঠেছে। আশা করি আরেকটি কাব্যসঙ্কলন প্রকাশ করে তাঁর প্রথম পদক্ষেপের দুর্বলতার চিহ্ন মুছে দেবেন।

'অন্ত এক সমুদ্র' শান্তিকুমার ঘোষের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ বলেই আগ্রহভরে বইটি হাতে নিয়েছিলাম। সুদৃশ্য প্রচ্ছদ, দামী নীহারপ্রতিম কাগজ, অতি পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ সত্ত্বেও কেন যে কাব্যগ্রন্থটি আমাকে অভ্যর্থনার আনন্দ দিতে সক্ষম হলো না তা ভাবতে কষ্ট হলো। শান্তিকুমার অসতর্ক অসচেতন লেখক নন, পঞ্চাশের তরুণ কবিদের মধ্যে তাঁর মৌলিক কণ্ঠস্বর একাধিক বার শ্রুত হয়েছে। তিনি এর আগে দুটি কাব্যগ্রন্থে নিজের দৃষ্টিকোণ প্রতিষ্ঠা করেছেন, আমি এখনো তাঁর একাধিক কবিতা মনে আনতে পারি যেখানে

শান্তিকুমার কোনো সকল গলার গায়ক নন। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতায় দেশদেশান্তরের বাসিন্দ বিস্তার, সাহসাদপের ছায়া অথবা বন্ধুবান্ধবীর স্পর্শ ও গান অবলীলাক্রমে ব্যবহার করেছেন। শান্তিকুমারের তায় সৎ কবি কখন একবারো দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে লেখেন—

'তিন-মুক্ত-তিন-নয় উচ্চতার অকস্মাৎ দেখে বৈষয়িক' (পৃঃ ১৬)

'ওয়াই অ্যাণ্ড' কবিতায়

'সম্পূর্ণতা···ছুঁয়েছি কি রাত্রির যন্ত্রণাকন্ত চতুর্দশের শেষে' (পৃঃ ২৪)

অথবা Roger Woledge-কে

'বিগত বছরে লীন বিপথি সন্ধ্যার মেলা, কাচের আধারে মদ, সিম্ফনিক ঢেউ'

তখন অসহায় বোধ না করে পারি না। অথচ বিস্ময়ের কথা, এই কবির সজ্ঞোদ্ভূক পংক্তি রচনার বিরলক্ষমতার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে এই গ্রন্থে।

'তুমি আগে চলো, বন্ধু, রক্ত দাপে ভেঙে—
এই দুর্গের আড়ালে সমুদ্রের ছবি আছে :
উদ্যান হাওয়া আর ঢেউ :
হৃদয়কে মেলে দেবো দূরান্ত বিস্ময়ে।'

··· ··· ··· ···

'তাই আগে এসো, বন্ধু, মৃত্যুর অতীতে
সন্ধ্যার সমুদ্র বেয়ে
নিস্তব্ধ বেদনা
বন্দিনী জগৎ ছেড়ে প্রান্তরান্ত বালক চলে অনিমেষ লোকে।'

কাব্য ক্ষমতার এই সঞ্চারিত আভা নিরীক্ষণ করেই তাঁকে এ বিষয়ে আরেকটু সচেতন হতে বলি।

মানস রায়চৌধুরী

ঝাতাবরণ—অসিতকুমার ভট্টাচার্য । কবিতা পরিষদ । কলিকাতা-১২
বিদ্যুল্লেখা—অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় । কবিতা মেলা । কলিকাতা-৯
কালীঘাটের পট—শান্তি লাহিড়ী । ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস্ । কলিঃ-১
সেই অন্ধকার প্রথম আলো : আশিস সান্যাল । গ্রন্থবিতান । কলিঃ-২৬

'ঝাতাবরণে'র কবি কাব্যক্ষেত্রে ইদানীংকালে প্রবেশ করেন নি—উন্মেষযোগ্য বেশ কিছুকাল ধরে তিনি কাব্যচর্চায় ব্যাপৃত আছেন। অবশ্য সে সময় কবির আত্মপ্রকাশের কোলেমাত্র স্বনামের আশ্রয় ছিল কিন্তু বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশকালে স্বনামের সঙ্গে কৌলিক পদবী সংযুক্ত করেছেন। 'ঝাতাবরণ' অসিতকুমারের সংকলিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার ভট্টাচার্যের বিগত এক যুগের ফসলের সকলন 'ঝাতাবরণ'। প্রচ্ছদপট, ত্রৈতিকাল, অনাগতচক্র এবং উত্তরপদ প্রভৃতি চারি খণ্ডে সমাপ্ত এই সংকলনে সন্নিবিষ্ট মোট ছিয়াত্তরটি কবিতার রচনাকাল উনিশ শ সাত পর্যন্ত। নাতিদীর্ঘ কবি বিবেচনা করেছেন, সময় তথা অসময়ের ছাপ এদের অবয়বে স্পষ্ট। এবং কে না জানে, সময়, ব্যক্তিমানসে বৈচিত্র্যরূপে ধরা দেয়। বৈশোরের স্ফুট-অস্ফুট আশা-আকাঙ্ক্ষার রৌদ্র-ছায়াময় প্রহরগুলি অতিক্রম করে যৌবনের আঘাত-প্রত্যাঘাতের পৃথিবীতে তার যে পরিচয়, তাকে ব্যক্তিগত বলতে আমার বাধে না।' এবং 'অন্তপক্ষে বিংশ শতকের মধ্যভাগে বাংলাদেশ যে সব বিপুল বিপর্যয়ের দায়িক—দুর্ভিক্ষ, মারী, দেশ বিভাগ ও তজ্জনিত সামাজিক তাণ্ডব, সেখানে তার সাধিক সত্তা অন্যসকলের মত আমাকেও পীড়িত, পাগল করে।'—অস্তিত্বের বর্তমান বৈতাবৈত সত্তা কবির ভাবনার মধ্যে বিশেষ উদ্ভাসিত :

এবং, 'আমি আমি শান্তি নেই, শান্তি নেই সংগ্রামে বিরামে,
আমি আমি মুক্তি নেই, মুক্তি নেই জয়ে-পরাজয়ে,—
উল্লাসের অন্তরালে ধ্বনিবার অভিশাপ আমি।' (উদ্যোগপর্ব)

আবার, 'মুক্তি চাই, মুক্ত দেশকালে
সূর্যকলসের বুকে, উজ্জীবন্ত উজ্জ্বল সকালে, ০ ০
ক্রুদ্ধ পৃথিবীর বুকে, জন্তুরঙ্গে,—ডালে ও তমালে।' (একুশে ১)

অসিতকুমার ভট্টাচার্যের কাব্যভাবনার মধ্যে এক অন্তহীন অন্বেষণের গভীর

পরীক্ষা লক্ষ্য করা যায় কিন্তু তাঁর বিভিন্ন খণ্ডাংশে কাব্যতাবনার বিশিষ্ট বিচরণে রসপ্রকৃতি নির্ণয়ে স্বভাবতই সাধারণ পাঠক কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। স্বাতাবরণের কবি মূলতঃ রোমান্টিক চেতনার কবি। রোমাঞ্চোদ্দি চিত্তে চিত্তে কমলের মমতায় তিনি পৃথিবীর আবাদলাভে আগ্রহী; আকাশের যবনিকা ভেদ করে আলোর আবির্ভাব হবে বলেই কবির কণ্ঠ গানে বিভোর। মুগ্ধ বিস্ময়ে নিখিলের আশ্চর্য রূপাবৃত আবাদনে কবির অনুরাগ :

(ক) 'এঁকে বেঁকে যায় একটি নদী।
পৃথিবী ছায়ায় মন্ত্র লিখে,
জল বালু আর আকাশ মিলে
একাকার। শীত রৌদ্রাবোধী।
তুমি শুধু চেয়ে দেখতে যদি।'

(চিলিমপুরের ঘাট : ভ্রাম্যমাণ।)

এবং (খ) 'যখনই তুমি মেলি হাওয়ায় হাওয়ায় আগমনী।' (ভোর)

কবি রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখার পর অনুভব করেন 'এখানে আকাশ পাবো আলোকে আনন্দ-উচ্ছ্বাস।' মানসীমুখে কাব্যপ্রকরণ প্রসঙ্গে কবি স্পষ্টতই থাকার করেছেন,...'যা বহু-জন-অনুসৃত এমন কোন রীতির প্রতিধ্বনি যেমন স্বাভাবিক, যা আদৌ অব্যবহার্য শুধু নূতনত্বের প্রয়োজনে তার পৌনঃপুনিক উচ্চারণ হাস্যকর। বস্তুতঃ নির্ভর করেছি আবেগের সততা ও চিন্তার যাথার্থ্যের উপর', আধুনিক কাব্যের স্বপক্ষে কবির বর্তমান বক্তব্য যদিও সাহিত্যের সমর্থনযোগ্য তথাপি আলোচ্য কাব্যগ্রন্থখানি পাঠের পর একটি জিজ্ঞাসাই জাগ্রত হয় যে কবি আধুনিক কাব্যপ্রকরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন বলে নিজেকে প্রমাণে সচেষ্ট হলেও তাঁর দীর্ঘ বারো বছরের একত্রিত ফসলে, আঙ্গিকের স্তরে তাঁকে অনুচ্ছল মনে হবে কেন? সংকলনে সমস্ত কবিতা গ্রন্থিত করবার পূর্বে মুদ্রণ চরিত্র বিবেচনায় কিঞ্চিৎ পরিবর্জন, পরিমার্জন ইত্যাদি করবার যথেষ্ট অবকাশ ছিল (সমস্ত কবিতারই যে স্বতঃস্ফূর্ত যন্ত্রণা থেকে জন্ম এমনটি মনে করবার কোনো-ই কারণ নেই)। এবং তা করলে 'স্বাতাবরণে'র নিজস্ব একান্ত জগৎ আরো রমণীয় হতে পারতো। ছন্দোবিভাগে মাত্রা-প্রধান ছন্দে তিনি যতখানি স্বাভাবিক সেই অনুপাতে অন্য ছন্দের আঙ্গিকায়, বিশেষ করে গদ্যের ঢালের পদক্ষেপে তিনি কিঞ্চিৎ শিথিল। দীর্ঘকাল কাব্য-

চর্চায় দিনি ব্যাপৃত এবং আধুনিক কাব্যপ্রকরণের পরিচয় যাঁর অজ্ঞাত নয়, তাঁর প্রতি আমাদের অকৃতর আশা সোবণ স্বাভাবিক কারণেই।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় এই দশকের তরুণ কবিদের মধ্যে অন্যতম; 'বিষুবরেখা' বর্তমান কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্য-সংকলন। 'বিষুবরেখার আলো সম্পূর্ণ দিতে চেয়েছি আমি। আমার সৃষ্টি। আমার সৃষ্টির সুখ দুঃখগুলো নাও, বলেছি, অরণ্যের উল্লাসে চলো যাই। পাতা জল ধুলো একাকার করে করে আদুল আকাশে, গভীর নির্ঝরে চলে যেতে চাইলে; তোমার শিকড়ে বাঁধলাম, অস্থির হবে না। আলোড়ন থেকে প্রশান্তায় যাবো অস্তির কল্লোলে।' (তোমার আমার মধ্যে)—পরিবেশের হাওয়ায় কবি মন্ত হতে উৎসুক এবং অনুদগ্ন যেহেতু সমাজের ও কালের শোকে আসন্ন রোদ্দুরে বিষণ্ণতার পরিবেশের দিকে অকৃতর প্রত্যাশায় দু'চোখ তুলে, সেহেতু সেই অনুপ্রাস প্রেক্ষিতে শ্রীযুক্ত অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়েরও স্বীয় সৃষ্টি সম্পর্কে বিশ্বাস 'যেন পারিপার্শ্বিক অনুষঙ্গের রক্ত পায়।'

'বিষুবরেখা' এবং 'অগ্রহায়ণ' এই দুটি পর্বে মোট চুয়াল্লিশটি ছোট-বড় কবিতায় সন্নিবেশিত 'বিষুবরেখা' কাব্যগ্রন্থে। নিবিষ্ট পাঠক সকৌতূহলে 'বিষুব-রেখা'র কবিতাবলী পাঠ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন যে, বর্তমান দশকের তরুণ কবিমহল যে এক অকৃতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিশেষ ভাবনায় ব্যাপৃত, বিশেষ করে হৃদয়ের সঙ্গে মস্তিষ্কের উপক্রমণ, প্রতীকী সৌরব, অচলিত শব্দপুঞ্জের প্রতি অভিযোগপ্রবণতা কিংবা পদ সংযোজনে সৌখিনতা, চিত্রকল্পে বিশেষ রীতি আরোপের কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে যে বিহ্বলতার অভিযোগ কিছুকাল পূর্বেও সাধারণ পাঠকের মনে আলোড়নের ঢেউ তুলেছিল, সুখের কথা, কালের সেই ছায়ালোকে অবস্থান করেও অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় নিজেকে সম্পূর্ণ না হলেও কিছু পরিমাণে পৃথক প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

সূক্ষ্ম উপলব্ধি এবং রোমান্টিক চেতনায় 'বিষুবরেখা'র কবির অভিব্যক্তি-সুপরিস্ফুট :

এবং, 'আমি যে সবাইকে প্লাবিত উৎসবে নিয়ে যাবো বলেছিলাম, যেখানে সেই চল-নামা রোদ্দুরের নদী।

আমি যে বলেছিলাম।' (সুবর্ণরেখার দিকে)

এবং পরিশেষে, 'আমি দূরত্বের দিকে যেতে চাই।' (একটি বিন্দুর থেকে)

যে ইম্প্রেশনিজম আধুনিক কবিতার শিরা-উপশিরায় সঞ্চারিত, সেই বিশেষ অভিব্যক্তিবাদে বর্তমান কবিও যথেষ্ট নির্ভরশীল। কিন্তু কষ্টকল্পিত চিত্রকল্প এবং তৎসহ তথাকথিত অ্যাবষ্ট্রাক্ট ভাবানুষঙ্গের সঙ্গে নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক কাব্যরস পর্যায়ভুক্ত নয়—এই সাধারণ স্বীকারোক্তিতে নিশ্চয়ই কারো আপত্তি নেই। বর্তমান কবি এই বক্তব্যে আস্থাশীল থাকা সত্ত্বেও, লক্ষ্য করা গেল কোথাও কোথাও তিনি তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসমন্ত্রে বিচলিত করতে পারেন নি। বলা বাহুল্য, সাধারণ কাব্যপাঠকের এ কথা অজানা নয় যে কেবলমাত্র আঙ্গিক সর্বস্বতার স্বকীয় মরুদিগন্তে একদা ঘুমন্ত হতে বাধ্য এবং বলা যেতে পারে সৎ এবং স্বাভাবিক সৃষ্টির প্রথমতম গর্ভ মোহ থেকে ক্রম-উত্তরণ। তরুণার কথা অবিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের অভিব্যক্তি ক্ষেত্রবিশেষে অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক, কালের যন্ত্রণা মাঝে মাঝে হৃদয়কে স্পর্শ করে।

(ক) মুহূর্ত পটের মুখ জননী আকাশ। (কন্যাকুমারী)

এবং 'সকল জনম ভ'রে কোথোধামে নদী ছিল মগ্ন সন্ধিৎসা।
লম্বিত জানালার পাশে এখনো কে অনির্দেশ হাটে;
শালি বেয়ে শুধু চলে। বৃষ্টি, রোদ। অবিকল আঙুল কপাটে
মিশলক চোখ রাখি।
ছোটবেলাকার নাম বলো, সহজিয়া।' (মধ্যাহ্নভূমিকা)

এছাড়া প্রসঙ্গত প্রতিভাসের মুক্তি, চলচ্চিত্র, প্রাক্তন উত্তিদ, পাটনিশীথের মুখ, দু'একটী পেঁপে অন্নমৃত্যু ইত্যাদি কবিতাগুলি স্মর্তব্য। গদ্য কবিতার কথা বলতে শ্রীযুক্ত অরুণ মিত্রের 'উৎসের দিকে' কাব্যগ্রন্থের এবং তার পরবর্তী কালের কবিতার বিশেষ গদ্যরীতির প্রভাব যদিও দুর্লক্ষ্য নয়, স্বীকার করতে শুধু কুণ্ঠা নেই, 'বিষুবরেখা'র কবির 'পর আমরা আস্থা রাখি। চৌরঙ্গত স্বভাবে নয়, স্বকীয় কাব্যভাবনায় তাঁর পরবর্তী কদম উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

'কালীঘাটের পটে'র কবি শ্রীযুক্ত শান্তি লাহিড়ীর মধ্যে সহজ রোমান্টিক মেজাজ পাঠক সহজেই আবিষ্কার করবেন। 'বিষুবরেখা'র কবি তাঁর কাব্য-বিষয়কে যতখানি মস্তিষ্কগ্রাহ্য করতে প্রয়াসী সেই তুলনায় আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের কবির আকুতি হৃদয়কে স্পর্শ করবার জন্য। তথাকথিত নাগরিকতা পরিহার এবং সহজ অথচ রোমান্টিক আলপনা রচনার মধ্য দিয়ে কবি ধনিষ্ঠ হবার চেষ্টা

করেছেন এবং বিশেষ চিত্তনির্মিত স্মৃতিধূসর পরিবেশ রচনাতেই তাঁর পরিতৃপ্তি :

'আগামী পৃথিবী আছে কাল পেতে, তাকে বলাধিক ;
কালেই ফুরাও আলা, আবার তো যেতে হবে
দীর্ঘতর পথের সন্ধানে।' (যাযাবর)

আবার, 'নীরব একটি দিন, মিটোল পাখির কথাকলি,
একটি নিষ্কৃত গ্রাম—যেন একটি স্নিগ্ধ পদাবলী (অনুরাধাপুরের দৃশ্যে)

কালের যন্ত্রণা, দ্বন্দ্ব, যা অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় বা অসিতকুমার ভট্টাচার্যকে মাঝে মাঝে অস্থির করেছে, বস্তুতান্ত্রিকতার প্রবৃত্তি কাব্যভাবনার সঙ্কীর্ণতায় হয়ে আবেগবর্জিত মডল রচনার সাহায্য করেছে, তা 'কালীঘাটের পটে' মূর্ত না হলেও আবেগপ্লাবিত নয়, এবং অধিকাংশক্ষেত্রে কেবলমাত্র স্মৃতি-চারণের প্রতিই কবির পক্ষপাত প্রকট। 'সাতাবাহার বিস্মৃতির মুখ,' স্মৃতি, অভ্র, একটী দুঃখের কবিতা, পৃথিবীর অন্ত দেওয়াল লিপি' প্রভৃতি প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আকাশ মাটি'তে প্রচলিত অর্থে তিনি যে পরিমাণ কথাবাহিলাদী ছিলেন, আশার কথা, 'কালীঘাটের পটে' তিনি আনুপাতিক পরিবর্তিত চরিত্রের পরিচয় রাখবার চেষ্টা করেছেন। 'স্মৃতি' 'ঈশ্বর' 'রাধা' 'মৃত্যু' 'নদী' প্রভৃতি প্রতীকী শব্দের মাধ্যমে নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে কবি সচেষ্ট। শব্দ প্রয়োগ, বাক্যবিন্যাস এবং চিত্রকল্পার ক্ষেত্রে তাঁর মূলানুগ পরিমণ্ডল রচনার পরিশ্রম প্রশংসার্হ ; কিন্তু মাঝে মাঝে শুধুমাত্র রবীন্দ্রীয় পংক্তি রচনার ঝোঁক কিন্তু মনকে পীড়িত করে। একটি বিষয়ে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করি ; 'একটি মৃত্যে' উল্লেখ আছে—'অনন্ত নায়ক খুঁজলে মুকুতা শুধুই একটা মেলে।' নায়কের মধ্যে মুকুতা সন্ধান—এটি কি মিলিল।

আলোচ্য সংকলনে একটি নাট্যকাব্য সংযোজিত হয়েছে। 'একটি মৃত্য'। প্রতীকী হলেও নাট্যরস অপেক্ষা কাব্যরসই 'একটি মৃত্যের' প্রধান উপজীব্য। 'একটি মৃত্যে'র প্রতীকী সত্তার তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষণীয় ; যদিও সংলাপ আরো সংহত হবার অপেক্ষা রাখে।

কাব্যক্ষেত্রে 'শেষ অন্ধকার : প্রথম আলো'র কবি শ্রীযুক্ত আশিস সান্যাল অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং বর্তমান আলোচনা পর্বের কবিদের মধ্যে কনিষ্ঠতম ; এবং কাব্যের আঙিনায় একটি নতুন নামও বলা যেতে পারে। ইতস্তত: প্রকাশিত তাঁর কবিতার পরিমাণ অপ্রচুর নয় কিন্তু সংকলিত গ্রন্থ এই প্রথম।

'শেষ অন্ধকার : প্রথম আলোর কবি আধুনিক কাব্যপ্রকরণকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন ; তৎসহ, যুগের যন্ত্রণা তাঁর কাব্যশরীরে যদিচ অনুচ্চারিত নয় এবং এক রোমান্টিক বেদনাবোধ কবিতাবলীর মধ্যে আকর্ষ রূপ পরিগ্রহ করলেও ক্ষেত্রবিশেষে প্রাথমিক পর্যায়ের ভাবাবেগকে অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। অন্তত: বর্তমান সংকলনে। প্রদীপ্ত রোমান্টিক, উৎসের প্রতি, হাওয়ার নির্জন শব্দে, সে, আজকার হাওয়ার গভীরে, জ্যোতিষ্মতী প্রেমিকের হাতে' প্রভৃতি প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতা এবং কবির বিশিষ্ট ভাব ও ভাবনার প্রতীক।

'উৎসের প্রতি' কবিতাটি বর্তমান সংকলনের বিশিষ্ট রচনা এবং ভাব-ভাবনা ও বেদনাময় অনুভূতির উৎকৃষ্ট ফসল :

আমার সর্বস্ব দিয়ে আজ আমি ফিরে যাবো দূরে
হে নৌকা শ্রীহীন কণ্ঠ হে গাঢ় বিষাদ
সব রেখে সুদূরান্ত পথের গভীরে
ফিরে যাবো অন্ধকারে হে করুণাহীনা,
সম্পূর্ণ নাউস হবো বর্তমার কোন স্মৃতি মনে রাখবো না।'

আধুনিক কাব্যের প্রযুক্তিগত প্রকরণ বর্তমান কবি সযত্নে আয়ত্ত করেছেন। কিন্তু শুধুমাত্র প্রসাধনকলার দিকে নজর দিলে যা হয় এক্ষেত্রেও তার পরিবর্তিত ফলশ্রুতি ঘটেনি।

সাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে, সাম্প্রতের দাবিকে স্মরণ করে লেখা একাধিক কবিতা আলোচ্য সংকলনে স্থানলাভ করেছে (বাংলাকে দিয়ে, প্রতিদিন পঁচিশে বৈশাখ, অন্ধকার হাওয়ার গভীরে, প্রেমিক বন্ধু ভাই আমার)। 'প্রেমিক বন্ধু, ভাই আমার'এর আন্তরিকতা ও অনুভূতি পাঠকচিত্ত স্পর্শ করে ; যখন ভাইয়ের বুকের রক্তে চতুর্দিকে মনহারা পড়ে, তখন তাঁর প্রার্থনা, 'কারার তিমির থেকে সমস্ত আকাশ আলো হোক', এবং পরক্ষণেই উচ্চারণ করেন 'প্রেমিক বন্ধু ভাই আমার সুখ তোল।'

শেষ অন্ধকারের পর প্রথম আলোতেই তিনি বিশ্বাসী, প্রত্যাশী ; এবং পরিশেষে, তখনই তরণার কথা যখন তিনি হৃদয়ে এ কথাই লালন করেন :

আলোই অমোঘ সত্য—সত্য আর সৃষ্টিমুখী কলমের গান।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

আপন হতে বাহির হয়ে

প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও, তুমি আমার হও, আমার সমস্তকে অধিকার ক'রে তুমি আমার হও···সমস্ত অসংখ্য লোকলোকান্তর যুগ-যুগান্তরের উপর বিস্তৃত বিরাজমান যে পরম এক তুমি, সেই মহা এক তুমি, আমার মধ্যে আমার হও। "আত্মবোধ", শান্তিনিকেতন।

যে মুহূর্তে ব্যক্তির ভিতরে আত্মবিস্তারিত, পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত অসংখ্য শিরার সমস্তের উপ্রভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে, ভাবতে অবাক লাগে, সেটি এখনো রবীন্দ্রশতবার্ষিক-মুহূর্ত। 'ব্যক্তি' বলতে যদি একটি অমল প্রকাশ-ব্যাপার, একটি বলয়িত অভিব্যক্তিতত্ত্ব বুঝি, তবে আমরা মানতে বাধ্য, আজ আমাদের মধ্যে ব্যক্তির সংখ্যা নিষ্ঠুরভাবে কমে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, ব্যক্তি-বিশেষত্বের ঈশ্বর ও উপাসক রবীন্দ্রনাথ, সেই অমল প্রকাশতত্ত্বটিকে তাঁর জীবন ও বাণীতে ধারণ করে বেঁচেছিলেন, অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী সমস্তগুলি স্রোতঃ-পথ থেকে ধারা এনে সেই সর্বাধারী পরম একককে নিরন্তর সেচন করে গিয়েছিলেন—এই কথাটি আজ শুধুমাত্র উপপুরাণিক সত্য-কথায় পর্যবসিত হতে চলেছে। এরি ভিতরে যারা আমাদের কাছে সেই গোটা মানুষ রবীন্দ্রনাথের ছবিটি তুলে ধরবার প্রয়াস পাচ্ছেন, তাঁদের আমরা কৃতজ্ঞ স্বীকৃতি আমাদের আর কিছু না হোক, অন্ততঃ সুবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হবে।

সংগীত নাটক আকাদমির পক্ষ থেকে প্রকাশিত শতবার্ষিক সংখ্যাটি পড়ে বিহ্বল হয়েছি, এটা স্বীকার করতে কোনো কুণ্ঠা নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য সাহিত্য থেকে সঙ্গীতে, সঙ্গীত থেকে নাট্যশিল্পে কি রকম সহজ বিহার করেছেন, এই সংকলনের পাঠক সেই পরিচিত অথচ ইতিহাস্যে অস্পষ্ট ব্যাপারটিকে নতুন করে উপলব্ধি করবেন।

আলোচ্য সংকলনের প্রবন্ধগুলি এদিকে ওদিকে ছড়ানো ছিটানো ছিল। শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীক্ষিতীশ রায়—রবীন্দ্রচর্চার দুই নিষ্ঠাবান সাধক—প্রবন্ধগুলি শুধু সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত হননি, তাদের মধ্যে একটি ভাবৈক্যসূত্র আবিষ্কার ক'রে আমাদের উপহার দিয়েছেন। সেই ভাবসূত্রটি 'রবীন্দ্রনাথের

শিল্পী ব্যক্তিত্ব' বললে কথাটি নির্বস্তুক শোনাবে ; বরং, গীতিসচেতন ও নাট্য-সন্ধীত রবীন্দ্র প্রতিভার ঐতিহাসিক উৎস নির্ধারণই সেই অন্তঃশীল সূত্র।

গাছটি যদিও নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে, তবু সে চারিদিকের আকাশ বাতাসের কাছ থেকে প্রাণদ শক্তি সংগ্রহ ক'রে নেয়—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী তাঁর প্রবন্ধের এক জায়গায় এই কথা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন (পৃঃ ১৩) রবীন্দ্রনাথ কিভাবে মার্গসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতকে মেলাতে পেরেছিলেন, কি করে সত্তার অন্তর চাহিদাকে স্বচ্ছোনর সমগ্রতায় প্রকাশ করেছিলেন, সেই প্রক্রিয়া এই সংকলনের নানা নিবন্ধে সন্ধানযোগ্য। হয়তো লোকগীতিকে ক্লাসিক পর্যায়ে উন্নীত করতে পেরেছিলেন জয়দেবও, কিন্তু কবিপ্রকৃতির ত্রিলোকস্পর্শী রোমান্টিকতার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ আরো ব্যাপক এবং তীব্র। এবং রসৈশ্বর্যিক রোমান্টিকতাও নিজস্ব বিধায় গ্রহণীয়—যেমন, দুর্জটিপ্রসাদের ভাষায় আজকের রোমান্টিক আগামী কাল ক্লাসিক (পৃঃ ২০)। আর্যম বাকেও তাঁর অমূল্য ভাষণে রবীন্দ্রনাথের সেই সংক্রান্তিসাধী অবশ্য সংস্কারধর্মী ভূমিকাটি স্পষ্ট করে বলেছেন। বিভিন্ন প্রভাবকে অঙ্গীভূত করে রবীন্দ্রসংগীত কিভাবে তার তৃতীয় আসনে খুঁজে বার করেছিল, তার বিশ্লেষণ বিভিন্ন এই সংকলনের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। সংকলনিতাদের ধন্যবাদ, তাঁরা এই উদ্‌ঘাটনে রবীন্দ্রনাথকেও ব্যাখ্যাতার অংশ গ্রহণ করতে দিয়েছেন। অন্যান্যেরা হলেন, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, দুর্জটিপ্রসাদ ও আর্যম বাকে। উপস্থাপনার কৃতিত্বে মনে হয়, ইন্দিরা দেবীই যেন এই আলোচনা চক্রের সূত্রধার। বাংলা থেকে ইন্দিরা দেবীর অনূদিত The Place of Music in Education নামক প্রবন্ধটি Visva Bharati Quarterly থেকে সমুচিত পুনর্মুদ্রণের জন্য আমরা সম্পাদক মণ্ডলের কাছে কৃতজ্ঞ।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ, বলা বাহুল্য, তাঁর জগৎবন্দিত পিতার ব্যক্তি-জীবনের প্রস্তুতির বহু মূল্যবান তথ্যে সমৃদ্ধ। তাঁর On the Edges of Time নামক আত্মজীবনী থেকে নির্বাচিত এই পরিচ্ছেদটি শুধু ব্যক্তিগত সৌরভে নয়, সাহিত্য-সমীক্ষায় বহুমূল্য। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনপর্যায়ী নাট্যত্রয়ী শারদোৎসব, অচলায়তন এবং ফাল্গুনী যে প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের ক্লাসিকশ্রেণীয় নাটক (রাজা ও রাণী এবং বিসর্জন) এবং মরমী নাট্যপর্যায় অর্থাৎ ডাকঘর, রাজা ও তপতীর মধ্যে সংযোজক, রবীন্দ্রনাথের এই অনুমান

শিল্পবোধে সঙ্কীর্ণ (পৃ: ৩৭)। প্রভু ওই ঠাকুরত্তার অনুদা-অপ্রাপ্য গ্রন্থ The Bengali Drama থেকে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত Rabindranath The Dramatist নামক অংশটি পুনর্বার প্রকাশ ক'রে সম্পাদকেরা আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য প্রায়শই সাহিত্য বিচারকদের নিকট অনাদৃত। প্রতিমা ঠাকুরের Two Dance Dramas of Gurudeva শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের এই শিল্পধারার আদিকরহস্য আমাদের কাছে মেলে ধরেছে। পুলিনবিহারী সেন ও শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের কৃত রবীন্দ্রনাথের নাট্যপঞ্জীটি ছাত্র ও গবেষকদের কাছে অপরিহার্য। সমস্ত সৌরপথটি পরিক্রমা ক'রে আবার গানের কাছেই ফিরে এসেছেন দুজন সম্পাদক। 'গানের ভিতর দিয়ে দেখা' গানটির দ্বিতীয় স্তবক কৃত অনুবাদটি প্রত্যক্ষতায় সুন্দর।

অনেকগুলি সুমুদ্রিত চিত্র, আলোক-চিত্র ও খসড়া-চিত্র এই সংকলনের মর্যাদা বেড়েছে। মুখবন্ধে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, সম্ভবত, রবীন্দ্রনাথের দুটি অঙ্গভাব-চিত্র। একটিতে রবীন্দ্রনাথ গান করছেন, অন্যটিতে তিনি অভিনয় রত। এই দু'খানিই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা পেন্সিল স্কেচ। কয়েক মুহূর্তে রেখাঙ্কিত এই দুটি স্কেচ তরুণ রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ অনুধ্যানের চিত্রণে অসামান্য।

এরকম একখানি সংকলন এখন যথার্থই জরুরি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার যৌল বিন্দুটি যে বৃত্ত থেকে সুবৃহত্তর বৃত্তে প্রসারিত, এবং সেই বিস্তৃত বৃত্তমালার মূলে যে একটি ব্যক্তিই অধিষ্ঠিত—এই সংকলন পড়ে সেই ধারণা আরও দৃঢ় হয়।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

Sangeet Natak Akademi Bulletin Tagore Centenary Number: Edited by Pulinbehari Sen and Khitis Roy. Rupees Ten only.

আলোচনা

রবীন্দ্রনাথের উত্তরপক্ষ

১

বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের এক ক্রমেডীয় বিশ্লেষণ[১] আবিষ্কার করেছেন। ক্রমেডীয় বই কি? তিনি বলেছেন রবীন্দ্রনাথের যে পরিচিত মূর্তি—যে মূর্তি তিনি নিজেও অতি যত্ন সহকারে পরিপাটি করে এঁকেছেন—সৌম্য শান্ত ঋষি-কল্প ঊর্ধ্বচারী—সেটা হল তাঁর মুখোস। আসল চিত্রের মূর্তি ঠিক বিপরীত, এ মূর্তিটিও তিনি নিজেই এঁকেছেন, যদিও জানতেন না যে এ তাঁর নিজেরই মূর্তি (self-portrait)—যে মূর্তি ধরা দিয়েছে তাঁর অঙ্কিত চিত্রে—কালো, কুৎসিত, বিক্ষুব্ধ, বিকট।

ক্রমেড এই কথাই বলেছেন। মানুষের, মানুষ মাত্রেরই দুটি ভাগ—একটি উপরের আর একটি নীচের, একটি বাহ্য প্রকট সুসভ্য আর একটি আন্তর, গুপ্ত, অসভ্য। মানুষ চেতনায় মানুষ, কিন্তু অবচেতনায় এখনও পশু—পাশব বৃত্তি সব খেলছে তার গোপনে, সেই সবই তাকে চালায় প্রকৃতপক্ষে। তবে সে-সব বাইরে দেখা দেয় সুসভ্য আকার নিয়ে, পোষাকী আবরণে (এর নাম হল rationalisation)। মানুষের অধ্যাত্ম-ধর্ম, শিল্প-চর্চা, জ্ঞান-লিপ্সা সবই একটি আদিম পাশব লালসা (libido) থেকে রাখবার প্রয়াস। বহু পূর্বে যাকে বলা হত চেলসীর জ্ঞানী-দার্শনিক (the sage of Chelsea) সেই স্বনামধন্য Carlyle এই কথাই বলেছেন একটু অন্যভাবে, আরো স্পষ্ট এবং রূঢ়ভাবেই (graphically)। তিনি বলছেন মানুষ শিক্ষিত ও সভ্য তার পোষাকের জন্য শুধু—পোষাক ফেলে দাও, রয়ে যায় নগ্ন মানুষ, যে পশু মাত্র—তাতে আর

---

১ প্যারিসের Two Cities পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক প্রবন্ধটি এবং 'উত্তরসূরী' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীঅন্নদাশংকর রায় শ্রীক্ষিতিশ রায় ও উত্তরসূরী-সম্পাদকের আলোচনাগুলি এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

পশুতে কোন প্রভেদ নাই। তাঁর এই philosophy of clothes সুবিখ্যাত। রহস্য না করলেও জিমিবস্টির সত্যতা এক হিসাবে প্রাচীন অধ্যাত্ম-সাধকেরাও উপলব্ধি করে গিয়েছেন। কারণ সমস্ত অধ্যাত্ম সাধনারই লক্ষ্য হল, অন্ততঃ তার একটা প্রধান অঙ্গ হল, পশুভাব-বিলয়। শ্রীরামকৃষ্ণও একথাটা তাঁর স্বকীয় ভঙ্গীতে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। টিয়েপাখী খুব রাম নাম করে সদাসর্ব্বদা, কিন্তু যেই বেড়ালে তাকে ধপ্ করে ধরেছে, অমনি সব ভুলে গিয়ে তার মুখ দিয়ে বের হয় তার নিজস্ব ডাক—ক্যাঁ ক্যাঁ।

ফ্রয়েড তাঁর এই সাধারণ তত্ত্বটি ছাড়াও অতিরিক্ত দিয়েছেন একটা বিশেষ তত্ত্ব—তাঁর polarity বা বৈপরীত্য তত্ত্ব অর্থাৎ বাহিরে চেতনায় মানুষের যে বিশেষ একটা গুণ বা পুণ্য থাকে বা দেখা যায়, গোপনে অবচেতনার ঠিক তার বিপরীত দোষটি কি পাপটি থাকবে। বাহিরে আমি যদি হই দাতা, অন্তরতম প্রদেশে নিশ্চয় আমি কৃপণ, বাহিরে আমি যদি ধর্মানু ভিতরে নিশ্চয় আমি শিষ্টুর, বাহিরে আমি যদি চতুর ভিতরে আমি নির্ব্বোধ, বাহিরে আমি যদি সাধু ভিতরে আমি লম্পট। বাহিরে যে গুণ যতখানি আমার, ভিতরে তার দোষ ততখানি।

এই তথ্যটি যদি আমরা সত্য বলে, তাত্ত্বিক সত্য বলে স্বীকার করি—শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁর কামরেগের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন—তবুও ফ্রয়েডীয় দর্শনের অন্য অঙ্গটি স্বীকার করা যায় না। বাহির ও ভিতর, উপর ও নীচ, চেতন ও অবচেতন, দুটি দিক আছে স্বীকার করা গেল। কিন্তু এর থেকে সুতরাং বলে সিদ্ধান্ত করা চলে না যে অবচেতন বা নীচ বা গোপন অংশটাই প্রধান সত্য বা একমাত্র সত্য—অন্যটা মায়া বা কল্পনামাত্র। শ্রীঅরবিন্দ যেমন বলেছেন, পদ্মফুল ফুটে ওঠে পাঁকের ভিতর থেকে—বলতে হবে তবে পাঁকটাই আসল—আদি অকৃত্রিম সত্য আর পদ্মফুল হল মিথ্যা। তা নয়, কথা হল পঙ্কের মধ্যে রয়েছে পদ্মবীজ যদিও পঙ্ক থেকেই সে বীজ আহরণ করে তার উপযোগী আহার্য্য—সেই বীজ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে বাহিরে সূর্য্যালোকে পদ্মের সুষমা সৌন্দর্য্য নিয়ে। ঠিক সেই রকমই মানুষের আদিম প্রকৃতি হল অবচেতনা বা পশুভাব—কিন্তু তার আদি প্রকৃতি তা নয়; অবচেতনার অন্তরে রয়েছে পরাচেতনার বীজ, পশুর হৃদয়-কন্দরে লুক্কায়িত দেবশিশু। মানুষের বর্ত্তমান একটা মিশ্রিত বস্তু—পশুভাব-দেব-

ভাবের মিশ্রণ—পশুভাব ঊর্ধ্বগামী হয়ে চলেছে দেবভাবের দিকে—এই সংযোগ-স্থানে কেবল পশুকেই দেখলে একটা উৎকট প্রমাদ হয়।

রবীন্দ্রনাথ শান্তির স্থিতির কথা বলতে বলতে সেরে উঠেছেন—"আমি চঞ্চল হে"—বৈরাগ্যের কথা বলতে বলতে আলিঙ্গন করেছেন পৃথিবীকে, পার্থিব প্রেমকে—ঔপনিষদিক "ব্রহ্মা"র সঙ্গে এসে মিশিয়েছেন বৈষ্ণবিক সাধের, দেবদেবীর পূজার্চনার সঙ্গে কালাপাহাড়ী মূর্তি-দিয়েছেন, ভারতীয় আদর্শবাদের সঙ্গে খৃষ্টীয় দুঃখবাদ মিশিয়েছেন, উর্বশীকে আহ্বান করতে গিয়ে বিসর্জন করেছেন Venusকে, বৈষ্ণব-তিলক পরিয়েছেন খৃষ্টের ক্রুশের উপর।

এসব যদি সত্যিই হয় তবে কি প্রমাণ করে? রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলে গিয়েছেন তাঁর বীণার সরু ও মোটা তারের কথা, কড়ি ও কোমলের কথা। তাঁর মধ্যে, বিশ্ব মানুষেরই মধ্যে রয়েছে এই দ্বিধাবিভক্ততা—কিন্তু এ কথা বলার জন্যে মহাপণ্ডিতের, মহা গবেষণার কি প্রয়োজন ছিল? There needs no ghost, my lord, to tell us this.

রবীন্দ্রনাথের উপর আধুনিক, ইউরোপীয় এবং আরো সম্প্রতি কমিউনিষ্ট প্রভাব বা প্রলেপের অভিযোগ নূতন নয়। তবে নূতন শিরু হবে, যদি বলা যায় রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্য-সরীসৃপ আলখেল্লা সরিয়ে দিলে ভিতর থেকে বের হবে আসলে Bertrand Russel! এই জাতীয় দুষ্টুই বলবে চলত, গোটের বস্ত্রাপহরণ করলে দেখা যাবে অন্তরালে রয়েছে হিটলার, আর সাধু টলষ্টয় যদি তাঁর পোষাকটি হারিয়ে বসেন তবে দেখব সেখানে ষ্ট্যালিন। এই পর্য্যায়ের সিদ্ধান্ত দেখে-শুনে, বলুন ত, সুধীজন হাসবে না কাঁদবে।

২

পরে আমি দেখলাম, বুদ্ধদেব বসু নয়, সুধীন দত্তও অনুরূপ কথা বলেছেন। কে পূর্বসূরি কে উত্তরসূরি এঁদের আমি না—তবে বুঝলাম প্রতিক্রিয়াটি ব্যক্তিগত নয়, দলগত বা সম্প্রদায়গত। আধুনিক intelligentsia অর্থাৎ intellectuals বলতে যা বুঝি এঁরা তাই। যে প্রতিক্রিয়ার ফল উত্তর-রবীন্দ্রযুগে বাংলায় দেখা দিয়েছিল, উনিশ শতাব্দীর romanticism—বাদি (পর্যুদস্ত) রোমান্টিসিজম ছাড়া রবীন্দ্রনাথে আর কিছু দেখে নাই যে-দৃষ্টিভঙ্গি

—তাহি পরিপন্থ বিজ্ঞানরূপ আজ এই দেখা দিয়েছে। এ-চেতনা, এ-দৃষ্টিভঙ্গির নাম scientism।

প্রথম এক যুগে, রবীন্দ্রনাথ সবে যখন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন তখনও একটা প্রতিপক্ষ মাথা তুলে দাঁড়ায় সম্মুখে। আমি আমার এক প্রবন্ধে প্রতিপক্ষের এক তালিকা দিয়েছি। আজ যে অভিযোগ—J'accuse—আনা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে পূর্বতন অভিযোগ থেকে তা খুব ভিন্ন নয়, খুব নূতন কিছুও নয়—তবে রীতিটি, ভঙ্গিটি ভিন্ন এবং নূতন। আগেকার যুগের মানুষেরা সহজ সরল—তাদের ভাব ও ভাষা মোটা ধরণের ছিল—কোদালকে বলত কোদাল, কৃষিকর্মোপকরণ বলত না। আজকাল আমাদের মতিষ্ক শালিত সমৃদ্ধ হয়েছে 'ism'-সমূহে (টীকার 'বাদসমূহ')। সেখানে নেই শুধু একটি জিনিস—the one thing needful। খৃষ্টশিষ্যা মার্থা বহুল বিবিধ কার্যে নিজেকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে, কিন্তু মেরী রয়েছে শুধু একটি মাত্র অত্যাবশ্যকীয় বস্তুটি নিয়ে। Scientism অর্থ তাই—তার সব ঐশ্বর্য রয়েছে, সব বিদ্যা রয়েছে, যে জিনিস নাই তা হল আত্মবিদ্যা (Soul)। উপনিষদ-এ বলেছে ব্রহ্মোত্তরী বিদ্যা—ভগবানকে অন্তর্যামীকে অন্তঃপুরুষকে বাদ দিয়ে যে অপরা বিদ্যাবৈখরী।

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যত অভিযোগই আনা হোক না—সাম্প্রটা থেকে সৌম্য পর্যন্ত,—স্বীকার করি যদিই বা সেসব সত্য বস্তুধর্মিই হোক, শুধু যে কথাটি ভুললে চলবে না, যেটি ভুললে সব সিদ্ধান্ত ভুল হয়ে যাবে তা হল এই যে রবীন্দ্রনাথে রয়েছে soul, আত্মত অন্তঃপুরুষ—বিবেকানন্দ যাকে বলতেন আত্মত ব্রহ্ম, আর ওঁর সমালোচকবৃন্দ বেশির ভাগই যেমন ও-রসে বঞ্চিত। এই আত্মত অস্তিত্বের যার মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে তার সব কালিমা পুড়ে যায়—শুধু তাই নয়, দোষ সব গুণে রূপান্তরিত হয়।

৩

কেবলি কটুকথা কইতে চাই না। "ব্রজমিহস্তি বঞ্চিকা:"—শুধু বঞ্চিকা-বৃত্তি করতে চাই না, সুযোগও রয়েছে যখন হংসবৃত্তির কিছু অনুসরণ করতে। যাদের কথা বলছি ওঁরাও একান্ত বঞ্চিকাবৃত্তি অনুসরণ করেন নি দেখছি

অবশেষে। নিন্দার ভাগ যতই থাক, আর এক দিক দিয়ে তাঁরা প্রশংসাও করেছেন অজস্র এবং তা উল্লেখ না করা শালীন ও শোভন হবে না।

রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে এই তথাগোষ্ঠি যথার্থ গুণ-কীর্তন করেছেন। তাঁরাও বলেছেন স্থানীয় বা প্রাদেশিক ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-ভাষার পদবীতে তুলে ধরেছেন প্রায় তাঁর একক প্রতিভায়। আর বাংলার অন্তর্নিহিত ছন্দবৈভব ক্রমে যে ব্যক্ত করে ধরেছেন তাঁর নিজের সৃষ্টিতে সে এক অপরূপ অবদান।

এমন স্থান হতে এ হেন অকুণ্ঠ আন্তরিক তর্পণ রবীন্দ্রনাথের আত্মাকে কথঞ্চিৎ তৃপ্ত করবে বই কি।২

নলিনীকান্ত গুপ্ত

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে

রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে সংগীত মহলে সামান্য রকমের আলোচনা চলে। তাদের মধ্যে সবগুলিই যে পত্র-পত্রিকা কিংবা পুস্তকের মারফৎ আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা নয়। নেপথ্যে প্রচারিত সেইসব সমালোচনার দু'একটি এখানে আমরা উল্লেখ করবো, কেননা আমরা মনে করি যে, সেগুলি মোটেই অযৌক্তিক নয়।

রবীন্দ্রনাথ এতাবৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্তচরিতা; তদুপরি তিনি নিঃসন্দেহে ভারতের তথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরকার। কিন্তু এর মানে এই নয় যে,

---

২ বর্তমান আলোচনাটির জন্য আমরা শ্রীসত্য ভট্টাচার্যের নিকট কৃতজ্ঞ। যদিও "উত্তরসূরী"তে প্রকাশের জন্যই তিনি উক্ত লেখাটি পাঠিয়েছিলেন তবু শ্রীসত্য ভট্টাচার্যের অনুমতি ব্যতিরেকে ওটি আমাদের পত্রিকায় প্রকাশ করা সম্ভব হোতনা। সঃ উত্তরসূরী

তাঁর লেখা সহস্রাধিক গানের প্রত্যেকটিতেই কথা ও সুরের মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে। মামবিকভাবে তা ঘটা যোধ করি সম্ভবও নয়। রবীন্দ্রনাথের যেসব গানে কথা সুরের সার্থক সমন্বয় সাধিত হয়নি, সেখানে কিন্তু গুণগতভাবে কথা ও সুরের চেয়ে উচ্চতর সমতলে অবস্থান করেছে, এবং হয়ত একথাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে যে, কবি রবীন্দ্রনাথ সুরকার রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ঢের বড়। বাণী ও সুরের অসংগতির দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করতে পারি "যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই ঘাটে....." গানটির কথা। ভাবসমৃদ্ধ এই গানের পদের তুলনায় সুর কত দুর্বল, কত দরিদ্র—এত গভীর ধীরগতি বিশিষ্ট কবিতায় এত লঘুচঞ্চলগতিবিশিষ্ট সুর! যেকোন উপলব্ধিবান্ সংগীত শিল্পীর কানে এই অসংগতি বাজবে। তবে এই ধরণের দৃষ্টান্ত থেকে এমনতর সিদ্ধান্তে আসতে পারি না যে, সুরকে তাহলে পাল্টে নেওয়া হোক্।, কেননা, শুধু এই বাণী নয়, এই সুরও রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্যের অন্যতম প্রধান পরিচায়ক। অসংগতির অজুহাতে সুরকে বদলে দিতে চাওয়া হবে ঐ গানকে বর্জনেরই নামান্তর। ক্ষেত্রবিশেষে সুর ও বাণীর গরমিলের কথা এখানে উল্লেখ করা হল দুটি কারণে। প্রথমতঃ, রবীন্দ্রসংগীতের মূল্যায়নে এতদ্দেশীয় সমালোচকবৃন্দ আজ পর্যন্ত নির্জলা প্রশস্তির ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি, নির্দ্বিধে ক্ষেত্রবিশেষে রবীন্দ্রসংগীতের এহেন দুর্বলতার প্রতি দ্বিধাহীন অঙ্গুলি নির্দেশ করতে রাজী হন নি। দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রসংগীতের অগণিত ভক্তের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছেন যাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়া আর কোন গানই শ্রোতব্য নয়।

ক্ষেত্রবিশেষে রবীন্দ্রসংগীতের কোন কোন অংশ দুটি প্রায়োগিক (technical) দোষে দুষ্ট। প্রথমতঃ, এমন অনেক গান আছে যাদের অংশবিশেষ স্বরলিপি অনুযায়ী নিখুঁতভাবে গাওয়া শারীরিকভাবে (physically) সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন স্থলে স্বরলিপির মাত্রাবিন্যাস অনুযায়ী গাইলে গান বিস্তৃত হয় বটে, কিন্তু কবিতার ছন্দের সমতালে চলে না এবং ফলে কিছুটা শ্রুতিকটু হয়।

প্রথমোক্ত ত্রুটির দৃষ্টান্তস্বরূপ "যে রজনীদিন ধীরে বহিছে বাহিরে..." গানের তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনের স্বরলিপি (সর্বাধুনিক সংস্করণ প্রদত্ত) নীচে উদ্ধৃত করা হল :

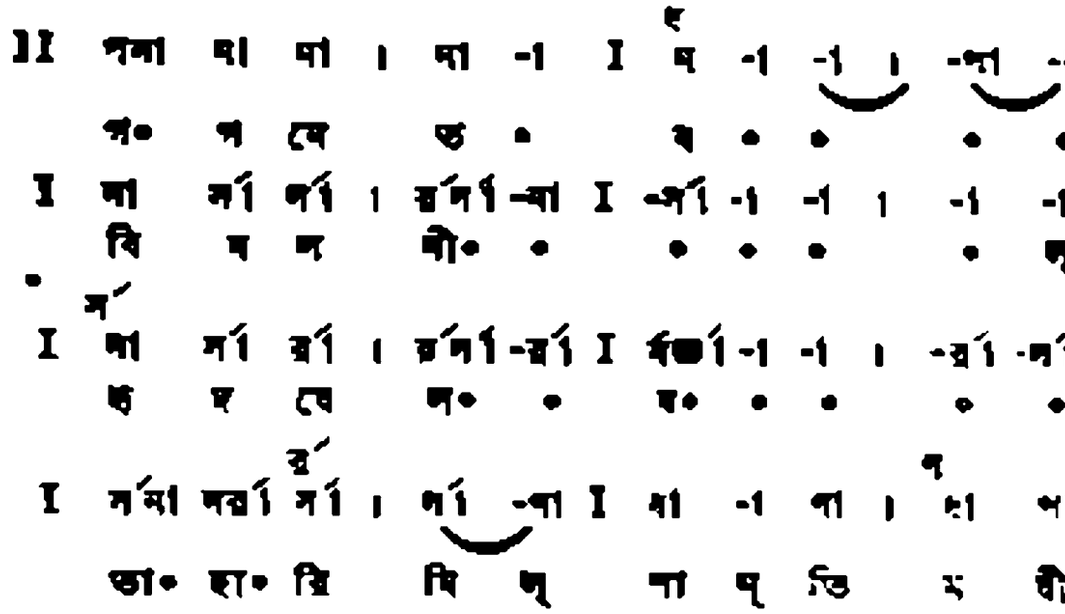

উপরের স্বরলিপি অনুযায়ী গাইতে গেলে দেখা যাবে যে, 'হৃদয়ে সব তারারি' পর্যন্ত গেয়ে 'মিল' শব্দটিতে স্বরকে ওভাবে গড়িয়ে নেওয়া যায় না, যদি না অব্যবহিত পরে আগের লাইনের 'নীল' শব্দের মত সম্পূর্ণ পাঁচটি মাত্রায় একটানা অবকাশ পাওয়া যায়। আসলে কার্যক্ষেত্রে যেভাবে ওই লাইনটি পাওয়া যায় তাতে স্বরলিপি দাঁড়ায়

বিকল্পে—

যদি স্বরলিপি-নির্দিষ্ট মীড়টিকে অনুযায়ী স্বরকে গড়িয়ে দিতে হয়, তবে বিস্তার সম্মত স্বরলিপি হবে

উপরের অতিরিক্ত মাত্রাযুক্ত স্বরলিপি যে বিজ্ঞানসম্মত তার একটি পরোক্ষ প্রমাণ হল এই যে, এবার 'গগনে তব বিমল নীল' এবং 'হৃদয়ে সব তারারি মিল' এই দুই লাইনের স্বরলিপিতে মাত্রাসংখ্যার সাম্য স্থাপিত হয়ে সংগীত বিন্যাস অনুযায়ী সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে [প্রত্যেক লাইনেই আমরা পেলাম মোট কুড়ি মাত্রা]।

প্রচলিত স্বরলিপি প্রদত্ত-মাত্রাবিভাগ (scansion) অনুযায়ী গাইলে রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গানের অংশবিশেষ শুনতে খুব ভাল লাগে না, কারণ ঐ মাত্রাবিভাগ কবিতা হিসাবে গানের মাত্রাবিভাগ থেকে বড় বেশী আলাদা। যেমন ধরুন, 'মনে রবে কি না রবে আমারে…' গানের সঞ্চারী অংশের চারটি লাইনের স্বরলিপি। লাইনগুলি হল :

"ফাগুনের ফুল যায় ঝরিয়া
ফাগুনের অবসানে—
কণিকের বুঠি দেয় ভরিয়া
আর কিছু নাহি আনে।"

বিশ্বভারতীপ্রদত্ত স্বরলিপি, আশা করি, রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগী অনেকেরই মনে পড়বে। কিন্তু লেখামকার মাত্রাবিভাগকে একটু অদলবদল করে যদি নিম্নোক্ত স্বরলিপিতে আমরা গাই, তবে আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস, গানটি আরও সুশ্রাব্য হয়, অথচ তার সুর বলতে গেলে ঠিকই থাকে—

II সা সা রা -া । রা -া -া -পা I মা -পা পা গা । মা -া -া -া I
ফা গু নে র্ ফু ০ ০ ল্ যা র্ ঝ রি যা ০ ০ ০

I গা মা পা -া । -া -া -া ধা I পা -ধপা ধা -া । -া -া -া -া I
ফা গু নে ০ ০০ র্ অ ব সা ০০ নে ০ ০ ০ ০ ০

I ধা ধা ধা -পা । -া -া পা পা I পধা -র্সা র্সার্সনা । র্ন র্সা -া পা -ধা I
ক ণি কে ০ ০০ ব্ বু ঠি দে০ য়্ ভ রি০ যা০ ০ আ র্

I পা পপা ধা পা । মা -পা মা -া I
কি ছু০ না হি আ ০ নে ০

অনিবার্যরূপে পরের লাইনের স্বরলিপি হবে

I মা পা মা মপা । ধা -া -া -া I ধা ধা পা -া । র্সা -া -া -া I
মু ন্না ই বে০ দি ০ ০ ন্ আ লো হ বে০ কী ০ ০ ণ্

['দিন' এবং 'কীণ' এর স্বরলিপির সাদৃশ্য লক্ষণীয়।]

রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই সব প্রায়োগিক দুর্বলতার জন্য কবিকে প্রধানতঃ দায়ী করা চলে না, কেননা অনেকেরই জানা আছে যে, গান তৈরী হয়ে গেলে

তাকে বরদাস্ত করার দায়িত্ব তিনি সাধারণতঃ অন্যকে দিতেন। কিন্তু দায়িত্ব যারই হোক না কেন, এই দুর্বলতাগুলি সারানো দরকার। বস্ত্র-বিতানের প্রত্যেক খণ্ডের নূতন সংস্করণে সামান্য অদলবদল চোখে পড়ে, আর তা থেকে মনে হয় যে, বিশ্বভারতী সংগীতপর্ষদ এক আধটু সংশোধনের দায়িত্ব নিয়েছেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও যথেষ্ট প্রাথমিক ত্রুটি সর্বাধুনিক সংস্করণের মারফৎ আমাদের কাছে এসে পৌঁচেছে। তাই আশঙ্কা হয়, বিশ্বভারতী সংগীতপর্ষদ এককভাবে এই দায়িত্ব সম্পূর্ণ পালন করতে সক্ষম হবেন না। এজন্য এমন একটি কমিটি গঠন করা উচিত যাতে শুধু বিশ্বভারতীর সংগীতবিশেষজ্ঞগণই থাকবেন না, বাইরের কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট সাময়িকও স্থান পাবেন,—আর তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে থাকবেন একজন বিশিষ্ট সুগীত সমালোচক, শাস্ত্রীয় সংগীতের একজন বিশিষ্ট শিল্পী, একজন বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক এবং একজন য়ুরোপীয় সংগীতবিশেষজ্ঞ।

অরুণ দত্তগুপ্ত

বিঃ দ্রঃ Census শব্দের উচ্চারণ সম্পর্কে শ্রীঅরুণ মিত্র পরবর্তী সংখ্যায় আলোচনা করবেন। সঃ উত্তরায়ণী

সাম্প্রতিক কাব্যচর্চা

মানস রায়চৌধুরীর	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
প্রথম কাব্যগ্রন্থ	কালপুরুষ ॥ জীবনায়ন
অনিদ্র সোপান	বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পরিমল চক্রবর্তী	দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ
নির্বাসন ॥ করুণা মন্ন	অনুলেখ

সমস্ত স্টলে ও পুস্তকালয়ে পাওয়া যাচ্ছে

অরুণকুমার সরকারের	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
দূরের আকাশ	নদীসিন্ধুর
অরুণ ভট্টাচার্যের	বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর
মিলিত সংসার	অন্ধকার বারান্দা

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৫০
টেম্পল প্রেস, ২ গোয়েঙ্কা লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

UNIVE

বিশেষ সংখ্যা :
সাময়িকপত্র ও বাংলা সাহিত্য

কবিতা সংগীত শিল্পচর্চা ও
সমালোচনার ত্রৈমাসিক মুখপত্র

সম্পাদক
অরুণ ভট্টাচার্য

উত্তরসূরী

বাঙালীর ঐতিহ্য ও শিল্পবোধ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাচীন সাহিত্য প্রবন্ধাবলীতে একস্থানে ইঙ্গিত করেছিলেন, সময় যেন প্রাচীনকাল থেকে ক্রমশঃ ইতর হয়ে আসছে। বস্তুতঃ আধুনিক সংস্কৃতির সবচেয়ে নির্মম নিয়তি এই যে মানুষ নিজেরই সৃষ্ট কলাকৌশলের কাছে বারবার পরাজয় স্বীকার করছে। ফলস্বরূপ তার অনুভূতির গাঢ়তা ও হৃদয়মনের শুচিতা ক্রমবর্ধমান যান্ত্রিকতার অচলায়তনে বিনষ্ট হচ্ছে।...

●

অথচ একদিন ছিল, মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনযাত্রাই এক একটি শিল্পরূপে ভাস্বর ছিল: তার চালচলন, ক্রিয়াকলাপ, যাগযজ্ঞ— সকল চর্চার মধ্যেই শিল্পকলার বিকাশ লক্ষ্য করা গেছে। দৈনন্দিন গৃহকর্মে, সাজসজ্জায়, আচার আচরণে ও আতিথেয়তায় যে পরিচ্ছন্ন রুচি ও শালীনতা, যে শুচিতা ও শিল্পবোধ প্রচ্ছন্ন থাকতো তা আজকের দিনে দুর্লভ।

পুরোনো কালকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, তবে তার ঐতিহ্যকে ধরে রাখা যায়, বর্তমানকে অতীতের উজ্জ্বল আলোয় উজ্জ্বলতর করা যায়। আমরা আধুনিক বিজ্ঞান ও জ্ঞানধারণাকে সহায় করে অতীতের গৌরবকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে চাই, জীবনকে উন্নততর ও স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল করে তুলতে চাই।

●

কেসি দাশ প্রাইভেট লিমিটেড

আবিষ্কারক—রসোমালাই

কলিকাতা - ৪

সংবাদপ্রভাকর

প্রত্যহিকপত্র

সংবাদপ্রভাকর

'সংবাদ প্রভাকর' এর প্রথম পৃষ্ঠা

উত্তরসূরী

নবম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯

সাময়িকপত্র ও বাংলা সাহিত্য : সূত্র-নির্ণয় প্রসঙ্গ

বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। অন্তত ইংরেজী সাহিত্যের তুলনায় হিসেব ধরলে তাকে নবীন যুবকও বলা চলে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এমন কয়েকটি প্রতিভা নতুন দিগ্‌দর্শনে আমাদের আলোকিত করলেন নতুন নতুন রাস্তা করলেন, সে কৈশোর যৌবন দেখতে দেখতে কেটে গেল ; বাংলা গদ্যসাহিত্য এখন রীতিমত প্রাপ্তবয়স্ক। নানা বিষয়ের, নানা ধাঁচের, নানা স্টাইলের লেখায় এখন সমৃদ্ধ, বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে এক আসনে বসবার অনায়াস যোগ্যতা সে লাভ করেছে।

যদিও বিদেশী মিশনারীদের প্রচেষ্টায় এর গোড়াপত্তন, শিক্ষিত বাঙালী সমাজ কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাকে মাতৃভাষা জ্ঞানে এর ঐতিবিধানে সচেষ্ট হলেন। সরকারী কাজে যে ভাষা ব্যবহৃত হ'ত তাই কালেদিনে সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তরিত হ'ল ; সংবাদপত্রে যার অঙ্কুর নির্গত হ'ল তাই পরবর্তীকালে সাময়িকপত্রে রূপ লাভ করল। আর এই অগ্রগতির ইতিহাস যেমনি বিস্ময়কর তেমনি দ্রুতগামী পটপরিবর্তনের এক নির্দেশক। বাঙালীর কাব্যস্তিত পরিবেশে গদ্যের যুক্তিবাদী মন তার সহজ স্থান করে নিল ; বিদ্রোহে নয়, নিশ্চিত আমন্ত্রণে। এই মিলনে বাঙালীর ভাষায় স্নিগ্ধতার সঙ্গে দীপ্তি, সরলতার সঙ্গে বহুতা এল। এবং একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা যে বাংলা ভাষাকে এই নতুন পথে নিয়ে যেতে সাময়িকপত্রের অবদান সৌধ নয়।

ইতিহাসের পাতা ওলটালে চোখে পড়ে সাময়িকপত্রের প্রথম প্রকাশের পেছনে তাগিদ ছিল সংবাদ সংগ্রহের ও সংবাদ পরিবেশনের। দিগ্‌দর্শন, সমাচারদর্পণ পরপর মাসে ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮৩১ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত তালিকা থেকে জানা যে প্রায় ত্রিশটি সংবাদ সাময়িক এই অল্পসময়ে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এই সকল পত্রিকা মূলত সংবাদধর্মী ; সাহিত্য

যে সাময়িকপত্রের মধ্য দিয়ে প্রচার লাভ করল সেটা পরবর্তী অধ্যায়ের কাহিনী। এর ফলে হয়ত সাহিত্যসৃষ্টির অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে সংবাদ জগতের একটা সূক্ষ্ম প্রভাব বিরাজ করেছে বলাযায়। তবু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে এরূপ প্রচারের ফলেই সাধারণ লোকের কাছে সাহিত্য ক্রমশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তৎকালে উনবিংশ শতকের গোড়া থেকে যেসব পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার প্রায় বেশীর ভাগ নামই সংবাদ-জড়িত। সুতরাং আশা করা অনুচিত যে তাতে সাহিত্য পরিবেশিত হবে। তথাপি সমাচারদর্পণে ছিটেফোটা সাহিত্য পরিবেশিত হয়েছে। নানাবিধ শিক্ষা ও সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হত। 'জ্ঞানান্বেষণ' নামেই যে শুধু একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তাই নয়, মুখ্যত জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যেই—সে যে প্রকার জ্ঞানলাভই হোক—সে সময় সকল পত্রিকার উদয়। কাজে সাহিত্য যে তৎকালে প্রায়ই এই সকল পত্রিকায় অনুপস্থিত থাকত তারও কারণ এই পটভূমিতে সহজেই অনুমেয়। কেননা সাহিত্যে জ্ঞানলাভ হলেও, সাহিত্যের উদ্দেশ্য জ্ঞানদান নয়, বরং মানব-জীবনের নানা অনুভূতি সমস্যা ও হৃদয়বৃত্তির কাহিনী সেখানে প্রধান। দুঃখ সুখ ভালোবাসার বর্ণনা সুতরাং, এখানে স্থানলাভ করেনি। একথাও অবশ্য সত্য, কাজে ব্যতিরেকে অন্য কোন সৃজনশীল সাহিত্য 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পূর্বে আমরা কি পেয়েছি? বিবিধার্থসংগ্রহে সৃজনধর্মী উত্তম সমালোচনা কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে অবশ্য। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুবাদ ও মাইকেলের কাব্যে, নাটকে যে আধুনিকতার সূত্রপাত হল বঙ্কিমচন্দ্রে এসে হল তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। সুতরাং তার পূর্বে যে সকল পত্রিকা তাতে "Pure literature" এর অনুপস্থিতি দুঃখদায়ক হলেও, ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে মেনে নিতে হয়।

অর্থাৎ বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্বে যে সকল সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছে তার মুখ্যত উদ্দেশ্য ছিল সংবাদ পরিবেশন, জ্ঞান-আহরণ ও জ্ঞান-বিতরণ। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম অনুভব করলেন সাহিত্যকে প্রচার করা সম্ভব জনসাধারণের মধ্যে এবং সেই সম্ভাবনা পত্রিকার মধ্য দিয়ে অবাস্তব নয়। অবশ্য বঙ্গদর্শনের আদর্শ ছিল আরো ব্যাপক ও মহৎ। বাঙালীর সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ইতিহাস ধর্ম সবকিছুকে জড়িয়ে এর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি তাঁর ধ্যানময় চোখে ধরা পড়েছিল। তবু উত্তরকালের সাহিত্যিকরা জেনেছেন যে বঙ্গদর্শনই প্রকৃত প্রস্তাবে সর্বপ্রথম সাময়িকপত্র যা একাধারে জ্ঞানান্বেষণ ও সাহিত্যরসে সম্পৃক্ত ছিল। মধ্যে মধ্যে এর প্রচার বন্ধ হলেও রবীন্দ্রনাথ এমন কি যোগীন্দ্রনাথ বসুমহাশয়ের সম্পাদনায় এর ধারা বজায় ছিল; এবং বরাবরই বঙ্কিম-প্রবর্তিত আদর্শকে কিন্তির সম্পাদক শিরোধার্য করে সৎসাহিত্যের উদ্দেশ্যে পত্রিকাটির সম্পাদনা করে গেছেন। হয়ত পরবর্তীকালের বিচারে বঙ্গদর্শন কোন সময় স্খলনশীলতার পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু বিরাট কালের বিচারে বঙ্গ-

দর্শন বাঙালী জাতি ও বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম পরিচালক, পথপ্রদর্শক ও দিগ্‌দর্শক। এই প্রথম আমরা জানলুম সাহিত্য একটা জাতির প্রাণের ভাষা। সর্বপ্রথম বুঝলুম মাতৃভাষা ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে কি প্রচণ্ড নৈতিক শক্তির আধার, জানলুম সাহিত্য জাতীয় সংস্কৃতির মেরুদণ্ড। এসকল শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন ; তার বৃহৎ অংশ বঙ্গদর্শন এর মধ্য দিয়েই। সেই থেকে বাংলা সাহিত্যে, সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র বা অন্যথা: শিল্পসাহিত্য বিষয়ক পত্রিকার পর্যায়ে উন্নীত হ'ল, এই দুটি ধারা পাশাপাশি চলতে থাকলো এবং বিশ শতকের মধ্যভাগ অতিক্রম করে আমরা দেখেছি শুধুমাত্র সমালোচনা কবিতা ও শিল্পতত্ত্বের পত্রিকা, কেবলমাত্র কবিতা অথবা প্রবন্ধের কাগজ অথবা নিছক সঙ্গীত বা শিল্প-সমন্বিত পত্র পত্রিকার প্রকাশন বাংলাদেশের বুদ্ধিগত সংস্কৃতির পটভূমিকায় একটা বিরাট অংশ গ্রহণ করেছে। দৈনিক সংবাদপত্রের লোভার যোগসূত্র প্রায়শই বহিঃ অন্তঃ কীনজীবী সৎ-সাহিত্য পত্রিকার কণ্ঠ শোনা যায় না তথাপি যুগমানসের বিবর্তনে ও চরিত্র গঠনে, উন্নতমানের রুচি সৃষ্টিতে এই সকল ছোট ছোট পত্রিকার অবদানই সবচেয়ে কার্যকরী ও চিরস্থায়ী। সাময়িক পত্রিকার সৃষ্টি অবদান, আদর্শ ও রুচি প্রকৃতপক্ষে জাতির সংস্কৃতি সাহিত্য ও সৃষ্টিশীল ধারার অনেক বড় বড় দৈনিকের চেয়েও, যদিও তার অবদান জাতিগঠনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য নয়।

সাহিত্যকে সামগ্রিক ভাবে গড়ে তোলায় সাময়িকপত্রের অবদান আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই একথা স্মরণ রাখা উচিত যে কোন কোন প্রতিভাশালী সাহিত্যিক, যিনি বিশেষ আদর্শে বিশ্বাসী, শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে যার স্থির ধারণা রয়েছে, যুগমানস ও সমাজমানস সম্পর্কে যিনি সচেতন,—সম্পাদনা করলে সেই সাময়িকপত্রের একটি বিশেষ চেহারা ও লক্ষণ ফুটে ওঠে ; তার চিন্তা ভাবনা কল্পনা ও আদর্শ অনুযায়ী সেই পত্রিকা গড়ে ওঠে। অর্থাৎ পত্রিকার চরিত্র ও আদর্শে উক্ত সম্পাদকের চরিত্র ও আদর্শ প্রতিফলিত হয়। সাহিত্যের পটভূমিকায় দেখতে গেলে প্রধানত দুধরনের পত্রিকা লক্ষ্য করা যায়। কিছু পত্রিকা গড়ে উঠেছে যা বেশীদিন না টিকলেও সাহিত্যের ইতিহাসে তার চিহ্ন রেখে গেছে। মতবাদে হোক আদর্শে হোক, রুচিতে হোক তৎকালীন সাহিত্য-পরিবেশকে যা তীব্রভাবে নাড়া দিয়েছে, প্রাণস্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে। পরবর্তীকালের সাহিত্যিক প্রভাবান্বিত হয়েছে, সাহিত্যের গতিপথ নির্দেশ দিয়েছে অথবা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এক বিশেষ খাতে, নির্দিষ্ট ধারায় এগিয়ে নিয়ে গেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রিকার সংখ্যাই বেশী। তাতে মোটামুটি ভাবে মেধাবের লক্ষণ প্রকাশিত হলেও যা কোন দিকে নির্দেশক চিহ্ন সূচিত করেনি ; নতুন আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবেও যা কাজ করেনি। কিন্তু একটি পরিচ্ছন্ন রুচি পরিবেশিত হয়েছে। বিশিষ্ট লেখকের ভালো লেখা মুদ্রণ করে সাহিত্যের উন্নতমান সম্বন্ধে

পাঠকেকে সচকিত করেছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর পত্রিকা হিসেবে যদি বঙ্গদর্শন সবুজপত্র, কল্লোল, কালিকলম, পূর্বাশা, কবিতা ইত্যাদি পত্রিকাকে ধরা যায়, দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর পত্রিকা হিসাবে প্রবাসী, বিচিত্রা, পরিচয়, বিশ্বভারতী, চতুরঙ্গ ইত্যাদি গণ্য হতে পারে। অর্থাৎ সম্পাদক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমথ চৌধুরী বা অন্যান্য সৃজনশীল সাহিত্য-সম্পাদকরা যে দিক নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন, আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সাহিত্যকে বিশিষ্ট ধারায় বইয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সাহিত্যের মান উন্নতি সম্পর্কে ও রুচিগঠনে লেখক ও পাঠককে সহায়তা করেছেন। এ ব্যতিরেকে অন্য তৃতীয় শ্রেণীর পত্রিকা দেখা গিয়েছে যা মূলত গতানুগতিকা প্রবাহে চলেছে, টিকে থেকেছে, নানা ধরণের নানা আদর্শের সাহিত্যিক লিখেছেন, নানা ধরণের পাঠক তা পড়েছে। বলা বাহুল্য, এই বিভিন্ন শ্রেণীর পত্র পত্রিকাতে তৎকালীন সাহিত্যের আবহাওয়া পাওয়া যাবে, সেই সময়কার সমাজ মানসের একটি বিশিষ্ট চেহারা পাওয়া যাবে। যুগে যুগে রুচি পরিবর্তনের সূত্র আভাষ মিলবে।

ব্যক্তি ও সমাজজীবনে, পাঠক লেখক ও সম্পাদকের পারস্পরিক সম্পর্কের নিরিখে সাময়িকপত্রের বিশিষ্ট অবদান রয়েছে একথা সাধারণ সত্য। কি কি ভাবে কোন সাময়িকপত্র সেই কালের 'পর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে তা অবশ্যই গবেষণার বিষয়, কেমনভাবে সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে তাও কৌতূহল উদ্রেক করে (বলা বাহুল্য, এবিষয়ে বাংলা সাহিত্যে পথিকৃৎ হিসেবে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিনয় ঘোষের নাম উল্লেখ না করলে এ মন্তব্য অসম্পূর্ণ থাকবে), কোন্ কোন্ দিকে সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে গেছে তাও আমাদের লক্ষণীয় বিষয়। এপ্রসঙ্গে কয়েকটি দিক নির্দেশ করা প্রয়োজন।

প্রথমেই স্মরণ রাখা উচিত, যে কোন সাহিত্যকর্মই অন্তরীক্ষলোকে তৎকালীন সমাজ মানসের প্রেক্ষিতে বিচার্য, বরং বলা যায় তৎকালীন সামাজিক চিত্রকে রূপ দান করাই সেকালের সাহিত্যের অন্যতম কর্তব্য এবং যেহেতু সকল লেখকই কোন না কোন বিশেষ ঐতিহাসিক যুগে বাস করেন, তখনকার সামাজিক বা সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার পরিচয় তার রচনায় ফুটে উঠবে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "বাংলা সাময়িক-পত্র" সম্পাদনাকালে জানিয়েছেন:

> "বাংলা সাহিত্যের প্রসারের সহিত বাংলা সাময়িক-পত্রের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে; ১২২৬ সালে (খ্রি ১৮১৮) প্রথম বাংলা সাময়িক-পত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে।"

১লা অগ্রহায়ণ বাংলা ১২১১ সালের 'মুলত সমাচার' পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের উপযোগিতা সম্পর্কে সম্পাদক জানান যে

> "খবরের কাগজে অনেক উপকার। দেশবিদেশের যথার্থ সংবাদ পাওয়া যায়, ভাল বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা হয়, উত্তম হিত উপদেশ পাঠ করিয়া চরিত্রের দোষ সংশোধন করা যায়"...

এবং কৌতূহলের বিষয় এই যে যদিও উক্ত সাপ্তাহিক পত্রে সংবাদ ও ব্যাবসা টাকের মন্ত্রৌষধের বিজ্ঞাপন থাকত, তথাপি প্রবন্ধ, কবিতাও যত্নসহকারে ছাপা হত এবং যখন লেখা ভাষা প্রায় সংস্কৃতানুগ ছিল তখনও 'সুলভ সমাচারে' সুন্দর সরল বাংলা ভাষায় বিবিধ আলোচনা প্রকাশিত হত। প্রকৃত প্রস্তাবে তৎকালীন পত্রিকাগুলিতে, পূর্বেই যে মন্তব্য করেছি, 'বঙ্গদর্শনের' পূর্ব পর্যন্ত, সংবাদ ও জ্ঞানচর্চাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সাধারণভাবে যদি প্রায় গত দেড়শত বৎসরের সাময়িকপত্রের ইতিহাস আলোচনা করা যায় একটি সুন্দর ক্রমবিন্যাস চোখে পড়বে। যে যে বিষয় পর পর সাময়িকপত্রের মধ্য দিয়ে প্রাধান্য লাভ করেছে তার একটি ক্রম হিসেবে সূত্রগুলি বর্ণিত হ'ল :

ক. সংবাদ খ. জ্ঞানচর্চা গ. ধর্ম ও শাস্ত্রচর্চা ঘ. শিক্ষা ঙ. সমালোচনা চ. কবিতা ছ. সৃজনশীল সাহিত্য জ. কবিতা শিল্প ও সংগীত বিষয়ে একক পত্রিকা :

১৮১৮ সাল থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত সাময়িকপত্রের ধারাবিবর্তন এক কথায় জানাতে গেলে উপরোক্ত সূত্রই প্রধান নির্দেশক বলে আমার মনে হয়েছে। প্রথম দিকে, সংবাদ পরিবেশনের মধ্যে মূলত দেশীয় শাসনব্যবস্থা, যুদ্ধ বিবরণ, বৃটিশ শাসকদের নানা কাহিনী, শিক্ষাবিস্তার ইত্যাদি তথ্য ভারাক্রান্ত থাকত। দ্বিতীয় পর্বে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত ধর্ম, বিজ্ঞান ও বিবিধ প্রবন্ধাদি ও সাহিত্য-আলোচনার সূত্রপাত হল। তৃতীয় পর্যায়ে বিশ শতাব্দীতে এসে মূলত সাহিত্য চর্চার পর সাময়িক পত্রের আদর্শ কেন্দ্রীভূত হল।

জ্ঞানচর্চার মধ্যে দেখা যায় বিজ্ঞান, কৃষিবিষয়ক আলোচনা, 'দূরবীক্ষনিকা', ধনতত্ত্ব, সারসংগ্রহ, চিকিৎসাবিদ্যা, আয়ুর্বেদ ইত্যাদি স্থান লাভ করেছে। ধর্ম আলোচনায় প্রথম দিকে খ্রীষ্টীয়, মধ্যযুগে ব্রাহ্ম ও পরবর্তীকালে হিন্দু রক্ষণশীলতা সাময়িকপত্রের প্রধান উপজীব্য হল। এছাড়া সে সময় বিবিধ বিষয়ে কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হয়, কবিতা-যুক্ত একটি বিশেষ স্থানলাভ করে, পদ্যাবলী, পক্ষির বিবরণ —এই সকলের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রুচির আভাস পাওয়া যায়।

১৮৪০ সাল থেকে সর্বপ্রথম কলকাতার বাইরে, মফস্বলে ও বাঙালার বাইরেও পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন দেখা যায়। 'মুর্শিদাবাদ সংবাদপত্রী' ১৮৪০ সালের ১০ই মে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তারপর 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' ও উমাকান্ত ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'বারানসী চন্দ্রোদয়' প্রকাশিত হয়। পর পর ঢাকা, ত্রিপুরা, উত্তরপাড়া, পাবনা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উৎসাহে পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। অর্থাৎ সমাজজীবনে সংবাদ সাহিত্য ও সংস্কৃতি যে অত্যাবশ্যকীয় একথা শিক্ষিত সমাজ ক্রমশই বুঝতে শিখলেন, অনুভব করলেন জাতীয় জীবনে এর অপরিহার্যতা।

ধর্ম ও শাস্ত্রচর্চার মধ্যে প্রথম দিকে অগ্রণী ছিল খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক পাদরীরা।

খ্রীষ্টীয় তত্ত্ববিষয়ক পত্রিকা 'সলপেল ম্যাগাজিন' ও 'খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি' উনিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়েছিল, 'দিগ্দর্শন' প্রকাশের অনেক বছরের মধ্যেই। অন্যদিকে 'ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন ও উন্নতি, সমাজের ব্যাখ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান-প্রসঙ্গ ব্রহ্মোপাসনার প্রকার ও স্বরূপ' সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করাই ছিল 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশের মূল্য উদ্দেশ্য। এইসব ধর্ম-আলোচনার মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ দার্শনিক চিন্তাধারাও কিছু কিছু প্রকাশ লাভ করেছে। হিন্দু-ধর্মের রক্ষণশীল পণ্ডিতরাও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেন নি।

বিবিধবিষয়ে জ্ঞানার্জনের যে স্পৃহা সেকালে সাধারণের মধ্যে ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়েছিল তার অন্যতম নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করতে পারি যে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ১৮৫১ সালে প্রকাশিত হবার অল্পকাল মধ্যেই প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। রবীন্দ্রনাথ যে বাল্যকালে কত আগ্রহ সহকারে এই 'জ্ঞানিওয়ালা' বইটি তন্ন তন্ন করে পড়তেন তার বিবরণ অনেকেরই জানা আছে। এই সাময়িকপত্রের পরিচিতি হিসাবে উপরেই লেখা থাকত 'পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-স্তোতক মাসিকপত্র'। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে এই পত্রিকাটিতেই পশুপক্ষীর সচিত্র বিবরণ ও মুক্তকণ্ঠিনী বর্ণনার সঙ্গে অতি সুন্দর সাহিত্যসমালোচনার নিদর্শন পাই। পত্রিকাটির পঞ্চম সংখ্যায় রামপ্রসাদ সেন-এর কবিতা সম্পর্কে সমালোচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

> "রামপ্রসাদ সেনের রচনারীতি অনেকে অবগত নহেন। বাঙ্গালী ভাষার অনুশীলনকারী মহাশয়েরা এবিষয়ে যথার্থ জ্ঞাত থাকিতে পারেন ; কিন্তু সাধারণে তাহার ভাষা কোমল বলিয়া হেয় করেন। বস্তুত রামপ্রসাদের পদাবলী অত্যন্ত কঠোর এবং তাহার স্থানে স্থানে অনেক দুরূহার্থ আছে, যাহার অর্থসঙ্গতি হওয়া অধুনা সহজ নহে। অপর তাহার ভাষা অত্যন্ত তেজস্বী ; এবং তাহাতে অতিপ্রায় সকলও উত্তমরূপে ব্যক্ত আছে।

'সংবাদ প্রভাকরে' অবশ্য গুপ্ত কবির অজস্র কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, অধিকেয়ের নিলাম নোটিশের সঙ্গেই বিখ্যাত 'নিলাম বর্ণন'-এর মত কবিতাও পত্রিকাতে প্রকাশিত হত, তথাপি সাময়িকপত্রের আধারে সমালোচনা-সাহিত্যের সূত্রপাত আরও কিছু পরে আমরা দেখতে পাই। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতি সংখ্যাতেই পুস্তক সমালোচনা থাকত, কিন্তু সে সকল ধর্মীয় ও তত্ত্বমূলক গ্রন্থের।

সর্বশেষে এল সাহিত্য কাব্য শিল্প আলোচনার ধারা ও সৃজনধর্মী সাহিত্যের আত্মপ্রকাশ। অবশ্য খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বঙ্গদর্শনের পূর্বেও সাহিত্যবিষয়ে নানা পত্রিকাই উৎসাহী ছিল। 'কবিতাকুসুমাবলী' ও 'অবোধ-বন্ধু' সর্বাগ্রেই উল্লেখযোগ্য। ঢাকা শহর থেকে ১৮৬৪ সালে 'কাব্যপ্রকাশ' নামে যে সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয় তাতে বিজ্ঞাপিত ছিল, 'কাব্য নাটক আখ্যায়িকা প্রহসন সাহিত্যের অন্তর্গত কৌতুকগর্ভ গল্পাবলী'। তারপর ১৮৬৬ সালে 'নবপ্রবন্ধ' ও ১৮৬৮ সালে 'সমালোচনী' প্রকাশিত হয়। এসকল পত্রিকার আয়ু

যে খুব বেশী ছিল তা নয় এবং তৎকালীন সাহিত্যের ওপর প্রভাবও সেরকম ছিল না, কিন্তু পত্রিকাগুলি মূলত সাহিত্যকেন্দ্রিক ছিল। বঙ্গদর্শন প্রকাশের অব্যবহিত পরে 'বীণা' প্রকাশিত হয়, যার বিজ্ঞাপনে ঘোষিত ছিল 'নানাবিষয়িনী কবিতাপ্রসবিনী পত্রিকা"।

কিন্তু বাংলা ১২৭৯ সনের ১লা বৈশাখ বঙ্গদর্শন-এর প্রথম খণ্ড ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হলে সর্বপ্রথম সৃজনশীল সাহিত্য সাময়িকপত্রের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। শ্রীব্রজনাথ বসু কর্তৃক ভবানীপুরের সান্ধ্যদৈনিক সংবাদযন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত এই পত্রিকাটি যে ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক নির্ণয় করবে সেকথা স্বয়ং সম্পাদকেরও সম্ভবত অজ্ঞাত ছিল। পত্রসূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছিলেন :

> সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালি বাঙ্গালা রচনাপাঠে বিমুখ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালায় রচনায় বিমুখ।

এই-সামান্য ইঙ্গিত থেকেই আমরা বুঝতে পারবো সেই সময় বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা কি ছিল। নতুন ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী জানা একদল নব্য যুবকের আবির্ভাব হল যারা ইংরেজীকে নিজের মাতৃভাষা জ্ঞানে প্রকৃত মাতৃভাষাকে অবহেলার চোখে দেখতে আরম্ভ করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে এর কারণ অনুসন্ধান করলেন। শিক্ষিত বাঙ্গালীরা যাতে মাতৃভাষার প্রতি মনোযোগী হন সেজন্য এমন একটি পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা সিদ্ধান্ত করেন যাতে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা নিজের মাতৃভাষার প্রতি মমত্ব অনুভব করবেন, সেই ভাষায় উচ্চ শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চা করতে পারবেন, তাকে উন্নতিশালী ও জাতির হিতকর কার্যে ব্যবহার করতে পারবেন :

> আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব। যত্ন করিব এই মাত্র বলিতে পারি। যত্নের সফলতা ক্ষমতাধীন। এই আমাদিগের প্রথম উদ্দেশ্য।
>
> এই পত্র, কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য, বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের মঙ্গল সাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।
>
> তৃতীয়তঃ, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুষ্ঠান করিব।

বঙ্কিমচন্দ্র এভাবে বঙ্গদর্শনের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ দুটিই পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন। সেকালে ইংরেজীতে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রথমত বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপ ছিলেন, মাতৃভাষাকে অবহেলা করতেন, দ্বিতীয়ত, সাধারণ ব্যক্তির সঙ্গে তাদের সামাজিক বা সাংস্কৃতিক কোন যোগাযোগ ছিল না। মূলতঃ বঙ্গদর্শনের প্রকাশের পেছনে বঙ্কিমচন্দ্রের এই চিন্তা সবসময় কাজ করেছিল। তিনি মনে মনে পীড়িত বোধ করছিলেন মাতৃভাষার এই অবমাননায়।

পরবর্তীকালে ধর্মীয় চিন্তায় কিছুটা রক্ষণশীলতার পরিচয় দিলেও বঙ্গদর্শনের অন্যতম আদর্শ হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। উপন্যাস প্রবন্ধ ছাড়াও নানা চিন্তাশীল রচনা বঙ্গদর্শনের প্রতি সংখ্যায় থাকত। একটি সুস্পষ্ট উচ্চ প্রাবের আদর্শ এর সম্পাদনায় পোছনে নিয়ত কাজ করেছে, একথা সাধারণ পাঠকও আবিষ্কার করেছেন। সস্তা-জনপ্রিয়তার কখনো পক্ষাৎপদ হন নি, অলসের মুখের দিকে চেয়ে নিজের পক্ষত্বকে জনোত্তে বিধাবোধ করেন নি। কোন একটি সংখ্যার পুস্তক আলোচনা এরূপ :

সঙ্গীতলহরী। কুমার মহেন্দ্রলাল খাঁন প্রণীত। এখানি গীত পুস্তক। গীতগুলি ভাল নহে।

বলা বাহুল্য, একে প্রকৃত সমালোচনা হয়ত বলে না, হয়ত গ্রন্থখানিকে সমালোচনার উপযুক্ত মনে করা হয় নি। কিন্তু একথা পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে সস্তাভাবে সমালোচক আদৌ নন, সহজ সরল মনোভাব প্রকাশেও তার কুণ্ঠা নেই। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালী মানসিকতারই একটি উজ্জ্বল রূপ এতে ফুটে ওঠে। সাহিত্য ও রক্ষণশীল রচনার বা জ্ঞানসঞ্চারের ক্ষেত্রে যে রক্ষণশীলতার কোন স্থান নেই সে দৃষ্টান্ত বঙ্গদর্শনের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে, সাহিত্য ও তত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে বঙ্গদর্শন প্রথম যেন কুজ্ঝটিকার জাল সরিয়ে দিল, বাঙালী মানসিকতাকে মধ্যযুগের অন্ধকার আড়ষ্টতা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দিয়ে বিশ্বচিন্তার পটভূমিতে স্থাপন করল। বাঙালী সর্বপ্রথম জাতি হিসাবে নিজের চেহারা মুকুরে দেখার সুযোগ পেল। এক কথায় বাঙালী তার আত্মপরিচয় নতুন করে আবিষ্কার করল। প্রকৃতপক্ষে, শুধুমাত্র ভাষা সাহিত্যের প্রসারে নয়, নব জাতীয়তাবোধের উন্মেষের মূলে বঙ্গদর্শন প্রকাশের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান অসামান্যরূপে ফুটে উঠেছে।

এর মধ্যবর্তী পর্বে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এবং একথা সর্বজনস্বীকৃত যে বঙ্কিমের অবর্তমানে এই রবীন্দ্রনাথ হয়ত সম্ভব হতেন না। পরবর্তীকালে বঙ্গ-দর্শনের সম্পাদনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর বঙ্গদর্শন বিষয়ে যে উজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন তা বাঙালী পাঠকের সহজে ভুলবার কথা নয়। কিন্তু এই রবীন্দ্রনাথও এক সময় অল্প একটি পত্রিকার দ্বারা তীব্রভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যার মধ্য দিয়ে সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে আধুনিকতা তার দ্বিতীয় পর্যায়ে নবরূপ ধারণ করল। সে পত্রিকা প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র'। শুধুমাত্র যে বিশিষ্ট লেখকগোষ্ঠী তৈরী করবার কৃতিত্ব 'সবুজপত্র' দাবী করতে পারে তাই নয়, চিন্তার ঔজ্জ্বল্যে, প্রাণবন্ত তারুণ্যের অভিধানে, ভাষার নিরাবরণ ও বেগবান সৌন্দর্যে যে পথ এঁকে গিয়েছিল এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল তা এখনও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দিক নির্ণয় করছে। ১৩২২

সালের ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত টীকা টিপ্পনী অংশে খানিকটা জানতে পারি 'সবুজপত্র' প্রকাশের পেছনে তত্ত্বগত আদর্শের দিক কি ছিল :

"শুকপক্ষের সম্মুখে যাঁরা রক্তাম্বরে জোড়হস্ত হয়ে থাকেন, তাঁদেরও মনে রাখা কর্তব্য যে সে-পক্ষের যদি কিছু মূল্য থাকে তো সে এই কারণে যে তা একদিনে সবুজ ছিল.....ভবিষ্যতে বৃদ্ধ আমে জেনে বর্তমানে গ্রাম নিত্য নব-রাগে দেখা দিতে ভয় পায় না।"

সবুজপত্রের আদর্শের মধ্যে এর ইঙ্গিত স্পষ্টই অভিব্যক্ত হয়েছে। বলা বাহুল্য, বঙ্কিম পরবর্তী যুগে ক্রমশঃ যে চিন্তার জড়ত্ব ও ছন্দোবেগের অভাব অভিব্যক্তি বাংলা সাহিত্যে ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছিল, সবুজপত্রের আবির্ভাবে তা অনেকটা কেটে গিয়ে মুক্ত স্বাধীন চিন্তা ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণবান ভাষার সম্পদে বাংলা সাহিত্য আবার নতুন রাস্তায় চলতে শুরু করল।

এবং অব্যবহিত পরে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'পরিচয়' পত্রিকা সম্পাদনার মধ্য দিয়ে যদিও একদিকে বৈদগ্ধ্য ও অন্যদিকে পশ্চিমী সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সংযোগ রক্ষার সুযোগ দেখেছিলেন, বস্তুত কল্লোলীয় সাহিত্যের আবহাওয়া 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' পত্রিকা দুটির মধ্য দিয়ে নতুন খাতে বইতে শুরু করল। দীনেশরঞ্জন দাশ-সম্পাদিত কল্লোলের এবং শৈলজা-প্রেমেন-মুরলীধর এর যৌথ সম্পাদনায় কালিকলমের লক্ষণ প্রায় সমসাময়িক হলেও পত্রিকা দুটির চরিত্রে সামান্য পার্থক্য ছিল এবং গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে এদের যে অবদান, একথা অস্বীকার করলে অন্যায় হবে যে আধুনিক কবিতার প্রচার প্রসারকল্পে ও মূল্যায়নে বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত কবিতা ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য-সম্পাদিত পূর্বাশার (যে পত্রিকায় বহু উচ্চমানের গল্প উপন্যাস প্রবন্ধও স্থান পেয়েছে) অবদান তার থেকে কোন অংশেই কম নয়। এবং একথাও উপলব্ধি করবার দিন এসেছে যে ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রমথ চৌধুরী সুধীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত সকল সম্পাদকই মূলত সাহিত্যিক, যাঁদের আদর্শ ও চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে সেই সেই পত্রিকার বিশিষ্টতা ও চারিত্রিক দীপ্তি উজ্জ্বলতর হয়েছে।

সাময়িকপত্রের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে আবার নতুন পথে চলবার চেষ্টা করছে। হয়ত আবার কোন অদ্যাবধি প্রতিভাধর সম্পাদকের হাতে বাংলা সাহিত্যের নতুনতর দিক নির্ণীত হবে।

অরুণ ভট্টাচার্য

বাংলা সাহিত্যে সাময়িকপত্রের স্থান :
'দিগ্‌দর্শন' থেকে 'বঙ্গদর্শন'

বিনয় ঘোষ

নিদর্গের স্বর্ণপিঞ্জরে বন্দী জীবনের দিবা দিনগুলির মধ্যে হঠাৎ একটা অনমুভূতপূর্ব বাস্তবতার দৃশ্য দেখা দিয়েছিল সেকাল-ও-একালের সন্ধিক্ষণে। আমাদের বাংলাদেশে এই সন্ধিক্ষণটা হল অষ্টাদশ শতাব্দী। সমাজে অনেক নতুন আদর্শ ও কর্মনীতির আমদানি হয়েছিল এবং সেইসব নীতির অনুশাসনে এদেশের জনজীবন সনাতন আদর্শ-ঐতিহ্যের বন্দর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কালস্রোতে ভাসতে আরম্ভ করেছিল। সাম্রাজ্যের আমলের নিশ্চল নীতির নঙ্গরগুলি একে-একে এইসময় ছিঁড়তে লাগল। কবির আক্ষেপ—

Great things are done when men and mountains meet,
These are not done by jostling in the street. —*Blake*

তখন ধূলায় নিক্ষেপ করে মানুষ মিলিত হতে চাচ্ছে মানুষের সঙ্গে। মানুষের জীবনের, মানুষের চিন্তাভাবনার ও কাজকর্মের খবরাখবর জানবার জন্য মানুষ উদ্‌বিগ্ন হচ্ছে। সমাজ ও বিষয়সংসার থেকে বিযুক্ত হয়ে নির্জন পর্বতের পাদদেশে বসে মহৎকর্ম করার যুগ যে আর নেই—একথা এদেশের লোক, অস্পষ্টভাবে হলেও, কলকাতা শহরের কোলাহল শুনেই তখন বুঝতে পারছে। শহরের রাস্তায় তখন আজকের মতো যানবাহীন জনতার দৃশ্য দেখা যায়নি বটে, অটোমোবাইলের ছুটোছুটিও আরম্ভ হয়নি, কিন্তু কাঁচাপাকা রাস্তার উপর দিয়ে ঘোড়া-ঘোড়াদাড়ি-পাল্কির দৌড়াদৌড়ি দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে মানুষের কাজের সঙ্গে কাজ মিলিয়ে আর পায়ের সঙ্গে পা রেখে না চলতে পারলে সমাজ ও জীবন দুইই অচল হয়ে যাবে। নির্বচ্ছিন্ন সমাজ এবং নিরুদ্‌বেগ ও নিষ্কলঙ্ক জীবন যখন আর সম্ভব নয়, তখন 'সংবাদ' বা 'খবর' মানুষের জীবনে অপরিহার্য হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে, ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকে প্রথমে বাংলাদেশে এই নতুন যুগচেতনা আত্মপ্রকাশ করল মুদ্রিত সংবাদপত্রের মধ্যে।

নিশ্চয় ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশে এই যুগচেতনা প্রখর হয়েছিল বাংলা দেশে। ১৭৮০ সনে জন অগস্টস হিকি যখন এদেশে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা করেন তখন বাংলার পুরাতন গ্রাম্যসমাজ ব্রাইত-বিরজাকরের আমল থেকে প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে খেয়ে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। দশবছর আগে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে এই বিপর্যয় প্রবলবেগে সমাজবক্ষে নেমে এসেছিল এবং গ্রাম্যসমাজের মূল পর্যন্ত তাতে উৎপাটিত হবার উপক্রম হয়েছিল। বাংলার এক-তৃতীয়াংশ জনশূন্য জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল এবং উৎখাতরা পৈতৃক বিটেমাটি ছাড়া হয়ে নতুন নাগরিক সমাজের 'লুম্পেন প্রলেটারিয়েটের' কলেবর বৃদ্ধি করেছিল। এই নাগরিক সমাজ তখন ভিমতাবে হলেও নতুনভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত হচ্ছে এবং তার উপরের স্তরে নানাজাতের ও নানাবর্ণের অজ্ঞাতকুলশীলরা একালের বিত্ত-কেন্দ্রিক নব্য-আভিজাত্যের অনুষ্ঠানলিপি রচনা করছেন। এঁরা হলেন কোম্পানির আমলের প্রথম তিনচার পুরুষের দেওয়ান বেনিয়ান দালাল মুনশী সরকার ও গোমস্তার দল। এঁরাই দেশের উচ্চশ্রেণীর নাগরিক নব্য আভি-জাত্যের প্রবর্তক। সেকালের কুলকৌলীন্যের বদলে বিত্তকৌলীন্য হল একালের আভিজাত্যের অন্যতম মানদণ্ড। ধমনীমধ্যস্থ কুলশোণিতের প্রবাহ ছিল উন্নতপঙ্ক্তিতে অন্তর্মুখী, তাই দামন্তযুগে কুলকেন্দ্রিক সমাজে শ্রেণীগঠনের প্রসার ছিল না, পরিবর্তনও ছিল না। প্রস্তরবৎ অচল সমাজের মধ্যে মানুষের মনও ছিল বহির্জগতের প্রতি নিস্পৃহ। কিন্তু আধুনিক বিত্তকেন্দ্রিক সমাজে শুধু যে বিত্তের চক্রাবর্তবেগ বৃদ্ধি পেল তা নয়, তার গতিও হল অনুভূমিক, এবং তার প্রচণ্ড আঘাতে তাই সমাজের সেকেলে পিরামিডের ভিত্ পর্যন্ত নড়ে উঠল, সনাতন সুবিন্যস্ত সোপানগুলিও ভেঙে আসতে আরম্ভ করল। বিত্ত আয়াসে আয়ত্ত করা যায়, কিন্তু জন্মগত কুল আয়াসের অনায়ত্ত বস্তু। বিত্ত সচল, কুল অচল। কুলের খবর কুলপঞ্জীতে আত্মগোপনের মতো উদ্গ্রীব, কিন্তু বিত্তের খবর নিত্যপরিবর্তনশীল ও ঘোষণাকক্ষম। তার খবর কোথায় পাওয়া যাবে? আধুনিক সংবাদপত্রে। বিত্তচালিত সমাজের যাবতীয় বার্তা বহন করে আনবে সংবাদপত্র, আধুনিক মানুষ প্রত্যহ গীতাপাঠের মতো তা পাঠ করে তৃপ্ত হবে। অতএব সংবাদপত্রের প্রয়োজন।

বাংলার সমাজে এই প্রয়োজন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে বেশ প্রবল হয়ে

উঠল। দেশের নব্য-বিত্তবানেরা তখন নিজেদের স্বার্থেই বেশ সংবাদলোলুপ হয়ে উঠেছেন। তার উপর হেস্টিংসের আমল থেকে দেশের রাজনীতিও যখন উত্তেজনার ঘোরাক যোগাতে লাগল তখন সংবাদপত্রের কালোপযোগী উপ-করণেরও অভাব ঘুচে গেল। ঠিক এই ঐতিহাসিক সুযোগে, ১৭৮০ সনে, জন অগস্টস হিকি বাংলাদেশের কলকাতা শহর থেকে ভারতের প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশ করলেন। বলা বাহুল্য, এই গেজেট ইংরেজী সংবাদ-পত্র। হিকি তাঁর সংবাদপত্রের পরিকল্পনা প্রথমে একটি প্রস্তাবাকারে (Propo-sals) ছেপে প্রচার করেছিলেন। তাতে সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে কয়েকটি কথা তিনি এখানকার নগরবাসীদের জানিয়েছিলেন। এদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে হিকির 'এই নিবেদনের বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই গুরুত্ব তাঁর একটি মাত্র উক্তি থেকেই বুঝতে পারা যায়—

The chief intention of a *Newspaper*, being to effect the more easy circulation of such information, as are either useful or entertaining, and tending to promote the trading concerns of industrious individuals. This paper is set on foot with that design, and to bring into one *Focus*, or immediate point of view, the numerous notices, advertisements etc. now handed about by Hercarrahs in Manuscript—

মোগল আমলে আমাদের দেশে 'ওয়াকেয়া-নবিস' বা সংবাদ-লেখকরা ছিলেন, বিভিন্ন স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করে তাঁরা প্রত্যেক সপ্তাহে বা মাসে রাজদরবারে লিখে পাঠাতেন। এইসব সংবাদলিপিকে 'আখ্‌বার' বলা হত এবং এগুলি লেখা হত ফারসীতে। বড় বড় বণিক ও ধনিক মহাজনদেরও নিজস্ব সংবাদলেখক থাকত, হিন্দু মহাজনদের সংবাদলিপিতে হিন্দী ভাষা ব্যবহার করা হত। আখ্‌বারাতে বা সংবাদলিপিতে শুধু বিশেষ বিশেষ ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হত, তার উপর কোন মন্তব্য করা হত না। ইংরেজ আমলে প্রথমদিকে এই প্রাচীন সংবাদব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হবার আগে পর্যন্ত কোন পরিবর্তন হওয়া সম্ভবও ছিল না। তখন হাতেলেখা লিপিতে ডাকহরকরারা বাড়ি বাড়ি সংবাদ বহনবরাদ্দ করত। হিকি একথা তাঁর নিবেদনে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে কলকাতার মতো বর্ধিষ্ণু বিত্তশালী শহরে এই হরকরাদের উপদ্রব একটা 'nuisance' ও 'disgrace' ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর 'বেঙ্গল গেজেট' মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হলে কলকাতা শহরের

এই কলম অপরোহিত হবে। সর্বাধিক উপকৃত হবেন বিত্তসন্ধানী ব্যবসায়ীরা, কারণ বাজারের দ্রব্যমূল্য, কেনাবেচার নোটিস ও বিজ্ঞাপন, জাহাজের আসা-যাওয়ার খবর ইত্যাদি যা নিয়মিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে তা সবই প্রায় বিত্তলোভীদের কৌতূহলের ইন্ধন যোগাবে, খবর-ক্ষুধা জাগ্রত করবে।

হিকির নিবেদনটি আদ্যোপান্ত পাঠ করলে বোঝা যায় যে এদেশের অর্থনীতিক স্বার্থের তাগিদেই আধুনিক সংবাদপত্রের উৎপত্তি হয়েছে, রাজনীতি শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় কালক্রমে সংবাদের গুরুত্ব অর্জন করে তাতে স্থান পেয়েছে। হিকি অবশ্য প্রথম থেকেই তাঁর বেঙ্গল গেজেটে নিলাম-নোটিস-বিজ্ঞাপনের পাশে সাহিত্যিকদের জন্য একটি স্থান করে দিয়েছিলেন। পণ্যদ্রব্যের বাজারদরের সঙ্গে কাব্যসাহিত্যের দর যাচাইয়েরও সুযোগ পেয়েছিলেন বেঙ্গল গেজেটের ভাগ্যবান পাঠকগোষ্ঠী।

'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশের পর আরও প্রায় ৩০ বছর কেটে গিয়েছিল বাংলাভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে। একালের সংবাদপত্র সেকালের আখবার নয়, ঘটনার বাজার ও মন্তব্যের মধ্যে মানুষের স্বাধীন মতামত প্রকাশের স্বাধিকার ঘোষণা করে তার আবির্ভাব হয়েছে। কাজেই রাজ-পুরুষদের কাছে সংবাদপত্র গোড়া থেকেই চক্ষুশূল হয়ে উঠল। বেঙ্গল গেজেটের পর ইংরেজরাই এদেশে 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'ক্যালকাটা গেজেট', 'বেঙ্গল হরকরা' প্রভৃতি পত্রিকা ইংরেজীভাষায় প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের স্বাধীন মতামত প্রকাশে ও খবরাখবর প্রচারে ইংরেজ শাসকরাই ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হয়েছেন। ১৭৯৯ সনে এদেশে ওয়েলেসলি সর্বপ্রথম সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করে আইন পাশ করেন। এই আইন অনুযায়ী সরকারী সংবাদ-পরীক্ষকের অনুমতি ছাড়া কোন সংবাদ বা সম্পাদকীয় মন্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশ করা সম্ভব হত না। এদেশে সংবাদপত্র সৃষ্টির আরম্ভ হওয়া মাত্রই সরকারী আক্রোশে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। হিকি সাহেবের উপর হেস্টিংস কম অত্যাচার করেন নি, একাধিকবার তাঁকে কারাদণ্ডও ভোগ করতে হয়েছে। শৈশব-কালে ইংরেজী সংবাদপত্রকেই যখন টুঁটি টিপে হত্যা করার জন্য শাসকরা উদ্যত হয়েছেন তখন এদেশের মাতৃভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের বাসনা যদিও বা কারও মনে জেগে থাকে তাহলে অঙ্কুরেই তা বিনষ্ট হয়েছে।

উনিশ শতকের গোড়া থেকে দেশের সামাজিক আবহাওয়া দ্রুত বদলাতে আরম্ভ করল। কলকাতায় 'কোর্ট উইলিয়ম কলেজ,' শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হল (১৮০০), নবজাগরণের অন্যতম উদ্গাতা রামমোহন রায় কলকাতা শহরের স্থায়ী বাসিন্দা হলেন (১৮১৪), সামাজিক প্রথাসংস্কারাদি নিয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করলেন এবং বাংলাভাষায় অনুবাদ ও ভাষ্যসহ প্রথম 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশ করলেন (১৮১৫),* এদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উদ্‌যোগে আধুনিক পাশ্চাত্ত্যবিদ্যা ও ইংরেজীশিক্ষার প্রথম বিদ্যালয় 'অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কলেজ' (হিন্দু কলেজ) স্থাপিত হল (১৮১৭)। সমাজদেহে রক্তচলাচল উঠল একসঙ্গে এবং এই সময় রামমোহন রায় মাতৃভাষাকে বেদান্তের বাহন করে মর্যাদার উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বাংলা গদ্যভাষা তৈরি হল যুগোপযোগী জটিল ভাব প্রকাশের বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে। বাংলাভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের শুভমুহূর্তও এগিয়ে এল। ১৮১৮ সনে তিনখানি বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হল—মাসিক 'দিগ্‌দর্শন', সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ', সাপ্তাহিক 'বাঙ্গাল গেজেটি'। প্রথম দুটি পত্রিকা শ্রীরামপুর থেকে ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা প্রকাশ করেন, তৃতীয় পত্রিকাটি প্রায় একই সময়ে দু'জন বাঙালীর (গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও হরচন্দ্র রায়) উদ্‌যোগে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এর পর 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১), 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১), 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২) ও 'সম্বাদ তিমির নাশক' (১৮২৩) আত্মপ্রকাশ করে। এই পর্যন্তই আমরা বাংলা সংবাদপত্রের প্রথম পর্বের সীমারেখা টানতে পারি। কৌমুদী উনিশ শতকের তিরিশের কোঠা এবং চন্দ্রিকা পঞ্চাশের কোঠা উত্তীর্ণ হয়েছিল অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে। এই দুটি পত্রিকাই ছিল প্রথম পর্বের প্রাণস্বরূপ, কাজেই প্রথম পর্বের সীমারেখা অন্তত কৌমুদীর অস্তিমকাল পর্যন্ত টানতে হয়।

বাংলা সংবাদপত্র-সাময়িকপত্রের এই প্রথম পর্বে দেখা যায় যে বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রাথমিক বিকাশ হয়েছে, পত্রিকায় তাঁদের অভিনন্দন জানানো হচ্ছে এবং পত্রিকার লেখকতাও তাঁরা করেছেন। "এই নূতন শ্রেণী হইতে যে সকল উপকার উৎপন্ন তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাতিরিক্ত"—'বঙ্গদূত' পত্রিকা এই ভাষায় মধ্যবিত্তের ঐতিহাসিক ভূমিকার সুদীর্ঘ বিশ্লেষণ করেছেন (১৮২৯)। সমাজনীতি অর্থনীতি রাজনীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এই নবজাত

মধ্যবিত্তের মধ্যে যে মতামতের সংঘর্ষ হয়েছে তা সমকালীন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পত্রিকায় প্রতিফলিত হয়েছে। বিরোধ প্রধানত ধর্মমত ও সমাজসংস্কারের ঐতিহ্য কেন্দ্র করে ঘনিয়ে উঠেছে। একদিকে রামমোহনপন্থীরা, অন্যদিকে সাধারণ হিন্দুসমাজ ও রক্ষণশীলরা বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন নিজেদের পত্রিকার পৃষ্ঠায়। এরকম দৃশ্য এদেশের সমাজে পূর্বে আর কখনও দেখা যায় নি। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত মতামতের যে সামাজিক গুরুত্ব আছে তা পূর্বে কখনও ব্যক্তিমানসে বাস্তব সত্যরূপে প্রতিভাত হয় নি। এই প্রথম একটা মূল্যবোধকারী সত্তা মামুলি শাস্ত্রকথার কুয়াশা ভেদ করে ভোরের সূর্যের মতো জেগে উঠল দেশের লোকের সামনে। হলই বা তা প্রধানত মধ্যশ্রেণীর সামনে, তাতেই বা কি? ভৌগোলিক সীমাও হয়ত তখন তার কলকাতা শহরের সীমা, তাতেও কিছু আসে-যায় নি। কৌমুদী-চন্দ্রিকার বিরোধ-বিতর্কের মধ্যে এদেশের মানুষের স্বদেশীয় গণতান্ত্রিক মতামতের জয়যাত্রা ধ্বনিত হয়ে উঠলো। নবযুগের উদ্‌বোধন ঘটল দেশীয় সংবাদপত্রে।

বিদ্যাসুন্দর রতিমঞ্জরী রসমঞ্জরীর মতো আদিরসাত্মক সাহিত্যরস এবং কবিগানে আখড়াই হাফআখড়াই তরজা যাত্রা পাঁচালি তখন অভিজাত নাগরিক সমাজের সাংস্কৃতিক আসর জাঁকিয়ে বসেছিল। তাদের উৎখাত করে বিদ্যাবুদ্ধি যুক্তি আশ্রিত জ্ঞানমূলক বিষয়বস্তু সন্তোষজনক আকারে গদ্যভাষার ভিতর দিয়ে পরিবেশন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল প্রথম পর্বের এই বাংলা পত্রিকাগুলি। প্রবীণ কাব্যসাহিত্যকে স্থলাভিষিক্ত করে নবীন গদ্যসাহিত্যকে সেখানে অভিষিক্ত করার কঠোর ঐতিহাসিক কর্তব্য প্রধানত এই পত্রিকাগুলি পালন করেছিল। অবশ্য বাংলা গদ্যভাষার শুরুবিষয়ে গ্রন্থরচনা তখন যৎকিঞ্চিৎ আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠক এবং পত্রিকার পাঠকের মধ্যে সংখ্যাগত গুণগত পার্থক্য ছিল অনেক। পত্রিকার প্রভাব সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময় অনেক পাঠক এবিষয়ে লিখছেন: "প্রতি সপ্তাহে তত্তৎ পত্রার্থাবসত হইয়া বিবিধ বৃত্তান্ত বিজ্ঞ হওয়াতে তাঁহাদের অসত্যতা ও অজ্ঞান লোপ পূর্ব্বক সভ্যতা ও জ্ঞানোদয় হইতে পারে এবং ইহাতে বাঙ্গলা লেখা পড়ায় যারা যাহা এতদ্দেশে পূর্ব্বে প্রায় ছিল না তাহাতেও সকলের মনঃপ্রবেশ হইবার বিষয়।" এই বাংলা লেখাপড়ার চর্চা এদেশে সাময়িকপত্র প্রকাশের পর থেকে শুরু হয়েছে বললে অতিশয়োক্তি হয় না।

১৮২১-২২ সনে কৌমুদী ও চন্দ্রিকা প্রকাশিত হবার পর বাংলাভাষায় আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলন সম্বন্ধে এদেশের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যে বিশেষ সজাগ হয়েছিলেন তা ১৮২৩ সনে 'গৌড়ীয় সমাজ' নামে প্রথম বিদ্বৎসভা প্রতিষ্ঠা থেকে বোঝা যায়। ল্যাডলিমোহন ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারিকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীকান্ত ঘোষাল, গৌরমোহন বিদ্যালংকার, রামজয় তর্কালংকার প্রমুখ তৎকালের সমাজের প্রতিপত্তিশালী ও বিদ্বান ব্যক্তিরা এই বিদ্বৎসভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। লক্ষণীয় হল, মতান্ধতের সংকীর্ণতা সভার পোষকতার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নি। সভার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বহুজনের বিদ্যা বুদ্ধি ও অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন বিদেশী ভাষা থেকে জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি বাংলাভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা এবং আধুনিক নানাবিষয়ে মাতৃভাষায় মৌলিক গ্রন্থ রচনা করা। বিদ্বজ্জনেরা যে এইভাবে সমাজবদ্ধ হয়ে মাতৃভাষার একনিষ্ঠ অনুশীলনের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন, এইটাই বড় কথা। সংস্কারের রূপায়ণে বাংলা সাময়িক-পত্রের দানের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ের গোড়া থেকে কোম্পানির আমলের শেষ পর্যন্ত (১৮৪১-৫৮) বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্ব বা মধ্যপর্ব বলা যায়। এই মধ্যপর্বে দেখা যায়—হিন্দুকলেজে ইংরেজীশিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ বাঙালী বুদ্ধিজীবীর বিকাশ হয়েছে, বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত সামাজিক আন্দোলন মধ্যবিত্ত জনস্তরে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে, আধুনিক শিক্ষার বিস্তার হয়েছে এবং বিশ্বের চক্রাবর্তবেগে দেশের গ্রামীণ ও নাগরিক সমাজে অভাবনীয় শ্রেণীরূপান্তর হয়েছে। কোম্পানির দেওয়ানীলাভের পর থেকে কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন পর্যন্ত অনভিজ্ঞ ইংরেজ শাসকরা এদেশের ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থা নিয়ে যেসব প্রশাসনিক পরীক্ষা করেছেন তাতে বাংলার গ্রামীণ সমাজের মূল ও কাঠামো দুইই ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। উপরের স্তরে বনেদী জমিদারদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন একদল হঠাৎ-ধনিক গ্রামব্যবসায়ী এবং তাঁদের ও নীচের স্তরের কৃষকপ্রজাদের মধ্যবর্তী স্তরে একদল রাজস্বের ঠিকাদার গজিয়ে উঠেছেন। এই নতুন গ্রামীণ উচ্চশ্রেণী

ও মধ্যশ্রেণী মাটি ও মানুষের প্রতি সম্পূর্ণ মমতাবর্জিত হলেও আধুনিক কালোপযোগী মনোভাবও পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি। গ্রাম ও নগরের মধ্যবর্তী স্তরে ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় তাঁরা বিরাজ করছিলেন। কিন্তু একটি বিষয়ে এঁদের মানসিক তৎপরতার অভাব ছিল না। নতুন সংবাদপত্র-সাহিত্যের পোষকতায় বাংলার প্রাচীন সমাজের এই নব্য-জমিদারশ্রেণী ও মধ্যবর্তীভোগী মধ্যশ্রেণী উৎসাহভরে অগ্রণী হয়েছিলেন। তার কারণ বোধ হয় নব্যশিক্ষা-সংস্কৃতির স্পর্শলাভের আকাঙ্ক্ষা। এই স্পর্শলাভ ভিন্ন নবযুগের সমাজে আভিজাত্যের জাতে ওঠা সম্ভব নয় বলেই তাঁরা নতুন শিক্ষাসংস্কৃতির সমর্থনে উৎসাহী হয়েছিলেন। এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন শহরের ক্রমবর্ধমান মধ্যশ্রেণী। এককথায় বলা যায় বাংলা সাময়িকপত্রের পর্বান্তরের জন্য সামাজিক ও মানসিক উভয়ক্ষেত্রই তখন প্রস্তুত ছিল।

এই প্রস্তুতির পরিচয় পাওয়া যায় বিদ্বৎসভার প্রসার এবং দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উপর তার প্রভাব বিস্তার থেকে। ১৮৩০-৩১ থেকে ১৮৪৫-৪৬ সনের মধ্যে কলকাতা শহরে যেন বিদ্বৎসভা, সাহিত্যসভা ও বিতর্কসভা স্থাপনের মহাধুম পড়ে যায়। হিন্দু কলেজের নব্যশিক্ষিত তরুণরা ১৮২৮ সনের দিকে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপন করে সুধীমণ্ডলে সোরগোল তুলেছিলেন। কিন্তু সেখানে ইংরেজীভাষার কোয়াশা ছুটত, দেশীয় বাঙালীর বিশেষ আমল পেত না। ১৮৩১ সনে ষোড়শবর্ষীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যমে 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা' স্থাপিত হল যেন তরুণ ডিরোজিয়ানদের জবাব দেবার জন্য। সভার উদ্দেশ্য এইরূপে ব্যক্ত করা হল: "এই মহানগরে বঙ্গভাষার আলোচনার্থ কোন সমাজ সংস্থাপিত নাই অতএব উক্ত ভাষার আলোচনার্থ আমরা এক সভা করিতে প্রবর্ত হইলাম।" যুবক দেবেন্দ্রনাথ আরও স্পষ্ট করে বলেন: "এক্ষণে ইংলণ্ডীয় ভাষা আলোচনার্থ অনেক সভা দৃষ্টিগোচর হইতেছে এবং তত্তৎ সভায় যাবা উক্ত ভাষায় অনেকে বিচক্ষণ হইতেছেন অতএব মহাশয়েরা বিবেচনা করুন গৌড়ীয় সাধুভাষা আলোচনার্থই এই সভা সংস্থাপিত হইলে সভ্যগণেরা ক্রমশঃ উত্তমরূপে উক্ত ভাষাজ্ঞ হইতে পারিবেন।" এই সভা প্রতিষ্ঠিত হবার পর বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা (১৮৩৫-৩৬), সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৮৩৮), তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯), বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ (১৮৪০), বেথুন সোসাইটি (১৮৫১), বিদ্যোৎসাহিনী সভা (১৮৫৩)

প্রভৃতি সভা-সমাজ একে একে স্থাপিত হয়। বাংলা ভাষার সমাদর যে বাড়ছে তা সভার নামকরণ থেকে বোঝা যায়, উদ্দেশ্য বা অনুষ্ঠানপত্রের মধ্যে তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যসংখ্যা কয়েক বছরের মধ্যে ১০০ থেকে প্রায় ৮০০ পর্যন্ত হয়, যেখানে সোসাইটির সভ্যসংখ্যা হয় ২৪ থেকে ৩০০। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে এই সভাগুলি যে কতদূর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল তা এই ধরনের কয়েকটি সভার উত্তরোত্তর সভ্যসংখ্যাবৃদ্ধি থেকে অনুমান করা যায়।

এই সময় বাংলাভাষায় যে পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে নানাদিক দিয়ে অগ্রগণ্য হল—সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১ সাপ্তাহিক, ১৮৩৯ দৈনিক, ১৮৪৩ মাসিক), তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩ মাসিক), বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১ মাসিক), মাসিক পত্রিকা (১৮৫৪ মাসিক)। এগুলি ছাড়া আরও বহু বাংলা পত্রিকা এই পর্বে প্রকাশিত হয়—যেমন জ্ঞানান্বেষণ (১৮৩১ সাপ্তাহিক), অনুদাদিকা (১৮৪১ সাপ্তাহিক), বিজ্ঞানসেবধি (১৮৩৯ মাসিক), বিজ্ঞানসারসংগ্রহ (১৮৩৩ পাক্ষিক), সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় (১৮৩৪ মাসিক, ১৮৩৬ সাপ্তাহিক, ১৮৪৪ দৈনিক), সমাচার তাতর (১৮৩৯ সাপ্তাহিক), বেঙ্গল স্পেক্টেটর (১৮৪২ এপ্রিল মাসিক, ১৮৪২ সেপ্টেম্বর পাক্ষিক, ১৮৪৩ মার্চ সাপ্তাহিক) ইত্যাদি। বিবিধ কারণে এই পত্রিকাগুলিও মূল্যবান, কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যপর্বে বাংলাভাষা ও সাহিত্যানুশীলনের অন্তীলন: পূর্বোক্ত চারটি পত্রিকার মধ্যে সর্বাধিক প্রকট বলা চলে। এই কারণে চারটি পত্রিকাকেই আমি এই মধ্যপর্বের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করেছি।

সদ্যোজাত বাংলা গদ্যভাষার শৈশবকালীন অস্ফুটতা কাটিয়ে তোলাই এক বৃহৎ সমস্যা। তার চাইতেও বৃহত্তর সমস্যা হল এই গদ্যভাষাকে নবযুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের সুযোগ্য বাহন করে তুলে তাকে সর্বতোরূপে সুঠাম করে গঠন করা। সমস্যাটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষিতজনের সামনে তুলে ধরেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায়। একথা ঠিক যে প্রভাকর-সম্পাদক নিজে স্বভাবকবি ছিলেন বলে গদ্যরচনায় তিনি প্রাচীন কাব্যরীতির শিথিলগুণ অনুপ্রাসপ্রবণতা ও চটুল চপলতাদোষ পরিহার করতে পারেন নি, কিন্তু 'গুড়ুচ্যাদ্যা' (গুড়ুচ্যাদ্য বিদ্যালংকার) গৌড়ীরীতি ও কিম্ভূতকিমাকার

পাত্রিত্বীতি থেকে বাংলাভাষাকে মুক্ত করে সর্বজনবোধ্য ও সুগম করে তোলার কৃতিত্ব অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য। তাছাড়া প্রভাকরের পৃষ্ঠায় গুপ্তকবি বাংলাভাষায় আধুনিক জ্ঞানবিদ্যার অনুশীলনের পক্ষে যেরকম আন্তরিক সুরে বারংবার আবেদন করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় (বর্তমান লেখক সম্পাদিত ও সংকলিত : সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড 'সম্পাদকীয়' দ্রষ্টব্য)। এছাড়াও বাংলা গদ্যভাষার উন্নয়নোদ্দেশ্যে গুপ্তকবির একটি পরোক্ষ দান হল— তৎকালের অন্যতম শক্তিধর গদ্যলেখক অক্ষয়কুমার দত্ত। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যা তাঁর 'অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনচরিত' গ্রন্থে লিখেছেন : "কলিকাতার নারায়ণ দত্তের বাড়ীতে একটি 'বাঙ্গালা ভাষানুশীলনী সভা' ছিল। সেই সভায় প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের পরিচয় হয় ও ক্রমে বিশেষ বন্ধুতা জন্মে। তখনও বাংলা ভাষায় কিছু লিখিতে হইলে সাধারণতঃ পদ্যেই তাহা লিখিবার রীতি প্রচলিত ছিল, তদনুসারে অক্ষয়কুমারও মধ্যে মধ্যে পদ্য রচনা করিতেন। একবার প্রভাকর পত্রিকার একজন সহকারী সম্পাদক পীড়িত হওয়াতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অক্ষয়কুমার দত্তকে অনুরোধ করেন যে পত্রিকার জন্য একটি ইংরেজী প্রবন্ধ দেন অক্ষয়কুমার বাংলাতে অনুবাদ করিয়া দেন। প্রথমতঃ অক্ষয়কুমার বলিয়াছিলেন, 'আমি তো কখনও গদ্য লিখি নাই, আমি কি পারিব ?' কিন্তু অক্ষয়কুমারের লেখাটি এত ভাল হইল যে তদবধি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া বাংলা গদ্যে নানা প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত করেন।" বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের হাতে বাংলা গদ্যভাষা আধুনিক যুগসংবোধী ভাবগভীর রূপ ধারণ করল।

তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্ররূপে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ সনে। অক্ষয়কুমারের রচনাগুণে মুগ্ধ হয়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেন এবং পরে এই পত্রিকার সঙ্গে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৮৫৫ সন পর্যন্ত অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদকতা করেন এবং এই সময়ের মধ্যেই আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয় প্রধানত এই পত্রিকার পৃষ্ঠায়। আধুনিক সকল বিষয়ে বাংলা গদ্যভাষার অনুশীলনে তৎপর হয় তত্ত্ববোধিনী। সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস পুরাবৃত্ত জীবনচরিত রাজনীতি অর্থনীতি শিক্ষা সমাজ-নীতি ইত্যাদি আধুনিক সমস্ত জ্ঞানবিদ্যার অনুশীলন তত্ত্ববোধিনীতে নিয়মিত

হতে থাকে। এসব বিষয় যে বাংলা ভাষায় আলোচনা করা আদৌ সম্ভব হতে পারে তা আগে দেশের শিক্ষিতজনের কল্পনাতীত ছিল। তাঁরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। নব্য-শিক্ষিতসমাজের 'সম্রাট' ছিলেন তখন রামগোপাল ঘোষ, লোকে তাঁকে 'এছুরাজ' ('এছুকেটেড'-দের রাজা) বলত। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন যে রামগোপাল একদিন মহা উৎসাহে একখণ্ড তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হাতে নিয়ে রামতনু লাহিড়ীর কাছে গিয়ে বলেন, "রামতনু, রামতনু, বাংলা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা দেখেছ? এই দেখ!" রামগোপাল-রামতনুর মতো ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালী যুবকরাও কেন তত্ত্ববোধিনীকে এইভাবে অভিনন্দিত করেছিলেন তার উত্তরে শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন: "তত্ত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইল। তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্র সকলের, অবস্থা কি ছিল, এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য-জগতে কি পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে, তাঁহাকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না বলিয়া থাকা যায় না।...তত্ত্ব ও শিক্ষিত সমাজের জন্য লিখিত পত্র সকলেও এমন সকল প্রীতিজনক বিষয় বাহির হইত, যাহা ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না। এই কারণে রামগোপাল ঘোষ-প্রকৃতি ডিরোজিওর শিষ্যগণ ঘৃণাতে দেশীয় সংবাদপত্র স্পর্শও করিতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী যখন দেখা দিল তখন তাঁহারা পুলকিত হইয়া উঠিলেন।"

'প্রীতিজনক বিষয়' বলতে লঘু আমোদ-প্রমোদ ও ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক রচনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রভাকর ও ভাস্করের মতো পত্রিকাও এই চটুল রচনার মোহমুক্ত হতে পারে নি। অর্থাৎ আখড়াই-তরজা-কবিয়ালী ঢঙ্ যেন কতকটা উত্তরাধিকারসূত্রেই তৎকালের সাময়িকপত্রগুলি গ্রহণ করেছিল, এবং রাজনীতি-অর্থনীতি, শিক্ষা-সমাজনীতির মতো গুরুবিষয়ের আলোচনার মধ্যেও এই চাপল্য আমদানি করে বিদ্যাসুন্দরী যার অঙ্কুর রাখতে চেয়েছিলেন পত্রিকার সম্পাদক ও লেখকরা। 'কৌমুদী' ও 'বঙ্গদূতের' মতো পত্রিকাগুলি, প্রধানতঃ রামমোহন ও তাঁর আদর্শানুসারীদের আনুকূল্যে, এই দায়মুক্ত হবার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু তত্ত্ববোধিনীর মতো বিষয়বস্তুর বিস্তার ও বৈচিত্র্য তাঁদের ছিল না, এবং লেখকের দুর্লঙ্ঘ্যতার কথা ভেবে অগ্রসর হবার সাহসও তাঁদের হয় নি। সমস্ত দ্বিধাসংশয় কাটিয়ে তত্ত্ববোধিনী সর্বপ্রথম এই পথে নির্ভয়ে পা

বাড়িয়েছিল অদম্য উৎসাহ ও দুর্জেয় আত্মবিশ্বাস নিয়ে। সাবালক বাংলা-ভাষাকে প্রায় রাতারাতি সাবালক করার চেষ্টা বলে একে চিহ্নিত করা যায়। বাংলা গদ্যভাষার প্রথম সার্থক শিল্পী বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়-কুমারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। "অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর—বাংলার দুটা ম্যাগ্না কার্টা লেখক তত্ত্ববোধিনীতে নিয়মিতরূপে লিখিতেন" (অক্ষয়চন্দ্র সরকার)। তত্ত্ববোধিনীর গ্রাহকসংখ্যা প্রায় ৭০০ পর্যন্ত উঠেছিল। সেকালে শিক্ষিত প্রায় সকলেই এই পত্রিকার অনুরাগী পাঠক ছিলেন।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদকতার ঐতিহ্যগৌরব বোধ হয় আর কোন বাংলা সাময়িকপত্র আজ পর্যন্ত দাবী করতে পারে না। অক্ষয়কুমারের পর নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অঘোরনাথ পাকড়াশী, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (এপ্রিল ১৯১০—এপ্রিল ১৯১৫), ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। প্রায় ৮০ বছর তত্ত্ববোধিনী বাংলা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করে ধন্য হয়েছে। বাংলা গদ্যভাষা ও গদ্যসাহিত্যকে বাল্যকালে লালন করে কৈশোর ও যৌবনের মধ্যাহ্নে তার প্রখর দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হবার সৌভাগ্যও তার হয়েছে। বঙ্কিমযুগ ও রবীন্দ্র-যুগের সাধনগৌরবও তার প্রাপ্য। এরকম দীর্ঘকালবিস্তৃত সাহিত্যসাধনা আর কোন বাংলা সাময়িকপত্রের জীবনে সম্ভব হয় নি। বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশে সাময়িকপত্রের দানের ইতিহাস লেখা হলে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র জীবনের প্রত্যেকটি পর্ব অনুসন্ধানীর দৃষ্টিপথে বিচিত্র বিস্ময় উদ্ঘাটিত করবে।

তত্ত্ববোধিনীর পরে মাসিকপত্র 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' প্রকাশিত হয় (অক্টোবর ১৮৫১) রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদকতায়। বাংলাভাষার সমাদর ও মর্যাদা প্রধানত তত্ত্ববোধিনীর চেষ্টায় তখন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, এমনকি নব্য-ইংরেজীশিক্ষিতরা পর্যন্ত তার যথাবিধ গুরুত্বের প্রকাশের সম্ভাব্যতায় আস্থাবান হয়েছেন। বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সভার পরে 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (১৮৫০)। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্রূর মুখোপাধ্যায়, রসময় দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বেথুন, হজসন প্রাট, রেভারেণ্ড লং প্রমুখ এদেশী ও বিদেশী পণ্ডিতরা এই সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সভাস্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল—"to publish translations

of such works as···to provide a sound and useful Vernacular Domestic Literature for Bengal". এই সভার মুখপত্ররূপে 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়—"যাহাতে বঙ্গদেশস্থ জনগণের জ্ঞানবৃদ্ধি হয় এবং সৎ ও আনন্দ-জনক প্রস্তাব সকল প্রচার করা উক্ত সমাজের মুখ্য কল্প···আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলের পাঠযোগ্য করণার্থে উক্তপত্র অতি কোমল ভাষায় লিখিত হইবেক, এবং তত্রস্থ প্রস্তাবিত বস্তু সকলের বিশেষ পরিজ্ঞানার্থে তাহাতে নানাবিধ ছবি থাকিবেক।" পুরাবৃত্ত ইতিহাস প্রাণিবিদ্যা শিল্প সাহিত্য ইত্যাদি পত্রিকার আলোচ্য বস্তু এবং চিত্র সহযোগে আলোচনা বাংলা সাময়িকপত্রে এই প্রথম। কাজেই পত্রিকার প্রভাব ও প্রসার বৃদ্ধি পেল, সাহিত্যের পোষক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পাঠকরা আরও বেশী উৎসাহী হলেন। বাল্যজীবনে রবীন্দ্রনাথও যে এই পত্রিকাপাঠে কতদূর অভিভূত হয়েছিলেন তা 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি লিখে গিয়েছেন: "রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিকপত্র বাহির করিতেন। তাহারি পোকানো একতাড়া সেকেলারের আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বারবার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুসি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড় চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তপোষের উপর চীৎ হইয়া পড়িয়া নর্বাল তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, রুক্মকুমারীর উপন্যাস পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।"

'বিবিধার্থ'-কে খুব উচ্চশ্রেণীর পত্রিকা বললে অত্যুক্তি হবে। "অতি কোমল ভাষায় লিখিত হইবেক" বলা সত্ত্বেও রাজেন্দ্রলাল তা লিখতে পারেন নি। তত্ত্ব-বোধিনীর অক্ষয়কুমার বা বিদ্যাসাগরের মতো গদ্যভাষায় তাঁর দখল ছিল না, গুরুবিষয় সুগম গাঢ়বন্ধ ভাষায় প্রকাশের দক্ষতাও তিনি আয়ত্ত করতে পারেন নি। তাঁর পাণ্ডিত্যের তুলনায় সাহিত্যবোধ নিঃসন্দেহে অনেক কম ছিল। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে শিল্পবোধের যে মণিকাঞ্চনযোগ তত্ত্ববোধিনীতে হয়েছিল বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের মতো দু'টি 'বাঘা বাঘা' লেখকের লেখনীর গুণে, 'বিবিধার্থে' তা সম্ভব হয় নি। একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক-পাঠক 'বিবিধার্থ' সম্বন্ধে লিখে গিয়েছেন—"'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' ভক্তিপূর্বক পাঠ করিতাম। তাহা হইতে জ্ঞান পাইয়াছিলাম যথেষ্ট। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের রচনায় সাহিত্যশিক্ষার কোন সুবিধা পাই নাই, বলিতে কি ভাষাশিক্ষারও নহে।"

সাহিত্য ও ভাষাশিক্ষার জন্য তখন তত্ত্ববোধিনী ছিল, কাজেই 'বিবিধার্থের' দ্বারা সে-উদ্দেশ্য সাধিত না হলেও মধ্যবিত্ত পাঠকদের ক্ষতি হয় নি। বরং লাভ হয়েছে। সেই লাভের কথা রবীন্দ্রনাথও 'বিবিধার্থ' প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করেছেন। "সর্বসাধারণের নিত্য আহারে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ" তখন ছিল না। 'বিবিধার্থ' সেই অভাব পূরণ করে এবং মধ্যবিত্তের সাধারণ স্তরে পর্যন্ত শুকনির পাঠের অভ্যাস তৈরি করে। আজকের দিনেও যখন পঠনক্ষম শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে রুচিবিকৃত অপসাহিত্যপাঠের আগ্রহ এত প্রবল, তখন উনিশ শতকের মধ্যভাগে সুসাহিত্যের পাঠকসৃষ্টির দুরূহ কর্মে ব্রতী হয়ে 'বিবিধার্থ' একটা বড় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্তব্য পালন করেছিল।

বিবিধার্থের পর 'মাসিক পত্রিকা'র আবির্ভাব হয় (১৮৫৪)। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। দু'জনেই জিয়ো-গ্রাফার। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে ইংরেজীশিক্ষিত 'ইয়ং বেঙ্গলে'রও বাংলা ভাষাসাহিত্যের প্রতি উদাসীন মনোভাব বদলাচ্ছে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে এদেশের ইংরেজীশিক্ষিতরাও উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেন যে মাতৃভাষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও প্রসার ভিন্ন দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কল্যাণ বা সংস্কারসাধন সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগরের যুগে ও তত্ত্ববোধিনীর যুগে এই সুস্থ চেতনার বিকাশ হয় এবং তার পরিপূর্ণ প্রকাশ হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। এর পর বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে ইয়ং বেঙ্গলের পদার্পণ প্রত্যাশিত। কেবল পাশ্চাত্যবিদ্যার অন্বিতা নয়, শিক্ষাভিমান পর্যন্ত পরিবর্জন করে তাঁরা সর্বসাধারণের জন্য বাংলা সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। "মাসিক পত্রিকা" তারই নিদর্শন। সমাজের জন্য, বিশেষ করে স্ত্রীলোকদের জন্য, এই পত্রিকা। উদ্যোক্তারা ঘোষণা করেন—"বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।" প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়।

বাংলাভাষায় গম্ভীর জ্ঞানসাহিত্য রচনার পথপ্রদর্শক 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'সংবাদ প্রভাকর' তার প্রয়োজনীয়তা দ্বিধাহীন কণ্ঠে ব্যক্ত করে। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' শিক্ষিতজনের মধ্যে এই সাহিত্যচেতনার ব্যাপক প্রসারের সূচনা করে এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের প্রথম সর্গ মুদ্রিত করে

আধুনিক বাংলা কাব্যের সাধনপথের সন্ধান দেয়। অন্তঃপর 'মাসিক পত্র' বাংলা সাহিত্যের সীমানা সাধারণ স্তরে, অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদের কাছে পর্যন্ত, বিস্তৃত করতে উদ্যোগী হয় এবং প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশ করে নবযুগের বাংলা কথাসাহিত্যের সাধনপথ উন্মুক্ত করে দেয়।

এর পর 'বঙ্গদর্শনের' যুগ স্বভাবতঃই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রত্যাসন্ন হয়ে ওঠে। তার উপযুক্ত ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয় উনিশ শতকের ষাটের মধ্যে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্তরটিও দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে এবং সাহিত্যের পোষকতার অভাব অনেকটা দূর হয়ে যায়। সোমপ্রকাশ (১৮৫৮), অবোধবন্ধু (১৮৬৯), সুলভ সমাচার (১৮৭০), প্রভৃতি বাংলা পত্রিকা এই ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সর্ববিধ সমাচারক্ষুধা পরিতৃপ্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে—রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় নিয়মিত আলোচিত হতে থাকে। সোমপ্রকাশ ও সুলভ সমাচারে রাজনীতি ও সমাজচিন্তার বেশী, অবোধবন্ধুতে সাহিত্যচিন্তার বেশী। 'অবোধবন্ধু' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "বাংলা ভাষার বোধ করি সেই প্রথম মাসিক পত্র বাহির হইয়াছিল, যাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদবৈচিত্র্য পাওয়া যাইত..... বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রত্যূষ সূর্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্নাবের শুকতারা বলা যাইতে পারে।" শুকতারা 'অবোধবন্ধুর' পর প্রত্যূষ সূর্য 'বঙ্গদর্শন'। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বঙ্গদর্শন' প্রসঙ্গে : "কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেইসব বালকভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য।" বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' থেকে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আলো এল, আশা এল, সংগীত ও বৈচিত্র্য এল। কিন্তু 'বাঙ্গাল গেজেট' থেকে 'বঙ্গদর্শন' পর্যন্ত বাংলা সাময়িকপত্রগুলি অন্ধকার ও সুপ্তির বিরুদ্ধে যদি জ্বালেছিল বলেই এত আলো ও আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল বঙ্গদর্শনের যুগ।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন

অবতোষ দত্ত

প্রথমেই স্মরণ করি বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বহু উক্তির মধ্যে একটি উক্তিকে—

> নতুন যুগের জোয়ার আসে কোনো একজন বিশেষ মনীষার মনে। নতুন বাণীর পদ্য সহন করে আনে। সমস্ত দেশের মন জেগে ওঠে চিরাভ্যস্ত সংস্কার থেকে, দেখতে দেখতে তার বাণীর বদল হয়ে যায়। বাংলা দেশে তার সব চেয়ে দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর আগে ভাষার মধ্যে অলসতা ছিল। তিনি জাগিয়ে দেওয়াতে তার যেন স্পর্শবোধ গেল বেড়ে। নতুন কালের বাণী আহ্বানে সে সাড়া দিতে শুরু করলে। অল্পকালের মধ্যেই আপন শক্তি সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠল। বঙ্গদর্শনের পূর্বকার ভাষা আর পরের ভাষা তুলনা করে দেখলে বোঝা যাবে এক প্রান্তে একটা বড়ো মনের সাড়া পেয়ে দেশের সমস্ত মনে ঢেউ খেলিয়ে যায় কত দ্রুতবেগে, আর তখনি তার ভাষা কেমন করে নূতন নূতন প্রণালীর মধ্যে আপন পথ ছুটিয়ে নিয়ে চলে।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশিত হলে বাংলা দেশের ভাবের জগতে যে বিপুল পরিবর্তন এসে গেল রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিকে তার প্রায় প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য হিসাবেই গ্রহণ করতে পারি। কারণ রবীন্দ্রনাথ তখন তের বৎসরের বালক। বঙ্গদর্শনের প্রথম আবির্ভাবের সেই আলোড়নের বর্ণনা তাঁর বাল্যস্মৃতিতেও তিনি দিয়েছেন। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের আদর্শে বঙ্গদর্শন কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের সাহিত্যসাধনায় ও অভিজ্ঞতায় তার প্রমাণ রেখে গিয়েছেন কিন্তু বঙ্গদর্শন যে পূর্বযুগের আধুনিক সংস্কৃতির বাণীকে পূর্ণতা দান করেছিল, সে ইতিহাস যথাযথরূপে বিবৃত হবার প্রয়োজন আছে। বঙ্গদর্শন পূর্বাপর দুই যুগের মধ্যস্থলে ঊনবিংশ শতাব্দীর এক আলোকস্তম্ভের মতোই দাঁড়িয়ে আছে। ইংরেজ আগমনের ফলে নব্যসংস্কৃতির বাণীকে সে স্বীকার করেছে এবং পরবর্তী যুগের বাঙালির মনের গঠনে সে

পথনির্দেশ করেছে। এ কাজ বঙ্গদর্শনের প্রায় এক জনের চেষ্টাতেই সাধিত হয়েছিল। নবপর্যায় বঙ্গদর্শন সম্পাদনের ভার গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

> সম্পাদক এ কথা ভুলিতে পারিবেন না যে বঙ্গদর্শনের শাসনের মধ্যে বঙ্কিম স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন—সেই বঙ্কিমের কঠিন আদর্শ ও কঠোর বিচার তাঁহাকে সর্বপ্রকার শৈথিল্য হইতে রক্ষা করিবে।
>
> অধুনা বঙ্গদেশে যে কেহ সুলেখক আছেন, বঙ্গদর্শন তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া ঐতিহাসিক সূত্রে বঙ্কিমের কালের সহিত গ্রথিত করিয়া লইবে, ইহা বঙ্গসাহিত্য ও বাঙ্গালী লেখকদিগের পক্ষে প্রার্থনীয় বলিয়া আমরা মনে করি। কালের সহিত কালান্তরের যোগসূত্র যতই দৃঢ় হইবে তাহার পথ ততই প্রশস্ত হইতে থাকিবে। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন যদি কেবল বঙ্কিমের কালের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকে, জীবিত কালের সহিত তাহার প্রত্যক্ষ বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তবে স্বভাবের নিয়মে তাহা কালক্রমে ধূলিসমাচ্ছন্ন ইতিহাসের নিয়তমধ্যে অন্তর্হিতপ্রায় হইয়া আমাদের নিত্যব্যবহারের অতীত হইয়া যাইবে। মহাপুরুষদিগের কীর্তি এক কালকে অন্য কালের সহিত বাঁধিবার জন্য যোগসূত্রের কাজ করে।
>
> —বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ বৈশাখ পত্রসূচনা

রবীন্দ্রনাথের পূর্বোদ্ধৃত দুই উক্তি বঙ্গদর্শনের পূর্ব যুগ এবং পর যুগের উত্তরাধিকার এবং প্রত্যাহরণকেই স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছে। ঐতিহাসিক তথ্যসন্ধানের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের অভিমতই প্রমাণিত হবে মাত্র। বঙ্গদর্শন পত্রিকাতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিজের চিন্তা ও আদর্শকে প্রতিফলিত করেছিলেন। বঙ্গদর্শনে যদিও আরও অনেক লেখক ছিলেন, কিন্তু সকলের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই সৃষ্টি ও আদর্শগত ঐক্যসূত্রে বিরাজ করতেন। বঙ্কিমের এই ব্যক্তিত্ব একটি বিশেষ ব্যক্তির মাত্র ছিল না—সমস্ত দেশের এবং সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা চিন্তাকল্পনা কর্ম ও আদর্শকে তিনি নিজের মধ্যে সংহত করে নিয়েছিলেন। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবজীবনের পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করতে গেলে উনবিংশ শতাব্দীর মনোজগৎকেই জানতে হয়। বঙ্কিমের ব্যক্তিত্বের নানা দিকের পূর্ণ পরিচয় বহন করছে বঙ্গদর্শন।

বঙ্গদর্শনের বঙ্কিম সম্বন্ধেও একটি কথা মনে রাখা দরকার। বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্বে বঙ্কিম ছিলেন কেবলমাত্র ঔপন্যাসিক। দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬) মৃণালিনী (১৮৬৯) এবং একটি ইংরেজি উপন্যাস Rajmohan's Wife (১৮৬৪)— এই তিনটি উপন্যাস বঙ্গদর্শনের আগে তিনি লিখেছিলেন। তা ছাড়া দুটি ইংরেজী প্রবন্ধ Popular Literature of Bengal এবং Bengali Literature ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে বেরিয়েছিল বৃথাভাবে ম্যাগাজিনে। ঔপন্যাসিকার হিসাবে বঙ্কিমের প্রতিষ্ঠা এতে হলেও প্রাবন্ধিকার মনীষী হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা বঙ্গদর্শনের যুগে। ইংরেজী প্রবন্ধ দুটিকে বঙ্গদর্শনের যুগে ফেলতে পারি। তার পূর্বে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নি যে শুধু কল্পনার ক্ষেত্রেই নয়, মনীষার ক্ষেত্রেও এক মহান নেতৃত্বশক্তির আবির্ভাব ঘটবে। আমাদের জ্ঞানবৃত্তি এবং আদর্শশক্তির ক্ষেত্রেও তিনি সমান মহিমাতেই দেখা দিলেন। বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার পূর্ণ রূপ প্রকাশ পেল। বঙ্গদর্শন দেখা দিল বঙ্কিম প্রতিভার পূর্ব সিদ্ধি নিয়ে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পত্রিকার নাম বঙ্গদর্শন দিয়েছিলেন কেন, তার কোনও কারণ তিনি দেখান নি। সব সময় অবশ্য পত্রিকার নামের একটা উপলক্ষ্য থাকবে, এমন আশা করা যায় না। তবু বঙ্গদর্শন নামটিতে বাংলা দেশ সম্বন্ধে যে কৌতূহল এবং অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ পেয়েছে তা কখনই লক্ষ্য এড়িয়ে যেতে পারে না। বঙ্গদর্শন-পূর্ব যুগে বাংলা পত্রিকার নামের সঙ্গে এর নাম-করণের তুলনা করে কয়েকটি অনুমান আমরা সহজেই করতে পারি। শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত দিগ্‌দর্শন থেকে রহস্যসন্দর্ভ পর্যন্ত পত্রিকাগুলিতে সত্যই বঙ্গদর্শনের মতো কোনও অনুপ্রেরক মনোভাব কাজ করেনি। প্রথম যখন আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটছিল তখন সত্য সত্যই বিদ্যার বহুবিস্তারই ছিল আমাদের আগ্রহের বিষয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের কাছে জ্ঞানের দ্বার মুক্ত করে দিয়েছিল। ভূগোল ইতিহাস বিজ্ঞানের নানা দিকের সঙ্গে ক্রমপরিচয় আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে আগ্রহ করল, আধুনিক শিক্ষা তার কাছে বিশ্বের সংবাদ পৌঁছে দিল। এই বিচিত্র বিদ্যার সংবাদ নিয়ে আমাদের প্রথম যুগের পত্রিকা দিগ্‌দর্শন হয়েছিল সার্থকনামা। শ্রীরামপুর মিশনের সমাচার দর্পণ, রামমোহনের সম্বাদকৌমুদী অথবা ঈশ্বর

তত্ত্বের সংবাদ প্রভাকর—এদের নামকরণের মধ্যে কোনও আদর্শ ব্যক্ত হয়নি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তো প্রধানত ছিল ধর্ম পত্রিকা। ধর্মতত্ত্বের আলোচনাই তার উদ্দেশ্য ছিল। সেই অর্থে 'তত্ত্ববোধিনী' নামকরণ যথার্থ। রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে তাঁর বাল্যে পঠিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহের মত পত্রিকার অভাব বোধ করেছেন। সেই বিবিধার্থ সংগ্রহও ছিল ইতিহাস এবং অন্যান্য প্রকৃতি বিজ্ঞান চর্চার প্রধান মুখপত্র। রহস্য সন্দর্ভও তাই। কোনও আদর্শভিত্তি মনের আকাঙ্ক্ষা এতে প্রতিফলিত হয়নি। এই সব পত্রিকা তত্ত্ব, বিজ্ঞান অথবা সংবাদ মাত্র আলোচনা করেছে। এদের মধ্যে একমাত্র দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সোমপ্রকাশ পত্রিকাটির অবশ্যই বিশিষ্টতা ছিল: সমকালীন জাতীয় জীবনের সমস্যা অভাব অভিযোগ আলোচনা করে বাঙালীকে সংহত করে নিয়ে আসবার চেষ্টা করেছিল এই সুসম্পাদিত পত্রিকাটি। এ দিক দিয়ে বঙ্গদর্শনের অভিপ্রায়ের সঙ্গে এর মিলও ছিল। কিন্তু বঙ্গদর্শনের লক্ষ্য ছিল আরও সুস্পষ্ট। এই নামটিতেই একটি বিশেষ উদ্দেশ্য এবং আকুলতা ব্যক্ত হয়েছে। একটি ব্যক্তি মনের জিজ্ঞাসা এতে অঙ্কিত। সোমবারে প্রকাশিত হত বলে 'সোমপ্রকাশ' নাম, আর বাংলাকে জানতে চাই বলে নাম বঙ্গদর্শন। বাংলা দেশ এবং বাঙালীকে জানবার আকাঙ্ক্ষা শুধু ভৌগোলিক অথবা ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যেরই চরিতার্থতা খোঁজেনি, এ দেশের সমাজ জীবন ধর্ম এককথায় তার পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের রূপ ও রহস্যকেই উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছে। বঙ্গদর্শন নিছক একটি পত্রিকা নয়। বঙ্গদর্শন একটি দৃষ্টিভঙ্গি, একটি মূল্যবোধ, যা পরবর্তী বাঙালী জাতিকে গড়েছে।

ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখলে বঙ্গদর্শনের ভাবগত অনুপ্রেরণার একটি পূর্বতন ধারা আছে। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সভ্যরা 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকার নামকরণের সময় খুব সম্ভবত এর কথাই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ছিল। মনে রাখার কারণও ছিল। বঙ্গদর্শনের যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ ছিল নব্যবঙ্গদলেরই মতো। ধর্মতত্ত্ব-যুগের আদর্শের কিছু কিছু ক্ষীণ স্মরণ এ যুগে দেখা গেলেও বঙ্গদর্শন সম্পাদনার সময় বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন অনেকটা পূর্ব যুগের মননাদর্শে দীক্ষিত। বঙ্গদর্শনের প্রকাশ কাল থেকে শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য জীবনকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে দেখতে পারি। প্রথম পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র নব্যবঙ্গদলের

স্বাধীন মুক্ত চিন্তার উত্তরাধিকার বহন করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ওঁর চিন্তা কয়েকটি স্থির মূল্যবোধে রূপ পরিগ্রহ করে। মধ্যবঙ্গ দলের মতোই প্রথম পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র কোনো সুনির্দিষ্ট সামগ্রিক জীবনদর্শন গড়ে তোলেননি। বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন ঐতিহাসিক এবং সমাজ তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে। বৈতানিক বেঙ্গল স্পেক্টেটরে এই রকমই বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হত; বিশেষত সমাজ ও দেশের বর্তমান অবস্থা নৈতিক সংস্কার সামাজিক পুনর্গঠন বিষয়ে নানা আলোচনায় এই পত্রিকা পূর্ণ থাকত। সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নের আলোচনা প্রসঙ্গে ইতিহাস চর্চা ছিল ওঁদের মুখ্য বিষয়। নবাগতের মনোধর্মকে বঙ্কিম কতখানি গ্রহণ করেছিলেন তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। জর্জ টমসনের উপদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে প্যারীচাঁদ মিত্র ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখন The Zemindar and the Ryot (১৮৪১)। পরবর্তীকালে প্যারীচাঁদের ওই অবলম্বনে কিশোরীচাঁদ লিখেছিলেন The Ryot and the Zemindar (১৮৫১) সঞ্জীবচন্দ্র লিখেছিলেন The Peasantry of Bengal (১৮৭৯) এবং বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধ 'বঙ্গদেশের কৃষক'। বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক চিন্তাকে মাতৃভাষা বাংলার ভিতর দিয়ে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গদর্শন সম্পাদনার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র সচেতন ভাবে এই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন।

শিক্ষাতত্ত্বে Filtration theory নামে একটি কথা প্রচলিত হয়েছিল মেকলের সময়ে। এই নীতি অনুসারে সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে উচ্চ-শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়। আশা এই যে এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংসর্গে সাধারণ লোকেও শিক্ষার ফল ভোগ করবে। আমাদের উনবিংশ শতাব্দীতে দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষানীতি নিয়ে বহু পরিকল্পনা হয়েছে। ইংরেজী শিক্ষার আদর্শ যখন দেশে সরকারী অনুমোদন লাভ করল তখন আর একটি সমস্যা পরিকল্পকদের মনে উদিত হল। দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ ব্যক্তিদের বোধ-হয় আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিতই রাখা হল। এ দিকে ইংরেজী শিক্ষা যারা পেল, স্বভাবতই দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তারা দেখতে পেল। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তো বটেই ইংরেজ সমাজে প্রতিপত্তিলাভের মোহেও তারা মুগ্ধ হল। দেশের অগণিত জনসাধারণের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটল। আমাদের

আধুনিক সভ্যতালোকের কোলাহলে সেটা চোখে পড়ল না। তখন কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা ধীর মস্তিষ্কে এ কথাটা ভেবেছিলেন। হার্ডিঞ্জ এবং বিদ্যাসাগর চেষ্টা করেছিলেন এই বিচ্ছেদ দূর করতে—শিক্ষিত সমাজকে অবনত সমাজে ফিরে যাবার অপেক্ষায় চেষ্টা না করে অবনত সমাজকেই শিক্ষিত করে তুলতে। কিন্তু তাদের চেষ্টা সার্থক হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও ফিল্ট্রেশন তত্ত্ব রূপ দেবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের এক সভায় কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেছিলেন সমাজের শিরোভাগকে উচ্চ স্তরের সাহায্যে শিক্ষিত করে তুলবার পন্থাই যথার্থ পন্থা। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে এর উত্তরে বললেন—

The theory of downward filtration of education however flattering to the pride of the higher classes has never verified in history.

—H. A. Stark, Vernacular Education in Bengal p89.

বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার পত্রসূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন :—

এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে এডুকেশন ফিলটর ডৌন করিবে। এ কথার তাৎপর্য এই যে কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অন্যশ্রেণীর লোকদিগকে পৃথক শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান হইয়া উঠিবে। যেমন শোধক পদার্থের উপরিভাগে জলসেক করিলেই নিম্নতর পর্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল বাঙ্গালী জাতিরূপ শোধক মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে নিম্নতর অর্থাৎ ইতরলোক পর্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে। জল থাকাতে কথাটা একটু তরল হইয়াছে বটে। ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে এরূপ সম্বন্ধ না হইলে আমাদের দেশের উন্নতির এত ভরসা থাকিত না।

আমাদিগের দেশের লোকের এই জলময় বিদ্যা যে এতদূর গড়াইবে, এমত ভরসা আমরা করি না। বিদ্যা জল বা দুগ্ধ নহে যে উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্য হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে। কিন্তু যদি ঐ দুই অংশের ভাষার এরূপ ভেদ থাকে যে বিদ্বানের ভাষা মূর্খে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে?

বাংলা দেশের শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে বঙ্গদর্শনের পরিকল্পনার এই যোগ অবশ্য-লক্ষ্য। দেশের লোকের সঙ্গে জ্ঞান বিজ্ঞানের যোগস্থাপন করবার আকাঙ্ক্ষা বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষণা করেছিলেন বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায়। সাধারণের চিত্তক্ষেত্রে আধুনিক চিন্তাকে পৌঁছে দেওয়াই ছিল তার বাসনা। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রবর্তনের সঙ্গে সমগ্র জনসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাচ্ছে, একদল লোক ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, আর বৃহৎ একদল সে শিক্ষায় বঞ্চিত, মুসলমান সম্প্রদায়ে বন্দী। বঙ্কিম একদিকে যেমন আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার প্রসার সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করেছিলেন, আর একদিকে তেমনি সেই বিদ্যা যেন 'পাথরে পাঁচা কুতোর' মধ্যে বন্ধ থেকে সমস্ত দেশকে কৃপার্হ করে না রাখে সেদিকে ছিল তার নিরন্তর আকাঙ্ক্ষা। বহুকাল পর রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধটির মধ্যে আমাদের দেশে আধুনিকী বিদ্যাকে এই ভাবেই মণ্ডিত হতে দেখেছিলেন। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র চেষ্টা করেছিলেন শিক্ষাকে বাংলা ভাষার সাহায্যে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে দিতে।

বঙ্গদর্শনের পরিকল্পনা হয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে, বঙ্কিমচন্দ্র তখন মহরমপুরে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে বঙ্কিম মহরমপুরে বদলি হন, সেখানে তিনি ছিলেন ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি পর্যন্ত। মহরমপুরে তখন সেকালের অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিকের মিলন হয়েছিল—দীনবন্ধু মিত্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন, লোহারাম শিরোরত্ন, গঙ্গাচরণ সরকার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাদাস সেন, এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়। রেভারেণ্ড লাল-বিহারী দে এই সময় মহরমপুরেই অধ্যাপনা করতেন। এঁরা সকলেই যে সাহিত্যশিল্পী ছিলেন তা' নয়, এঁরা ছিলেন পণ্ডিত ও মনীষী। মহরম-পুরেই বঙ্কিমচন্দ্রের বৃহত্তর জাতীয় চিন্তাধারার একটা অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। উপন্যাস রচনার প্রেরণা বঙ্কিমের নিজের। এ কথা সত্য, আজকালের মতো বঙ্কিমচন্দ্র বিশুদ্ধ সাহিত্যচর্চা করবার জন্যই বঙ্গদর্শন প্রকাশ করেন নি। ইতিহাসচর্চা, জাতীয় প্রকৃতি আলোচনা, বিজ্ঞানালোচনা অর্থনীতি দর্শন, সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠাগুলি পূর্ণ থাকত। এই সব রচনার নীচে অনেক সময়েই লেখকের নাম থাকত না। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাগুলি পরে সংকলিত হয়ে পাঠকদের নিকট পরিচিত হয়েছে। যাঁদের নাম দেওয়া ছিল তাঁদের মধ্যে রাধাদাস সেন, প্রাণনাথ পণ্ডিত, গোপাল

কৃষ্ণ ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য রচনার কতকগুলি পরবর্তী-কালে লেখা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গদর্শনের রচনাগুলির মধ্যে যে ভাবগত ঐক্য ছিল, এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই ঐক্যের মূল কেন্দ্র ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের যে উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ছিল বঙ্গদর্শন পরিকল্পনার মূলে সেটা প্রথম পর্যায় সম্পাদনার প্রথম চার বৎসর অক্ষুণ্ণ ছিল। উদ্দেশ্য বিচার করে বঙ্গদর্শনের রচনাগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর রচনা ব্যাখ্যামূলক ইতিহাস বিজ্ঞান অর্থনীতি জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা। ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির আধুনিক প্রণালীতে পর্যালোচনা, নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ, য়ুরোপীয় সভ্যতার আলোচনা, কোমতীয় অন্যান্য প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যাখ্যা ও সূত্র নির্ণয় প্রভৃতিকে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবন্ধ ছিল উদ্দীপনামূলক। ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনা সূত্রে বাঙালীকে কর্মগৌরবে উদ্দীপিত করে তোলাই ছিল এই শ্রেণীর প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যাতেই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'ভারতকলঙ্ক': এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষে রণনীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করে বাঙালীকে শৌর্যে ও বীর্যে নতুন করে জেগে উঠতে আহ্বান করেছেন। এই শ্রেণীর আরও প্রবন্ধ 'উদ্দীপনা' 'মনুষ্য জাতির মহত্ত্ব কিসে হয়' 'স্বতাহানুবর্তিতা' ইত্যাদি। এই প্রবন্ধগুলিতে লেখকের নাম ছিল না। কিন্তু শরদাগত যে উৎসাহ উদ্দীপনা আশা আকাঙ্ক্ষার সুর সেকালে হেমচন্দ্র ও অন্যান্য কবির কাব্যে ধ্বনিত হচ্ছিল যুক্তি ও ইতিহাসের দ্বারা সেই কর্মস্পৃহাকে বঙ্গদর্শন বাঙালীর অন্তরে উদ্বুদ্ধ করে তুলছিল। উপন্যাস কবিতা ইত্যাদিকে বঙ্গদর্শনের তৃতীয় এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করব। পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্র শাণিত করতে চেয়েছেন বাঙালীর বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মশক্তিকে আর এই শ্রেণীর রচনায় শাণিত করতে চেয়েছেন বাঙালীর হৃদয় এবং রসানুভব শক্তিকে। পরে বঙ্কিম মনুষ্যত্বকে জ্ঞানার্জনী কার্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী এই তিন বৃত্তির সমন্বয় বলে যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন, বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র তারই সূত্রপাত করেছিলেন, যদিও এই সময়ে অনুশীলনতত্ত্ব স্পষ্টরূপে তাঁর মনে ধরা দেয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন চার বৎসর চলেছিল। এই চার বৎসরে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের অনেক নূতন ভাবের সূত্রপাত করে গেলেন। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র যা চালান দি, তা পরে চলেনি, তিনি যা চালিয়েছিলেন বাংলায় তাই চলেছে। শুধু উপন্যাসের শিল্পরূপের দিক দিয়ে নয়, ভাবচিন্তার ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্রের যে অনুপ্রেরণা কার্যকরী হয়েছে, তা মূলত বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ হয়েছে। জীবনতত্ত্ব সম্পর্কিত দুটি মূল ভাববীজের উল্লেখ করতে পারি, যা বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে বিস্তৃত করে আলোচনা করেছিলেন এবং বাঙালীর চিন্তাশক্তির মূলে যা গভীর এবং সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। 'আলোয়ালার অট্টালিকা' (বঙ্গদর্শন অগ্রহায়ণ ১২৮১) প্রবন্ধে প্রথম পাই সত্যের সংজ্ঞা নির্ণয়ের প্রয়াস। রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে যে বিতর্ক বঙ্কিমচন্দ্রের হয়েছিল, যা মানুষেরই মৌলিক মূল্যবোধ থেকেই উদ্ভূত, তার সূত্রপাত হয়েছিল এই প্রবন্ধে। বঙ্গিমদর্শনের আর একটি মূল তত্ত্ব ছিল মনুষ্যত্বের স্বরূপ নির্ণয়। বঙ্গদর্শনের ১২৮৪ র আশ্বিন সংখ্যায় 'মনুষ্যত্ব কি' প্রবন্ধে এর সূত্রপাত ঘটে। এও বাঙালীর চিন্তাকে কতখানি অধিকার করেছিল পরবর্তীকালে তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩)। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র যেসব উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের পৃথক আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

১

বিচিত্রকর্মা বিরাট রবীন্দ্রনাথ পত্র-পত্রিকার সম্পাদকরূপেও বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব একটি ইতিহাস রেখেছেন। তাঁর সেই পরিচয়টিও নানা দিক থেকে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। শুধু ঐতিহাসিক ধারা রক্ষার প্রয়োজনেই নয়—এই সম্পাদক দৃষ্টি কখনো কখনো তাঁর সাহিত্য-সাধনার যে এক একটি নব পর্যায় যোজনা করে দিয়েছে, কিঞ্চিৎ সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই সেটি অনুধাবন করা যাবে। আমার মনে হয়, এ নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ও পৃথুল গবেষণা গ্রন্থ রচনা করা যেতে পারে এবং তাঁর শত-বার্ষিকীর স্মরণলগ্নে সেটি আমাদের একটি প্রধান কর্তব্যের অন্যতম।

এই আলোচনা তারই কয়েকটি সূত্র নির্দেশ মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের সম্পাদক জীবনের প্রথম সূচনা ১২৮২ সালে। এই বছরের বৈশাখ মাসে সত্যেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 'বালক' নামে যে পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ঠাকুরবাড়ীর বালকদের সাহিত্য রচনায় উৎসাহ যোগানো। জ্ঞানদানন্দিনী সম্পাদিকা হলেন, রবীন্দ্রনাথকে এর কার্যাধ্যক্ষের দায়িত্ব নিতে হল।

নামে কার্যাধ্যক্ষ, বস্তুত পত্রিকাটির সমস্ত ভার গ্রহণ করতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকেই; বালক প্রচারিত হয়েছিল মাত্র এক বৎসর কিন্তু এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশটিরও বেশি লেখা এতে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস, পত্রসাহিত্য—সর্বক্ষেত্রেই লেখনী চালনা করেছেন তিনি।

বালকের প্রথম সংখ্যাতেই মুদ্রিত হল তাঁর শিশু কবিতা 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।' তারপর, এল 'দাদা ভাই চম্পা' 'হাসি-রাশি,' 'খা-লক্ষ্মী'। 'শিশু' এবং 'শিশু ভোলানাথের' সূত্রপাত ঘটল। এরই পাশাপাশি এল তাঁর প্রথম (এবং শেষ) কিশোর উপন্যাস 'রাজর্ষি'। বিদেশী

তারাতো নামে অনেকগুলি 'ছেলেদি নাটক'ও বালকে লেখা হয়—পরে সেগুলি 'হাস্য-কৌতুক' নামে সংকলিত হয়েছে।

এ ছাড়া তরুণ পাঠক পাঠিকাদের মনে স্বাদেশিকতা সঞ্চারের জন্য তিনি বিশেষভাবে শিখ রাজপুত ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বনে কয়েকটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। 'মহা সিং', 'তেগ বাহাদুর' প্রভৃতির এই আখ্যান, উপাখ্যান তাঁর কবিতায় 'কথা ও কাহিনী'র অনুরূপ।

বালক পত্রিকার সাহিত্যে এসে রবীন্দ্রনাথের এই তিনটি দিক সম্প্রসারিত হল:

(ক) শিশু কবিতা

(খ) শিশু উপন্যাস

(গ) শিশু নাটক (তাঁর নাটক 'মুকুট'ও একটি গল্পের আকারে বালকের দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল)

বালকে, পত্রোক্ত সম্পাদনার পূর্বে, শিশু সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের হাতেখড়ি হল। কিন্তু তারও চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল আরো ছয় বৎসর পরে—১২৯৮ সালে।

আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় 'সাপ্তাহিক হিতবাদী' পত্রিকা দেখা দিল। 'মনোহর এবং হিতকরের' সমন্বয় ঘটিয়ে, দেশের তৎকালীন বিবাদী চিন্তাধারার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করাই 'হিতবাদী'র মৌল উদ্দেশ্য ছিল। এই পত্রিকার 'সাহিত্য সম্পাদক' নির্বাচিত হলেন রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু 'সাহিত্য সম্পাদক' তখন কলকাতা ছেড়ে পলাতক। 'ভাঙার বড়ো কিটিমিটি' দেখে তখন তিনি 'জলে বাসা' বেঁধেছেন—পদ্মার বিশাল স্রোত বেয়ে তাঁর বোট চলেছে বাংলা দেশের ভেতর দিয়ে। 'সাহিত্য সম্পাদকে'র কাজ থেকে আর কোনো সক্রিয় সহযোগিতা কর্তৃপক্ষের সেদিন প্রত্যাশিত ছিল না—তাঁরা পত্রিকাকে আকর্ষণীয় করবার জন্যে প্রতি সপ্তাহে একটি করে ছোট গল্প রচনার ফরমাস তাঁকে দিয়েছিলেন।

'হিতবাদী'র কর্তৃপক্ষ সেদিন কল্পনাও করেননি রবীন্দ্রনাথকে সাপ্তাহিক গল্প যোগানোর দায়িত্ব দিয়ে তাঁরা শুধু বাংলা ছোটগল্পের দ্বারই মুক্ত করে দিলেন না, পৃথিবীর অন্যতম প্রধান গল্প লেখককে তাঁরা আহ্বান জানালেন।

পদ্মার তীরে, চলন বিলের ধারে ধারে, সাগর নদীর দুপাশে শিলাইদহ-পতিসর-সাজাদপুরে যে বাংলাদেশ এবং বাঙালীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক পরিচয় ঘটল—তারই অকৃত্রিম রূপ মেলা দিল 'মেলা-পাওয়া' 'দোই গ্রামার' 'ধাবমান' কিংবা 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা'য়। কবি রবীন্দ্রনাথ অকস্মাৎ নিজের ভেতরে গল্প লেখকের সুপ্ত শক্তিকে অনুভব করলেন। বাংলা সাহিত্যে সার্থক ছোট গল্পের আবির্ভাব ঘটল।

কিন্তু সেদিন এই গল্পগুলির সাহিত্যমূল্য 'হিতবাদী'র পরিচালকেরা অনুমানও করতে পারেনি। অচেতনভাবে যে শক্তিকে তাঁরা উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, অজ্ঞানের মতোই তাঁরা তাকে আঘাত করলেন। তাঁরা দাবি জানালেন এই সব গভীর গম্ভীর রচনা তাঁদের পাঠকদের পক্ষে গুরুপাক, অতএব অনুরোধ পাঠকদের হিতার্থে রবীন্দ্রনাথ যেন অতঃপর কিছু পরিবেশন করেন।

রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। পদ্মার বিরাট জল-ধারা তাঁর চোখের সামনে যে বিপুল সুন্দর গভীর জীবনের সংকেত এনেছিল তার নিরন্তরতার মধ্যে লঘুতার উপাসনা তাঁর পক্ষে সেদিন অসম্ভব ও অবান্তর বলেই মনে হল। দু'টি গল্প লিখবার পরে হিতবাদীর সঙ্গে তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। তাঁর গল্পগুলি নতুন মুক্তিমুখ খুঁজে পেল ঠাকুরবাড়ী থেকে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত নতুন মাসিক পত্রিকা 'সাধনা'য়।

২

"দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণ তলে
অনেক অর্ঘ্য আনি,
আমি অভাগা এনেছি বহিয়া নয়ন জলে
ব্যর্থ সাধন খানি—"

তিন বৎসর 'সাধনা' চালাবার পরে রবীন্দ্রনাথ আর পত্রিকাখানির ভার বহন করতে পারলেন না। চতুর্থ তথা শেষ বৎসরে—অর্থাৎ ১৩০১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 'সাধনা'র যাবতীয় অর্পিত হল রবীন্দ্রনাথের উপর। বালক এবং হিতবাদীর পরোক্ষ ও আংশিক সম্পাদনার পর এইবারে পূর্ণ সম্পাদকের মর্যাদায় দেখা দিলেন তিনি।

তখন ভারতবর্ষের রাজনীতিক আবর্তচক্রে আলোড়ন চলেছে। মহারাষ্ট্রে তিলকের আবির্ভাব, হিন্দু জাতীয়তাবাদের সংস্কার অভ্যুদয়, হিন্দু-মুসলিম বিরোধের বিষাক্ত পরিবেশ। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় ও প্রবন্ধে সেই মুসলমান প্রতিফলিত হচ্ছে। হিন্দু-মুসলিম অধিবাসের প্রেক্ষাপটে প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর তির্যক কাহিনী 'দালিয়া', ধর্মের রক্ষণশীলতার উর্ধ্বে মনুষ্যত্বের মহিমায় লেখা দিচ্ছে 'অনধিকার প্রবেশ', 'বোধ ও রৌদ্রে'র আলোচনায় ক্ষুব্ধ ও অপমানিত সামাজিক এবং রাজনীতিক চেতনা দীপ্ত হয়ে উঠছে।

'সাধনা'র সম্পাদনা এই অবস্থার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেন। তাঁর সম্পাদিত প্রথম সংখ্যার 'সাধনা' কবিতায় কাব্যলক্ষ্মীর উদ্দেশে রোমান্টিক আকুতিটি আত্মপ্রকাশ করল বটে, কিন্তু বাইরের সিদ্ধান্ত ও বিপর্যয়ের মধ্যে তিনি এখন মুক্তির বহির্মুখী। ওই প্রথম সংখ্যাতেই 'সুবিচারের অধিকার' নামে তাঁর যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল তাতে তিনি আত্মশক্তির বিকাশ এবং আত্মসাধনার বাণীই দীপ্ত ভাষায় ঘোষণা করলেন।

কিন্তু সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বিকশিত হল এই সব রাজনীতিক আলোচনার আশ্রয়ে নয়। 'ইম্প্রেশনিস্টিক' সাহিত্য-সমালোচনার একটি অপূর্ব নিদর্শন ইতঃপূর্বেই তিনি উপস্থিত করেছিলেন তাঁর 'রাজসিংহে'। সেটি প্রকাশিত হয় ১৩০০ সালের 'সাধনা'র চৈত্র সংখ্যাতে। বুদ্ধি-বিকশিত এবং মর্মগ এমন সমালোচনা কেবল রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব :

> "প্রথম প্রথম তাহাতে কেবল আলোকের ঝিকিমিকি এবং চঞ্চল লহরীর তরল কলকলি—তাহার পর ষষ্ঠ খণ্ডে দেখি জলনি গভীর, স্রোতের পথ গভীর, এবং জলের বর্ণ যেন কৃষ্ণ হইয়া আসিতেছে। তাহার পর সপ্তম খণ্ডে দেখি কতক বা নদীর স্রোত, কতক বা সমুদ্রের তরঙ্গ, কতক বা অঘোষ পরিণামের মেঘগম্ভীর গর্জন, কতক বা তীব্র সমবাত্রমিশ্রিত জনসমুদ্রের সুগম্ভীর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, কতক বা ব্যক্তিবিশেষের মর্মভেদী তরঙ্গীর প্রাণপণ হাহাকার। সেখানে মৃত্যু অতিশয় রুদ্র, ক্রন্দন অতিশয় তীব্র এবং ঘটনাবলী আরব্ধ ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।"

'রাজসিংহে' রবীন্দ্রনাথ এই যে অন্তর্ম সমালোচনার ধারা প্রবর্তন করলেন, বর্তমানীন সম্পাদকতায় এইটিই বিশেষভাবে প্রাধান্য হয়ে উঠল।

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'সাধনা'র প্রথম সংখ্যায় এই পর্যায়ের দুটি সমালোচনা প্রকাশিত হল, একটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আর্যগাথা'র, অন্যটি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'মুলতানি'র। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিভার বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা প্রবন্ধটি 'সঞ্জীবচন্দ্র—পালামৌ' লেখা দিল পরবর্তী সংখ্যায় (পৌষ) এবং বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র'কে কেন্দ্র করে প্রবল বিতর্কমূলক প্রবন্ধটি আত্মপ্রকাশ করল পর পর সংখ্যায়—মাঘে এবং ফাল্গুনে।

কিন্তু 'বালকে'র মতোই এক বছর পরেই রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'র সম্পাদনা থেকে মুক্তি নিলেন। "কাগজ, সমস্ত ক্যাপামি করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই এবং সমস্তর অপ্রমত্ততা বজায় রেখে চলা" রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দুঃসাধ্য। আরো একটা কারণ ছিল। 'বালকে'র ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত প্রধানাংশ রচনাই রবীন্দ্রনাথকে লিখতে হত। সাহিত্যের মান সম্পর্কে সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের আদর্শের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা অন্য লেখক-লেখিকার পক্ষে অসাধ্য হবে দাঁড়াত এবং বাস্তবিকভাবেই শেষ পর্যন্ত পত্রিকার উদর পূর্তির সমস্ত ভার গ্রহণ করতে হত রবীন্দ্রনাথকেই। অতএব অচিরেই রবীন্দ্রনাথের ধৈর্যচ্যুতি ঘটত। 'বালকে'র পুনরাবৃত্তি 'সাধনাতে'ও দেখা গেল—এক বছর পরেই 'সাধনা'র পত্তী থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বৃহত্তর জীবনে পুনঃপ্রবেশ করলেন।

আর এই এক বৎসরে তিনি 'সাধনা'র পাতায় প্রধান ভাবে রেখে গেলেন সাহিত্য-গ্রন্থ সমালোচনার এক ঐতিহাসিক দৃষ্টিত্ব—যা পরবর্তী-কালে বাংলা সাহিত্যে কিছু কিছু অনুসৃত হলেও কখনোই সম্পূর্ণ অনুসৃত হতে পারে নি।

৩

কিন্তু 'আবার আমরা।'

এবারও এল একটি পারিবারিক পত্রিকার পক্ষ থেকেই। বাংলা সাহিত্যে সুদীর্ঘ জীবনীশক্তির অধিকারী, নামা মনীষী এবং সাহিত্যিকের প্রতিভা ধারণকারী এই পত্রিকার নাম 'ভারতী'। ১২৮৪ সালের শ্রাবণে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'ভারতী'র আবির্ভাব, স্বর্ণকুমারী, হিরণ্ময়ী ও সরলা দেবীর সম্পাদনায় জ্ঞানাঙ্কুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সৌরীন্দ্রমোহন

মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে ১৩২৪ সালে—অর্থাৎ এক চল্লিশ বছরে এর সমাপ্তি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যেন সমস্ত স্তর এই পত্রিকায় বিধৃত হয়েছে—অর্থাৎ বঙ্কিমের যুগ থেকে প্রাক্-কল্লোল পর্যায় পর্যন্ত এর বিস্তার।

১৩০৪ সালে 'ভারতী'র সম্পাদক হলেন রবীন্দ্রনাথ।

কল তখনো গল্পের মধ্যে তন্ময়। ১৩০৫ সালের বৈশাখ মাসে লিখছেন 'হয়াশা'—কারো কারো মতে তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প। জ্যৈষ্ঠে 'পুত্রযজ্ঞ', আষাঢ়ে 'ডিটেকটিভ', শ্রাবণে 'অধ্যাপক', আশ্বিনে 'রাজটীকা', অগ্রহায়ণে 'মণিহারা', আর পৌষে 'দৃষ্টিদান।'

ভারতবর্ষে সবাসে সইছে রাজনীতির তুফান। বোম্বাইয়ে প্লেগ দেখা দিল, এল প্লেগ অফিসার। তার দুঃসহ অত্যাচারে হিংস্র প্রতিশোধ জেগে উঠল, প্লেগ অফিসার র‍্যাণ্ড্ নিহত হলেন। টিলককে সেই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত করে নানা চালালেন ইংরেজ সরকার—এই অন্যায়ের প্রতিরোধে রবীন্দ্রনাথ আসরে নামলেন। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে ক্রোধের গর্জন জাগল, এল ইংরেজের 'প্লেগ অ্যাক্ট'—রবীন্দ্রনাথ লিখলেন তাঁর তীব্র প্রবন্ধ 'কণ্ঠরোধ।'

এরই কিছু পরে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'র সম্পাদক। বিদেশীর আমলাতন্ত্র তো আছেই, কিন্তু তাঁর সুতীক্ষ্ণ ঘৃণা বর্ষিত হল সেই সব ইংরেজের পদলেহী স্বদেশীর প্রতি—যারা জাতীয় অবমাননার এই পরম দুর্দিনেও আত্মমর্যাদাজ্ঞান বিসর্জিত।

উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে এবং কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে একটি ইংরেজি প্রবন্ধে জ্ঞাপন করেন যে দেশীয় জমিদারেরাই যথার্থ জাতির 'ভাগ্যবায়ু সীজার'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই ভাষ্য সম্পর্কে 'ভারতী'র ভাদ্র সংখ্যায় 'যুযুৎসু মনাম যাঁড়ুজ্জে' প্রসঙ্গে লিখছেন:

'তার অ্যালক্রেড্ ক্রফট্ হয়তো ভালো লোক এবং বড়োলোক, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁহা অপেক্ষা অনেক বেশি ভালো লোক এবং বড়ো লোক, এবং সকলের বেশি, তিনি আমাদের স্বদেশী লোক। কিন্তু ক্রফট্ সাহেব কাজ ছাড়িয়া স্বদেশে গিয়াছেন, সেই শোকে বিহ্বল হইয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণে ধনীগণ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন; আর বিদ্যাসাগর উচ্চ সংসার

ত্যাগ করিয়া গেলেন, দেশের ধনশালীরা কোনোপ্রকার চেষ্টা করিলেন না। ইঁহারা দেশের জাচারাল লীডর। আমাদের স্বাভাবিক চালক। ইহারা কোন দিকে আমাদের চালনা করিবেন? আমাদের দেশের মহোচ্চ সদাশয়-দিগের দিকে নহে, ইংরাজ মেজোসাহেব, সেজোসাহেব ছোটোসাহেবের দিকে; আমাদের দীনহীন দেশের অজস্র অভাবমোচনের দিকে নহে, সাহেবের সিকুরবনে সন্তের বাঘের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের দিকে। সাহেব রাজ-কর্মচারীরা বিলাতে চলিয়া গেলে দেশীয় ধনীগণ তাঁহাদের প্রতিমাকাশন করিবেন ইহাতে আমরা আপত্তি করি না, কিন্তু দেশীয় পুণ্যজনের জন্যও যদি সেই পরিমাণে কিছু ত্যাগ স্বীকার করেন তবে দেশের নাবকলে তাঁহাদের কথঞ্চিৎ দাবি থাকে।"

এই তিক্ততাই প্রকাশিত হল একটি নিদারুণ ব্যঙ্গগল্পের মাধ্যমে, আশ্বিনে 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'রাজটীকা'য়। নবেন্দুশেখরের রায়বাহাদুর হবার স্বপ্নবিলাস এবং পরিণামে সকরুণ স্বরভঙ্গ 'দুখুজ্জে যমান যাঁড়ুজ্জে'র সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা।

এই বৎসরেই শ্রাবণে 'প্রাদেশিক সম্মিলনে' রবীন্দ্রনাথের যোগদান এবং মাদুদর্বস্ব রাজনীতিক সভা সমিতি সম্পর্কে তাঁর বিরূপতার অভিব্যক্তি। কিন্তু 'ভারতী'র সম্পাদনাও এক বৎসরের বেশি রবীন্দ্রনাথের ধৈর্যে কুলিয়ে উঠল না। ১৩০৫ সালের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর 'বর্ষশেষ' কবিতা যেন একাধারে সেই রাজনীতির চেতনার আবেগ আলোড়ন এবং পরিশেষে ক্লান্ত আত্মস্থতার আভি :

"নবাবুর ইক্ষুবনে এখনো করিছে বৃষ্টিধারা
বিশ্রামবিহীন।
মেঘের অন্তরপথে অন্ধকার মত্ত অন্ধকারে
চলে গেল দিন।
শান্ত ঘরে, ঝিল্লিরবে, ধরণীর স্নিগ্ধ সন্তোষণে,
মুক্ত বাতায়নে
বৎসরের শেষ গান সাঙ্গ করি দিনু অঞ্জলিয়া
নিশীথ গগনে—"

মতুন মহল থেকে সরলা দেবীকে 'ভারতী' তুলে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিদায়

গ্রহণ করলেন। এই পর্যায় প্রধানত তাঁর ছোটগল্প এবং আত্মসমালোচনার অধ্যায়।

৩

"বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো সমাগত রাজমহত্তে আসিঃ এবং মুষলধারে ভারতবর্ষে বঙ্গ সাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দ-বেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে আশ্রিত প্রত্যাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল—"

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যি-সভায় 'বঙ্গদর্শন' প্রসঙ্গে এই হল রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

১২৭৯ সালে 'বঙ্গদর্শন' যখন প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সময় সমস্ত বাঙালী জাতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও যেন নিজের 'অন্তরপত্রের প্রথম উন্মীলনের সম্ভ্রম অনুভব করেছিলেন। কিন্তু এই অসাধারণ পত্রিকাও টেঁকাতে পারেনি। কর্ম-ব্যস্ত বঙ্কিম 'বঙ্গদর্শন' থেকে বিদায় নিলে সম্পাদক হলেন তাঁর অনুজ সঞ্জীবচন্দ্র এবং অত্যন্ত এলোমেলো ও অনিয়মিতভাবে পত্রিকাটি চলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার পত্রিকাটির ভার নেন—কিন্তু বঙ্কিমের বর্ম-বহুঃশর ধারণ করা শ্রীশচন্দ্রের পক্ষে অসম্ভব হল, তিনিও এক বৎসরের বেশি কাগজ রাখতে পারলেন না।

অবশেষে এগার বৎসর পরে 'বঙ্গদর্শন' এর 'নব পর্যায়' দেখা দিল এবং শ্রীশচন্দ্র বঙ্কিমের যোগ্য উত্তরাধিকারীর হাতেই তাঁর সাহিত্যগুরুর পত্রিকাটি সমর্পণ করলেন।

১৩০৮ থেকে ১৩১২ রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন' এর সম্পাদকতা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এইটিই দীর্ঘতম সম্পাদনার কাল এবং তাঁর সাহিত্য ও জীবনক্ষেত্রে এই পাঁচ বৎসরের গুরুত্ব অসামান্য।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন মহিমায় বাঙালীর দৃষ্টির সম্মুখে সমুজ্জ্বল। একদিকে তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ঔপন্যাসিক, অন্যদিকে অনন্য চিন্তাবিনেতা। দেশপ্রেমে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ঐতিহ্যধারার বিচার বিশ্লেষণে, ভারতবর্ষের সম্মুখে অগ্রগতি এবং প্রজ্ঞার আদর্শ সংস্থাপনে—মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি মুক্তি।

'বঙ্গদর্শন' এর দায়িত্ব গ্রহণ করবার সময় সেই 'সহস্রাক্ষ সহস্রনাম' ব্যক্তিত্বকে রবীন্দ্রনাথ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করেছিলেন। ঔপন্যাসিক এবং চিন্তানায়ক বঙ্কিমের দ্বৈতকর্ম তিনিও 'বঙ্গদর্শন' এ লাভ করতে চাইলেন, "বর্তমান বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্তভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত" করবার ব্রতই বরণ করলেন রবীন্দ্রনাথ।

ইতঃপূর্বে রবীন্দ্রনাথের দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল, একটি 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' (১২৮৯), অপরটি 'রাজর্ষি' (১২৯২)। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের এই দুটি উপন্যাসে তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভাকে খুব উজ্জ্বল বলা যায় না—যদিও প্রথম বইখানি বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাধের অনুমোদন' লাভ করেছিল। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন'এর সম্পাদকরূপে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম উপন্যাসকার বঙ্কিমকেই স্মরণ করলেন। ১৩০৮ সালের বৈশাখ থেকে শুরু হল তাঁর প্রথম সার্থক উপন্যাস 'চোখের বালি'।

একান্ত মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের দ্বারপ্রান্তে এসে বঙ্কিমচন্দ্রকে যেখানে থেমে যেতে হয়েছিল, সেখান থেকেই রবীন্দ্রনাথকে যাত্রা আরম্ভ করতে হল। সাহিত্যের বিচারে 'চোখের বালি' থেকেই বাংলা উপন্যাস বঙ্কিমোত্তর আধুনিক ধারার সূত্রপাত। বঙ্কিমচন্দ্রে 'রোহিণী' এবং রবীন্দ্রনাথের 'বিনোদিনী'র বিশ্লেষণেই এই পার্থক্য সব চাইতে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যাবে। 'রচনাবলী'তে নতুনভাবে 'চোখের বালি'র ভূমিকা লিখতে গিয়ে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ নির্দেশ করে বলেছেন :

> "আমরা একদা বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ উপাখ্যানের রস সম্ভোগ করেছি। তখনকার দিনে সে রস ছিল নতুন। পরে সেই বঙ্গদর্শনকে সব পর্যায়ে টেনে আনা যেতে পারে, কিন্তু সেই প্রথম পালার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না। সেদিনের আসর ভেঙে গেছে, নতুন সম্পাদককে রাস্তায় মোড় ফেরাতেই হবে।.....ঠিক করতে হল, এবারকার গল্প বসাতে হবে এ যুগের কারখানা ঘরে। শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনও হত, এখনও হয়; তবে কিনা তার ক্ষেত আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার জন্যে।.....তাই গল্পের আসর যখন এড়াতে পারলুম না তখন বসতে হল মানব-সংসারের সেই কারখানা ঘরে যেখানে স্বভাবের অনুমি, ছাতুড়ির পিটুনি খেয়ে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। যখন

বিধাতার এই নির্মম সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গদ্য অবলম্বন করে বাংলা আমার আর প্রকাশ পায়নি।"

মুদ্রণের কারখানা ঘরে মানব বিধাতার হাতুড়ি হাতে নিয়ে আসর জমানার আজনে যে নতুন সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ প্রবৃত্ত হলেন, তাই তাঁর ঔপন্যাসিক জীবনের যথার্থ সূচনা। তিনি আরো বলেছেন, "এই ছাপাতে ক্রমে ক্রমে লেখা দিয়েছে গোরা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ।"

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথকে উদ্বোধিত করে তোলাই তাঁর নব পর্যায় 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনার সবচাইতে বড় তাৎপর্য। দেড় বৎসর পরে 'চোখের বালি' শেষ হলে 'নৌকাডুবি'র ধারাবাহিক প্রকাশ আরম্ভ হয়।

কিন্তু মাত্র ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের মর্যাদা রক্ষা করেই 'বঙ্গদর্শন'-এ রবীন্দ্রনাথের দায়িত্ব শেষ হতে পারে না। যে বঙ্কিম 'কৃষ্ণ চরিত্র'-এ আদর্শ মানবের লক্ষণ নির্ণয় করতে গেছেন, 'ধর্মতত্ত্ব'এর পাতায় পাশ্চাত্য ভাবাদর্শকে ধিক্কার জানিয়ে—তাদের বাহ্যসাম্রাজ্যিকা বুদ্ধিকে পরিহার করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তার সমন্বয়ে মনুষ্যত্বের অনুশীলনের নির্দেশ দিয়েছেন—রবীন্দ্রনাথ সেই মহামনীষী বঙ্কিমকেও বিস্মৃত হতে পারেন নি। 'ধর্মতত্ত্বের চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'স্বদেশ প্রীতি' সম্পর্কে বলছেন: "আমি তোমাকে যে দেশ প্রীতি বুঝাইলাম তাহা ইউরোপীয় Patriotism নহে। ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় Patriotism শব্দের তাৎপর্য এই যে, পর সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিব—তাহা করিতে হইবে। এই হেতু Patriotism প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতি সকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতীয়দের কপালে এরূপ ঘোর বাৎসল্য কর্ম না লিখেন।"

বঙ্কিমের নিন্দিত এই 'পেট্রিয়টিজম'ই রবীন্দ্রনাথের কাছে 'ভাশানালিজমে' রূপান্তরিত হয়েছে। বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'দেশের শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি ইউরোপীয় শিক্ষাগুণে ভাশনাল মহত্ত্বকে আমরা অত্যধিক আদর করিতে শিখিয়াছি।" কিন্তু ইউরোপীয় ভাশানালিজমের অন্ধ মিথ্যার মূর্তি কোন্ রূপ আজ পরিগ্রহ করেছে? দৃষ্টান্ত দিয়ে বঙ্কিমের প্রতিধ্বনি করে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র লিখছেন:

"সম্প্রতি ইউরোপে এই অন্ধ বিদ্বেষ সভ্যতার শান্তিকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। রাবণ স্বার্থান্ধ হইয়া অধর্মে প্রবৃত্ত হইল, তখন লক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। আধুনিক ইউরোপের দেব মন্দির হইতে লক্ষ্মী যেন বাহির হইয়া আসিয়াছেন। সেই জন্যই য়োরোপ পল্লীতে আগুন লাগিয়াছে, ভীমে পাশবতা লজ্জাবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ধর্মপ্রচারকগণের শিরোমণি উক্তিতে ধর্ম উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছে।"

ভারতীয় বিশ্বপ্রেমের আদর্শকে বঙ্কিমচন্দ্র "প্রীতি" রূপে চিহ্নিত করেছেন। "ধর্মতত্ত্বে" তিনি বলেছেন, "সকল মনুষ্যকে ভাল না বাসিলে, উঁহাকে ভালবাসা হইল না, আপনাকে ভালবাসা হইল না, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ প্রীতির অন্তর্গত না হইলে, প্রীতির অস্তিত্ব রহিল না।" (এক বিংশতি অধ্যায়)

ভারতীয় প্রেম ধর্মের মন্ত্রদাতাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুকরণীয় ভাষায় শুনিয়েছেন 'বঙ্গদর্শন' এর দ্বিতীয় বৎসরের বৈশাখ সংখ্যায় "নব বর্ষ" প্রবন্ধে। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে ধ্বনিত হল তার 'নববর্ষের গান'।

"রাজা নহ তুমি হে মহাতাপস
তুমিই প্রাণের প্রিয়,
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব
তোমারি উত্তরীয়।
বৈরাগ্যের মাঝে আছে তব সুখ,
মৌনের মাঝে রয়েছ গোপন,
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন
তাই আমাদের প্রিয়,
পরের বস্ত্র ফেলিয়া পরিব
তোমারি উত্তরীয়।"

পরাধীন জাতিকে 'বন্দে মাতরম'এর বীজমন্ত্র বঙ্কিমচন্দ্র এনে দিয়েছিলেন, 'বঙ্গদর্শন'এর সম্পাদনা যুগেই সেই মন্ত্র দেশকে উত্তাল উত্তরোল করে তুলল। দ্বিতীয় রাজনীতিক উত্তেজনা এবং উন্মাদনার অগ্নিযুগ ছুটবে, ১৩১১ অর্থাৎ ১৯০৫ সালে এল কার্জনী দুঃশাসনের চরম রূপ 'বঙ্গভঙ্গ'। 'বন্দেমাতরম'এর স্রষ্টার অনুপ্রেরণায় 'বঙ্গদর্শন'এর পৃষ্ঠায় রাখীবন্ধনের সংকল্প ঘোষণা

করলেন রবীন্দ্রনাথ, রচনা করলেন তাঁর রাখী সঙ্গীত "বাংলার মাটি বাংলার জল।" বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়ীর বিজয়া সম্মেলনে যোগিত হল তাঁর উদার আহ্বান :

"হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া সম্মেলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলা দেশের সর্বত্র প্রেরণ কর। উত্তরে হিমালয়ের পাদমূল হইতে ভয়দক্ষুখর সমুদ্রকূল পর্যন্ত নদীমালাঙ্কিত পূর্ব সীমান্ত হইতে শৈল-মালা বেষ্টিত পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত কর। যে চাষী চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর—যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠ-গৃহের দিকে মুখ ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, শঙ্খ ধ্বনিত দেবালয়ে যে পূজারী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, অস্ত সূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর। আজ শরতের শস্তের শাখা প্রশাখা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রের কূল উপকূল দিয়া একবার বাংলা দেশের পূর্বে পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও— আর বাংলা দেশের সমস্ত ছায়াস্তরনিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শান্ত আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্না ধারা অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে, সেই নিস্তব্ধ শুভ্রকান্তির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের বন্দেমাতরম গীতধ্বনি এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক —একবার করজোড় করিয়া দণ্ডায়মান বিশ্বকুটুম্বের কাছে প্রার্থনা কর :—

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।"

উপন্যাস সাহিত্যের নব দিগন্ত সংকেত, আসন্ন আত্মার সাধন মহিমার ধ্যানগন আর জাতির এক পরম সংকট লগ্নে দেশ-প্রেমের উদ্দীপ্ত উদ্বোধন— বঙ্গদর্শনের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র এর বেশি কি আর প্রত্যাশা করেছিলেন।

৫

'বঙ্গদর্শন'এর সম্পাদকতার শেষ বৎসরে রবীন্দ্রনাথ আর একটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৩১২ সালে কেদারনাথ দাশগুপ্ত 'ভাণ্ডার' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল দেশের শ্রেষ্ঠ

মনীষীবৃন্দের চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যোপযোগী সংকলন। রবীন্দ্রনাথ 'ভাণ্ডার'এর সম্পাদনা গ্রহণ করেন এবং 'বঙ্গদর্শন'এর মতোই এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় তৎকালীন জাতীয় মানসের প্রতিচ্ছবিটি উদ্ভাসিত করবার প্রয়াস পান। 'ভাণ্ডার'ও দীর্ঘায়ু হ'ল না। মাত্র দুবছর প্রকাশিত হয়।

'ভাণ্ডার' পত্রিকায় তাঁর স্বরচিত অবদান বঙ্গভঙ্গযুগের স্বদেশী সঙ্গীতগুচ্ছ। গানগুলি আজও আমাদের জাতীয় মন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই সব জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আমাদের সম্মুখে ফুটিয়ে তুললেন দেশজননীর সেই মহিমময় মূর্তি "আমার হাতে তোর রক্ষা জলে, মা হাত করে শঙ্কাহরণ। তোর দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাট-নেত্র আগুন বরণ।" দেশ মাতৃকার কাছে শপথ নিলেন: "যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা মাগো, আমি তোমায় চরণ করব শরণ, আর কারো ধার ধারব না মা।" প্রচণ্ড রণনীতির আস্ফালনে রাজশক্তি তখন দেশের গর্জিত রুদ্ধ কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে চাইছিল, তাকে ধিক্কার দিয়ে বললেন,

"শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও,
হওনা যতই বড়ো আছেন ভগবান।
আমাদের শক্তি মেয়ে তোরাও বাঁচবি মেয়ে,
বোঝা তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান।"

পরবর্তীকালে ইংরেজি 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি' বাদ দিলে 'ভাণ্ডার'ই রবীন্দ্রনাথের শেষ সম্পাদনা। তারপর সাহিত্য সাধনা এবং কর্মযজ্ঞ—নোবেল পুরস্কারে, আন্তর্জাতিক জীবনে প্রবেশ, তখন 'সপথ করিলে তোমায় ধরিবে কেবা।' পত্র-পত্রিকার সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে থাকার সময় কোথায়।

আজ বিশাল রবীন্দ্রনাথের জীবন, কর্ম ও শিল্পসাধনার বিপুলতার আলোচনায় তাঁর সম্পাদকীয় সত্তা নিতান্তই পাদটীকা-পরিচিতি মাত্র। কিন্তু যে কথা আমার মনে হয়, সম্পাদক না হলে রবীন্দ্রনাথ কি কখনো নিত্য-সাহিত্য লিখতেন, কখনো ভাবতেন ছোটগল্পের কথা বঙ্গদর্শনের সঙ্গে যুক্ত না হলে কি আসতে পারত 'চোখের বালি', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে'?

পত্রিকার কল্যাণে এতগুলি অ্যালাম গো, মোপাসা আর চেকভ গল্প লেখক হয়েছিলেন। পত্রিকার সম্পাদক হয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজের বিচিত্রমুখী প্রতিভাকে আয়ত্ত করবার সুযোগ পেয়েছেন—এ সত্যও ঐতিহাসিক।

প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্র

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে যুগসৃষ্টিকারী ঘটনা দুটি—সবুজপত্র-এর আত্মপ্রকাশ এবং কল্লোল-এর বন্যাস্রোত।

বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজ এখন পর্যন্ত 'তিমাত্র যেন চিত্র পটে আঁকা', সেই সময় নব প্রাণ প্রাচুর্য আনবার জন্য প্রথম চৌধুরী সবুজপত্র-এর রথের রথী হয়ে এসেছিলেন। তাঁর ভাগ্য ভালো, তিনি সারথী পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। কিন্তু বসন্ত বাতাসে জীর্ণ পাতা ঝরে গিয়ে বনস্থলীর নব-জীবনে যখন নব পত্র সমারোহ জাগে সেই জাগরণ কখনো সরবে ঘোষিত হয় না। তাই সবুজপত্র পত্রিকার স্পষ্ট উচ্চারিত সংকল্পকঠোর জীবন সমালোচনা সেদিন তেমন কলরোল তুলতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী একজন ঋত্বিক্ নারায়ণ রূপে, আর একজন সব্যসাচী রূপে লেখনী চালনা করেও সেদিনের বাঙালী মতিকে প্রাণবান বাহা ধ্বনিত করতে পারেননি। বরং প্রাচীন জীবনের ধ্বজাধারীরাই তখন পথ আগলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবং সবুজপত্র-এর মর্মর ধ্বনি সাধারণের অন্তর যাতে স্পর্শ করতে না পারে, সে চেষ্টায় সার্থকও হয়েছিলেন।

পঞ্চম শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য জীবনের দামা দিকে, বিশেষ করে চিন্তার ক্ষেত্রে যে আলোড়ন জেগেছিল পাশ্চাত্ত্য মনের যে সর্বাঙ্গীন অসন্তোষ, সব কিছু সম্পর্কে যে প্রবল জিজ্ঞাসা, ইউরোপে তার পরই সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম মহা-যুদ্ধ। আর ইউরোপীয় চিন্তার ফসলগুলি বাঙালী সমাজে ছড়াবার চেষ্টায় এগিয়ে এসেছিল সবুজপত্র। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের নৈরাশ্য প্রমথ চৌধুরীর মনের রংও পাল্টিয়ে দিয়েছিল। যুদ্ধোত্তর ইউরোপের সর্বাঙ্গীন হতাশা প্রকট হয়ে পড়ার আগেই লোপ পেয়েছিল সবুজপত্র।

সেই হতাশা ও অসন্তোষ, সেই ভ্রষ্ট আদর্শের ক্লেদময় জীবন যখন যুদ্ধ প্রতিবাদে ও দাহিতে সমগ্র ইউরোপ আলোড়িত করে তুলেছে, সেই আলোড়ন প্রবল স্রোতে এসে চুকলো বাংলা সাহিত্যে কল্লোল-এর মাধ্যমে। সবুজ-

পত্রের মত কোন মহীরুহ ছিল না সেখানে ; বিন্দু বিন্দু জলের সমষ্টিগত প্রাণ-শক্তিকে রূপায়িত করে কল্লোলে এসে মিলিত হলেন বাম-এ-আমা মুখতম প্রভাব বর্জিত অজস্র নতুন ও তরুণ লেখক। কল্লোলের স্রোতে অনেক কাদা অনেক খড়কুটো অনেক নোংরা, ইউরোপীয় জীবনের অনেক পচা পাতা ও ঝরা পাতা এসে চুকলো আমাদের মগজে, প্রকাশ পেল আমাদের সাহিত্যদৃষ্টিতে। কল্লোলের ধারা অক্ষত থাকে প্রবাহিত হবে সেদিনের তরুণ বুদ্ধিজীবি সমাজকে অবগাহন করিয়ে দিল, নাকানি চুবানী খেয়েছিল অনেকে। সবুজপত্রের নীরব প্রভাব নয়, কল্লোলের সরব সংঘাত কাউকে উদাসীন থাকতে দেয়নি। ভাল ও মন্দের তুমুল সংঘর্ষে যে প্রবল ঝড় উঠলো, ঝড়ের শেষে দেখা গেল আকাশ মেঘমুক্ত, পচা পাতা ও কাদামাটি বিদায় নিয়েছে। সাহিত্যে প্রাচুর্যের জন্ম জমি হয়েছে উর্বর। সাহিত্য রাজ্যে রাজা, সামন্ত প্রকৃতির পরিবর্তে বহু শক্তিশালী বহু সংখ্যক লেখকের মূল হল শুরু। বৃহৎ না হলে কোন মহৎ মিলিস হয় না—এই ধারণা শান্তাবার যে প্রয়োজন প্রমথ চৌধুরী অনুভব করেছিলেন, সে পরিবর্তন প্রকট হয়ে উঠলো। প্রমথ চৌধুরী ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন, 'আমাদের মনোজগতে যে নব সূর্য উদয়োন্মুখ, তার সহস্র রশ্মি অবলম্বন করে অন্তত ষাট সহস্র বালখিল্য লেখক এই ভূতারতে অবতীর্ণ হবেন—তা সার্থক হল কল্লোলোত্তর যুগে।'

সবুজপত্রের রাজা রবীন্দ্রনাথ, সামন্ত প্রমথ চৌধুরী, তাঁদের সঙ্গে যে সব সভাসদ তখন সভার শ্রীবৃদ্ধি করতেন, পরবর্তীকালে স্রষ্টা সাহিত্যিক হিসেবে তাঁদের অধিকাংশকেই আর খুঁজে পাওয়া যায় নি এবং সবুজপত্রে সাহিত্যরাজ্ঞী হবার অনুমোদ ঘোষণা করে থাকলেও, পত্রের কীর্তিস্তম্ভ গড়বার চেষ্টার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করলেও, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সবুজপত্র হয়ে রইলো ঐতিহাসিক মহিমায় ভাস্বর সমগোত্রীয়।

কিন্তু সেই ঐতিহাসিক মিমর্মরগুলি আমাদের মোহভঙ্গের প্রথম যাদুমন্ত্র। সেই মোহভঙ্গ প্রচেষ্টা সেদিন প্রত্যুত ব্যাপকতা লাভ করেনি ; সবুজপত্র জনপ্রিয় পত্রিকা হয়ে ওঠেনি কোন দিন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বাজায় যখন পাশ্চাত্য জীবনদর্শন ও পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শ আমাদের উপর হুড়মুড় করে এসে পড়ল তখনই আমরা উপলব্ধি করলাম যে তার সারটুকু অনেক আগেই আমাদের জন্য সাজিয়ে গুছিয়ে ব্যবহারের যোগ্য করে রেখে গেছে

সবুজপত্র। তাই যা বর্তমানে প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্র সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ ও অবহিতি এত প্রবল ও ব্যাপক।

রবীন্দ্রযুগীয় ও তৎপরবর্তী সাহিত্যপ্রচেষ্টার মধ্যে সবুজের অবকাশ এতটুকুও ছিল না। জীবনে যে হাসিঠাট্টার অবকাশ আছে, তা বুঝবার মত পরিবেশ সে যুগের লেখকেরা পায় নি, কারণ সবুজ রসের পীঠভূমি ক্রান্ত তখন অরিন্দু, জীবনের যে উজ্জ্বল ও প্রসন্ন রূপ থেকে প্রথমশ্রেণীর হাস্যরস উদ্ভূত হতে পারে, ইউরোপে তা কামান হাউটম্যানের যুগে উঠে গেছে। আর আমাদের দেশ তো তখন পর্যন্ত মোহমুদ্গরের আঘাতে ভগ্নোন্মুখ।

কিন্তু প্রথম যুদ্ধের অব্যবহিতপূর্ব যুগে ইউরোপ জুড়ে জীবনের সেই প্রসন্ন উজ্জ্বল রূপ আমাদের দেশে কিছু কিছু মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, চিন্তা-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল আমাদের অচলায়তন পরিচালনার পটভূমিকায় ইউরোপীয় জীবনের চলমান আদর্শ।

ইউরোপীয় জীবনদর্শন আমাদের সাহিত্যে ঘারো অনেক আগে অনুপ্রবেশ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের রক্ষণশীল পাশ্চাত্ত্য জীবনের প্রসন্ন উজ্জ্বল রূপে মনমজল, কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের অনেক কিছু গ্রহণ করেও তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা আমাদের প্রাচীন জীবনদর্শন ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে অনুরাগের বর্জন করতে পারেন নি, আমাদের চলার শক্তিকে অসাড় করে রাখা খাঁচার লৌহ শলাকাগুলি সম্পর্কে আমরা তখনো মোহমুক্ত হতে পারি নি। সেই মোহভঙ্গের বাণী ঘোষিত হল সবুজপত্রে। সবুজপত্রেরই একটি সংখ্যায় নবযুগের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী" নাটক ঘোষণা করল—"আমাদের পাকবেনা চুল গো।"

প্রমথ চৌধুরী যখন সবুজপত্র প্রকাশ করেন, তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের অন্ধানুরাগ অন্যাগ্রস্ত মনকে জাগিয়ে দেওয়া। ইউরোপীয় সাহিত্য-চর্চার অন্তরাত্মার মূল আস্বাদের উপাদান তিনি সন্ধান করেছেন, কিন্তু বিরোধিতা করেছেন ইউরোপের বহিরাশ্রিত অনুকরণের। ইউরোপীয় চিন্তার উপাদানকে বাংলা সাহিত্যের প্রাণধর্মের সঙ্গে মিশিয়ে নেবার গুরুত্ব ঘোষণা করে বলেছেন, আমাদের বাংলা ঘরের খিড়কী দরজার ভিতর প্রাচীন ভারতবর্ষের হাতি গলাবার চেষ্টা করতে হবে, আমাদের গৌড় ভাষার মৃৎকুম্ভের মধ্যে সাত সমুদ্রকে পাত্রস্থ করবার চেষ্টা করতে হবে, এ সাধনা অবশ্য কঠিন, কিন্তু জাতির মুক্তির জন্য অপর কোন সহজ সাধন পদ্ধতি আমাদের জানা নেই।

এই সাধনার ফল সবুজপত্র ও রথী প্রমথ চৌধুরী দু-ই এক, অভিন্ন। গ্রন্থের জলে বদ্ধ জাদালো অন্ধ রক্ষণাবেক্ষণের বাস্তবিপদ্ম অস্বীকার করে যুক্তির আলোকে সব কিছু দেখবার প্রয়াসে এবং তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে ভাবালুতার কুজ্‌ঝটিকা বিদূরিত করবার সংকল্পে সবুজপত্র একক প্রচেষ্টা করেছে। বঙ্গকালের সেই প্রচেষ্টা শাশ্বত প্রেরণা রেখে গেছে উত্তরকালের জন্য।

বাংলা ভাষাকে লেখ্যভাষার বন্ধন থেকে মুক্ত করার যে ব্রত গ্রহণ করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী, তারও সার্থক বাহন ছিল সবুজপত্র। সবুজপত্রের প্রথম দিকের রচনায় রবীন্দ্রনাথ ক্রিয়াপদকে কথ্যরূপে প্রকাশ করেননি। কিন্তু "চতুরঙ্গ"এর মধ্যেই অতিপথ্যহীন যুক্তিবাজিত গদ্যরীতির যে অভূতপূর্ব রূপ প্রকাশ পেল, সবুজপত্রের স্বকীয়তা তার সর্বত্র। এর পর 'ঘরে বাইরে'র মধ্যে দেখা গেল ক্রিয়াপদের পরিবর্তন, বিষয়বস্তুর নতুন প্রকাশ পেল প্রাচীন সংস্কার ভেঙে টুকরো টুকরো করে নেওয়ার প্রয়াস।

রবীন্দ্রনাথ সায়ুধি হলেও প্রমথনাথ ছিলেন একক রথী। বিজ্ঞাপন বিহীন কোমলশ্রী কাঁচাবরিহীন, চিত্রবর্জিত, অনিয়মিত প্রকাশ ওই পত্রিকাখানির প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রতি সংখ্যায় প্রমথ চৌধুরীর একাধিক রচনা। প্রমথ চৌধুরীর লেখক জীবনের অধিকাংশে সবটাই সবুজপত্রের পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করেছে। কাজেই আমাদের জীবনে ও সংস্কৃতিতে সবুজপত্রের প্রকৃত স্থান নির্ণয় করতে গেলে প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তি আলোচনাই মুখ্যত এসে পড়ে।

২

সবুজপত্রের মাধ্যমে প্রমথ চৌধুরী যে জীবনদর্শন প্রচার করেছেন তার মূল কথাটি তাঁর মুখে বহুবার শুনেছি, তা হল : Cultivate your garden : আর এই গার্ডেন বলতে তিনি শাক-সবজি, আনাজ-তরকারি, ফলমূল, পাম-ফ্রোটন-ইউকোলিপটাস-এর বাগান বুঝতেন না। বাগান মানেই তাঁর কাছে ফুলের বাগান। ফলের উপযোগিতা যথেষ্ট বেশী এবং উপযোগিতাকে অস্বীকারও তিনি কোনমতেই করতেন না। কিন্তু ফুল সৌন্দর্য ও আনন্দের প্রকাশ। অথচ সেই ফুলেরই পরিণতি ফলে। তাই ফুল তাঁর কাছে ছিল সাহিত্যসাধনা ও জীবনসাধনার প্রতীক। আমার মনে হয়, 'ফুলের

চাষ কর'—এই একটি উক্তির মধ্যেই প্রমথ চৌধুরীর জীবনাদর্শ ও সাহিত্যাদর্শ নিহিত আছে।

জন্ম, শিক্ষা ও বৈবাহিক সূত্রে তিনি পরিপূর্ণ বনেদি ও বিদগ্ধ সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ জীবনকে নানা কূলে সমৃদ্ধ ও বর্ণাঢ্য করে দেখবার যেমন তিনি সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁর মানসিক প্রবণতাও তেমনি সেদিকে নাবিত হয়েছিল। তাঁর প্রথম জীবন কেটেছিল কৃষ্ণনগরে, প্রাক্-কলকাতা যুগের সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসেবে যার ঐতিহ্য তখনো মরে যায়নি। সে যুগেই কৃষ্ণনগর আধা শহর আধা-পাড়াগাঁ, কিন্তু বাংলার নাগরী সভ্যতা যে সেখানেই জন্মগ্রহণ করেছিল সে সম্বন্ধে সে নগরের অছাড় বাসিন্দাদের মত প্রমথ চৌধুরীও সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন।

প্রমথ চৌধুরী যখন বড় হয়ে উঠলেন, অর্থাৎ বয়সে বড়, শিক্ষায় দীক্ষায় রুচিতে সম্পূর্ণ বড়, তখন কলকাতার রাজধানী পুরোপুরি নাগরিকতাবোধ নিয়ে সাহিত্য জীবন সক্রিয় হয়ে উঠেছে, সেখানে আমরা প্রমথ চৌধুরীকে দেখতে পাই, মেহনতী সমাজ থেকে অনেক দূরে। কিন্তু সেখানেও তিনি পুরোপুরি নাগরিক, তাঁর চোখে বা মনে পল্লী বাংলার সবুজের ছোঁয়া নয়, রাজপথের আলোয় নিয়নেই ঝলমল করছে।

কলকাতা তখন নতুন চিন্তা ভাব ও কর্মধারার উৎস; নাগরিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরিমিত হলেও তাই তখন দেশের জীবনকে টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রধান শক্তি। প্রমথ চৌধুরী এই নাগরিকতাকেই জীবনের নিঃস্বার্থ বলে মেনে নিলেন। যে বহু-নিন্দিত নাগরিকতা সমাজ-বিসর্জনের অনিবার্য গতিতে গ্রামীন সফলতাপুষ্ট বাংলার উপর এসে চেপে বসেছে, প্রমথ চৌধুরী হলেন সেই নাগরিকতার ভাষ্যকার।

ভাষ্যকার, কিন্তু চিত্রকার নন। তাই নাগরিক মানুষের বহু বিচিত্র আলেখ্য সজীব হয়ে তাঁর লেখনীতে ফুটে ওঠে নি, ফুটে ওঠেনি সবুজপত্রে। ধনীর বিলাসকক্ষের বহু নীচে কারখানার মধ্যে কুলি মজুরের ভেতর যে দুর্নীতি ও ব্যভিচার, নীচতা ও হীনতা জমে থাকে, প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যে তা চিত্রিত হয় নি। তিনি নিজেই বলেছেন, লেখাপড়া তাঁর পেশা, নেশা কাজ আর খেলা। নিজেকে বরাবর বলেছেন উদাসীন গ্রন্থকীট। তাই লেখাপড়ার পরিবেশেই তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছে গৃহকোণে, পথে পথে

তিনি ঘুরে বেড়ান নি। মাঝা শ্রেণীর মানুষকে আসরায় যে সুযোগ তিনি বাল্যে লাভ করেছিলেন, যৌবনে তা থেকে ঘুরে সরে গিয়েছেন। সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের সঙ্গেই মেলামেশা করেছেন।

শাখাপ্রকারা বিরাট রাজধানীর মধ্যে হৃদয়ের স্পন্দন শোনা যায় না, হৃদয়-বৃত্তিকে আমল দেওয়ার মত অবসর দেখানে কারো নেই, বুদ্ধির নিকষ পাথরে যাচাই করেই ভালোমন্দ ভালোবাসার যোগ্য-অযোগ্য বিচার হয়ে থাকে।

বুদ্ধির নিকষপাথরে সবকিছু যাচাই করার এই যে নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গী, এইটেই প্রমথ চৌধুরীর জীবন ও সাহিত্যকে বিশিষ্ট রূপ দিয়েছে। আর তাই ছিল সবুজপত্রের ধর্ম।

যে জীবন নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন প্রমথ চৌধুরী, তাকে তিনি দেখেছেন বুদ্ধির বিদ্যুতে, মস্তিষ্কের দর্পণেই তা প্রতিফলিত হয়েছে, মনের দীপ্তিপ্রাচুর্যে তা ঝলমল করে উঠেছে। তাই শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী একশ্রেণীর মানুষের জীবনের এক অংশই সাহিত্যের উপজীব্য হয়েছে তাঁর। কিন্তু সে সাহিত্য গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে, শিক্ষিত, সংস্কারমুক্ত, সুরুচিসম্পন্ন ও বুদ্ধিদীপ্ত। মজলিশী প্রমথ চৌধুরী সাধারণ জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সামান্যই অর্জন করেছিলেন। তাই তাঁর বুদ্ধির মুকুরে বৃহত্তর জীবন ধরা দেয় নি, কিন্তু যেটুকু দেখেছিলেন তার অন্তস্তল পর্যন্ত তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অন্যের জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাব পূরিয়ে নিয়েছিলেন তিনি নিজের জীবন সম্বন্ধে গূঢ় অনুভূতি দিয়ে। এ কথা সত্য যে, প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য ও জীবন সম্পর্কে বুদ্ধিভঙ্গী খণ্ডিত, কিন্তু যেটুকু তিনি দেখেছেন তার মধ্যে ফাঁকির কোন অবকাশ ছিল না এবং কোন কিছুর প্রতি সমীহা রক্ষা করে বা কারো মুখ চেয়ে নিজের সত্যানুভূতিকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা তাঁর সাহিত্যে বা জীবনে, কোথাও দেখা যায় নি। এই কারণেই আমি প্রমথ চৌধুরীকে জীবনবাদী সাহিত্যিক বলতে কুণ্ঠিত নই।

প্রমথ চৌধুরীর কাছে সবচেয়ে বড় ছিল তাঁর নিজের জীবনের আদর্শ। তাঁর সবচেয়ে বড় শিল্পসৃষ্টি ছিল তাঁর স্বকীয় মনন ও রুচি। সাহিত্যের মধ্যেও তিনি সেই নিজস্ব জীবনশিল্পকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর ব্যক্তি পুরুষ ও শিল্পী পুরুষ ছিল সমধর্মী। প্রমথ চৌধুরীর জীবনে হৃদয়ের স্পন্দন

বেশি দোলা দেয় নি, মস্তিষ্কের দাবিকে কোন দিন তা ছাপিয়ে ওঠে নি এবং তাঁর সাহিত্যেও স্বভাবতঃ মনঃধর্মের নীচে হৃদয়ধর্ম চাপা পড়েছে। যে বাস্তবিক সত্যতা ও যন্ত্রশিল্পের যুগ মানুষের হৃদয়বৃত্তির এতটুকু দাম দেয় না, সেই যুগের চারণ ছিলেন প্রমথ চৌধুরী, তাই তাঁর কাছে মনের মূল্য নয়, মননের মূল্যই ছিল প্রধান সত্য।

জীবনের সেই বিশিষ্ট সত্যানুভূতির ফলেই প্রমথ চৌধুরীর জীবনধর্ম যুগধর্মের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল। যুগটা বিজ্ঞানের, বিজ্ঞান বুদ্ধি-প্রসূত, তাই যুগধর্মই হৃদয়ধর্মবর্জিত ও বুদ্ধিবৃত্ত। বস্তুত যুগধর্মের সঙ্গে মনকে সমান করতে চালিত করা—এইটেই ছিল প্রমথ চৌধুরীর সচল মনের স্বধর্ম। শাশ্বত সনাতনের প্রতি তাঁর কোন দুর্বলতা ছিল না, কারণ পরিবর্তনকেই তিনি জীবন ও জগতের প্রধান সত্য বলে উপলব্ধি করেছিলেন। আমাদের দৃষ্টি থাকবে ভবিষ্যতে, কর্মক্ষেত্র হবে বর্তমানে, আর অতীতের স্থান হল মিউজিয়মে ও আরচাইভ্‌সে—এক কথায় বলতে গেলে এই ছিল প্রমথ চৌধুরীর চলমান মনের দৃষ্টিভঙ্গী। নতুন ও পুরাতন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'সমাজের উন্নতি দেশ-কাল-পাত্র-সাপেক্ষ, সুতরাং দেশ-কালের অতীত, কিংবা সর্বদেশে সর্বকালে সমান বলবৎ কোন সত্যের দ্বারা সে উন্নতিসাধন করবার চেষ্টা বৃথা।' আরও বলেছেন: 'সকল দেশেরই সকল যুগের একটি বিশিষ্ট ধর্ম আছে। সেই যুগধর্ম অনুসারে চলতে পারলেই মানুষ সার্থকতা লাভ করে।' 'দেশের সঙ্গে দেশের অবশ্য স্পষ্ট প্রভেদ আছে, কিন্তু কালের চাইতে কালের প্রভেদ তার চেয়েও স্পষ্ট।'

যুগধর্মের পূজারী প্রমথ চৌধুরী স্বভাবতই নবীনতারও পূজা করেছেন। বলেছেন, 'সবুজ হচ্ছে বর্ণমালার মধ্যমণি এবং নিজ গুণেই সে বর্ণরাজ্যের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে থাকে। বেগুনী কিশলয়ের রং—জীবনের পূর্বরাগের রং। নীল আকাশের রং—অনন্তের রং। পীত শুষ্কপত্রের রং—মৃত্যুর রং। কিন্তু সবুজ হচ্ছে নবীন পত্রের রং—রসের ও প্রাণের যুগপৎ লক্ষণ ও ব্যাপ্তি। তার দক্ষিণে নীল আর বামে পীত, তার পূর্বসীমায় বেগুনী আর পশ্চিম সীমায় লাল। অন্ত ও অনন্তের মধ্যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে, স্মৃতি ও আশার মধ্যে মধ্যস্থতা করাই হচ্ছে সবুজের অর্থাৎ সরল প্রাণের স্বধর্ম।'

৩

বস্তুত, বাঙালীর অন্তর্জীবনে চিন্তার প্রবহমানতা প্রবর্তন করার চেয়েও তাকে লেখ্যতার মুখাপেক্ষী থেকে মুক্তি দিয়েই প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছেন। এবং আজ যে শান্তিপুর, কৃষ্ণনগরের মুখের ভাষা পূর্ব পাকিস্তানে পর্যন্ত বাংলা গদ্যসাহিত্যের ভাষা রূপে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছে তার পরিচ্ছদ প্রমথ চৌধুরী। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় প্রমথ চৌধুরীর এই অসামান্য দান আজও যথাযথ স্বীকৃতি পায়নি—এটা কম দুঃখের নয়।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, প্রমথ চৌধুরীরও অনেক আগে আলাল ও হুতোম কথ্যভাষাকে সাহিত্যের বাহন করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, পণ্ডিতী ভাষার প্রতিক্রিয়াস্বরূপে টেকচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন যে মৌখিক ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তার মধ্যে প্রাণস্পন্দন থাকলেও রূপের অভাব ছিল। কাজেই সে ভাষা সাহিত্যের স্বাভাবিক ভাষা হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ তার মধ্যে শুদ্ধ সংযত শ্রী, গভীর গম্ভীরধ্বনি, মার্জিত ও শিল্পসৌন্দর্যের অভাবে, সারল্য সরসতা, প্রাণধর্ম ও সজীবতা সত্ত্বেও সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারেনি। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার তুচ্ছ কথাগুলিকে রূপায়িত করার যোগ্যতা সে ভাষার ছিল, কিন্তু উচ্চস্তরের অনুভূতি, গভীর চিন্তা, সিদ্ধান্তত্ত্ব ও জটিল সমস্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে তাকে অনুপযুক্তই মনে হয়েছে। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্র যখন নানা গভীর বিষয়ে তত্ত্ব আলোচনা শুরু করলেন, উচ্চস্তরের অনুভূতি, গভীর চিন্তা, সিদ্ধান্তত্ত্ব ও জটিল সমস্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে তাকে অনুপযুক্তই মনে হয়েছে। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্র যখন নানা গভীর বিষয়ে তত্ত্ব আলোচনা শুরু করলেন, তখন তাকে সর্বজনগ্রাহী করবার জন্য ক্রিয়াপদহীন ও আলাদী ভাষার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করতে হল, বিশেষ করে, ক্রিয়াপদের ব্যবহারে মানুষের মৌখিক প্রকাশ থেকে দূরেই থেকে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বঙ্কিমী ঢং—এই তাঁর গদ্য সাহিত্যকে পরিচালিত করেছিলেন।

কিন্তু ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ভাষাকে যখন ভাবাবেগের তরঙ্গোচ্ছ্বাস থেকে বুদ্ধিগত আলোচনার মতুন খাতে প্রবেশ করতে হল, নতুন চিন্তা নতুন

ভাবধারা প্রকাশের জন্য, নতুন ভাবাদর্শ ও রচনারীতি অনিবার্য হয়ে উঠল, সেই যুগসন্ধিক্ষণের শুভলগ্নে প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাব।

যে অবস্থায় সর্বগ্রাসী রবীন্দ্র-প্রতিভা তাকে গ্রাস করার কথা, তারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রমথ চৌধুরীর ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ ও দীক্ষিত হলেন। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের কলমে বাংলা গদ্যের যে নব নব রূপান্তরে বাংলা ভাষাকে এক যুগে বহু যুগান্তর পার করে পৌঁছে দিয়েছে, তার মূল প্রেরণা প্রমথ চৌধুরীর কাছ থেকেই এসেছিল। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভাষার নতুন পথে পদক্ষেপ করতে প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ও অনুমোদন এবং সমর্থনকেই প্রধান পাথেয় করেছিলেন। কিন্তু সর্বত্র জয়কামী রবীন্দ্র-প্রতিভা নিজের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করেননি। বরং তাতেই বাকি রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর ভাষারীতি অবলম্বন করেছেন— এমন কথা বলছি না, কারণ তাঁর অসাধারণ স্বকীয়তা তাঁকে নিজের পথে চালিত করেছিল এবং অজস্র পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ভাষাকে লচিত ও পুষ্ট করেছিলেন, কিন্তু বদ্ধ দুয়ার খুলে দেবার কৃতিত্ব প্রমথ চৌধুরীর। আগল তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন, তারপর রবীন্দ্রনাথের ভাষা 'বেশ এলাইয়া, ফুল ফুলাইয়া, রাঙাদণ্ড বাঁকা পাখা উড়াইয়া, রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া', শিখর থেকে শিখরে ছুটেছে, দুধর থেকে দুধরে লুটেছে, কিন্তু ভাষিবারের কারাগার যে ভেঙেছিল তার প্রথম আঘাত এসেছিল প্রমথ চৌধুরীর কলম থেকে।

প্রমথ চৌধুরীর লেখার ভাষা ঠিক যে বাঙালীর মুখের ভাষা, এমন কথা বলা যায় না, বিশেষ করে যে-যুগে প্রমথ চৌধুরী ভাষা নিয়ে পরীক্ষা করেছেন, সে যুগে তো বটেই, এ যুগে পর্যন্ত বাংলার মুখের ভাষা অনেকগুলি আঞ্চলিক রূপে বিভক্ত। কাজেই প্রমথ চৌধুরীকে সাহিত্যের প্রয়োজনে একটা সর্বজনীন কথ্য বাংলা তৈরী করে নিতে হয়েছে।

এই ভাষা তৈরী করবার ব্যাপারে প্রধান অন্তরায় ছিল তাঁর বৈশোষের পরিবেশ। প্রমথ চৌধুরী মানুষ হয়েছেন কৃষ্ণনগরে। সে কালের নদে-শান্তিপুরের ভাষা ছিল অন্যান্য অনেক অঞ্চল থেকে উন্নত। বাঙালী সংস্কৃতির এক পীঠস্থান নবদ্বীপ, আর তারই সংলগ্ন কৃষ্ণনগর মার্জিত নাগরিক

সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। কাজেই কৃষ্ণনগরের কথ্যভাষার মধ্যে মানুষ হয়ে তিনি সর্বজনীন কথ্যভাষার রসিয়াদ হিসেবে তাকেই গ্রহণ করেছিলেন।

মৌলিক ভাষায় গদ্যসাহিত্যের উপযুক্ত যুক্তিসঙ্গত কিনা কিনা—এ প্রশ্নও তিনি আলোচনা করেছেন। বলেছেন, "আমরা মৌখিক ভাষা ব্যবহার করতে চাই; সুতরাং যা ভদ্রলোকের মুখে চলে না এমন কোন গদ্য সাহিত্যে স্থান দেবার পক্ষপাতী আমরা কখনই হতে পারি না।" ভাষার শুদ্ধতা কাকে বলে, অলঙ্কার শাস্ত্র থেকে বচনা উদ্ধৃত করেই তিনি বলেছেন, "যেই যেই দেশে যতিত ভাষা সেই সেই দেশের বিশুদ্ধ অপভ্রংশ" এবং সেই যুক্তির জোরেই বিশুদ্ধ অপভ্রংশ নিয়ে গঠিত মৌলিক ভাষাকে বাংলা সাহিত্যে ব্যবহার করতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি।

ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হলে, গতানুগতিক ভাবের বাহন ভাষাকে চলমান বিশ্বজীবনের সঙ্গে তাল রেখে চলবার যোগ্য করতে হলে তাকে যেমনটি আছে তেমনটি রেখে দেওয়া যায় না—এ বোধ না থাকলে ভাষাসম্পদ বাড়ানো কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, "এ কথা আমি অবশ্য মানি যে, আমাদের ভাষায় কতক পরিমাণে নূতন কথা আমার দরকার আছে। যার জীবন আছে, তারই প্রতিদিনের খোরাক জোগাতে হবে, আর আমাদের ভাষার দেহপুষ্টি করতে হলে প্রধানতঃ অমরকোষ থেকেই নূতন কথা টেনে আনতে হবে। কিন্তু যিনি নূতন সংস্কৃত কথা ব্যবহার করবেন তাঁর একটি মনে রাখা উচিত যে, তাঁর আবার নূতন করে প্রতি কথাটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। তা যদি না পারেন তাহলে বঙ্গসরস্বতীর কানে শুধু পদের মোদা পরানো হবে।...ভাষার এখন যা দিয়ে যার মেহ করা আবশ্যক, তার বাড়ানো নয়। যে কথাটি নিতান্ত না হলে নয়, সেটি যেখান থেকে পার নিয়ে এস, যদি নিজের ভাষার মধ্যে তাকে খাপ খাওয়াতে পার।...ভগবান পরশুরাম বিশল্যকরণী আনতে গিয়ে আস্ত গন্ধমাদন যে সমূলে উৎপাটন করে এনেছিলেন, তাতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেননি।"

ভাষাকে মৌখিকতার রূপ দিতে প্রমথ চৌধুরী সবচেয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে যে নীতি পালন করেছেন সে হল, "বাঙালীর মুখে মুখে প্রচলিত শব্দের আকার এবং বিভক্তির যে পরিবর্তন ঘটেছে সেটা মেনে নিয়ে যথাসম্ভব তাদের বর্তমান

আকারে ব্যবহার করা এবং ক্রিয়াপদের প্রয়োগে 'ইট্' প্রত্যয় বর্জন এবং তার ফলে ক্রিয়া দ্রুত করাতে। কেউ কেউ অবশ্য এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, শুধু ক্রিয়ার পরিবর্তনেই ভাষা মৌখিক হয়ে ওঠে না। ওঠে না তা সত্য। বিশিষ্ট উদাহরণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় পরিবর্তিত ক্রিয়া ও সর্বনাম একটি অংশ মাত্র। সবুজপত্রের মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যে ব্যবহারের উপযুক্ত করে দেওয়ার জন্য তাকে যে পরিশোধিত রূপ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, প্রমথ চৌধুরী তার বেশী কিছু সংস্কার করেননি। অন্য সব দেশেই লেখার ভাষা এবং মুখের ভাষার মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। শুধু সাহিত্যিক ভাষা মৌখিক ভাষা থেকে কিছুটা পৃথক। তা অনেকটা সাহিত্যিকের নিজস্ব সৃষ্টি এবং সেই অর্থে কিছুটা কৃত্রিমও। কিন্তু ইচ্ছা বা চেষ্টা করলেই প্রমথ চৌধুরী তাঁর ভাষার বা রচনা-রীতির পরিবর্তন করতে পারতেন। কারণ, এই দুইটিই তাঁর দেহমনের চিরসঙ্গী এবং তাঁর মননশক্তিরই মত তা প্রদীপ্ত। যে যুগে যারা তাঁর ভাষাকে 'কিকিন্ধ্যার ভাষা' 'পেতনী ভাষা' 'চড়ালী ভাষা' 'ইতরজ ভাষা' ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত করেছে তারা নিজেদের কুরুচিরই পরিচয় দিয়েছে।

প্রমথ চৌধুরীর পক্ষে যে তাঁর রচনারীতি অন্য ধরনের করা সম্ভব ছিল না তার কারণ, চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গীর এতখানি স্বকীয়তা বাংলা সাহিত্যে তো দুর্লভ বটেই, বিশ্বসাহিত্যেও তা খুঁজি খুঁজি পাওয়া যায় না। Style is the man—এ কথা প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে যতটা খাটে তা আর কার সম্বন্ধে খাটে কিনা সন্দেহ, এমন কি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অবিরত বিকাশশীল ব্যক্তিসত্তাকে প্রকাশ করবার জন্য তাঁর style-কেও রূপ থেকে রূপান্তরিত করেছেন সারা জীবন ধরে। প্রমথ চৌধুরী তাঁর স্বকীয়তায় অটল, যদিও অচল ছিলেন না। চলব, চলতে হবে—তাঁর এই স্বকীয়তার উপর নির্ভর করেই তাঁর ব্যক্তিত্ব একই রীতিতে পরিস্ফুট হয়েছে।

মননশীল মানুষ, মনের তলোয়ার খেলার জন্য যাঁদের ডেকে এনেছেন, তাঁরাও তাতে আমন্ত্রণ পেয়েছেন এবং সেই এলোপাথাড়ি তলোয়ার খোরাণোর শুধু যে উপস্থিত খেলোয়াড়দের মন ও বুদ্ধির যাঁচন কেটেছে তা-ই নয়, সেই তলোয়ারের আঘাত বাদিসঙ্গ কমলাদলের শান্ত সুহৃদ্যোগ থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে বাংলার সমগ্র শিক্ষিত সমাজে এবং রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতার ফলে

তিনি সমস্ত জাতির মনের বাঁধন কেটে দিতে সমর্থ হয়েছেন। পরবর্তী যুগে আর একটিমাত্র সাহিত্য-গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, যা আজ কল্লোল-গোষ্ঠী নামে পরিচিত। সেখানকার সংস্কারমুক্তি অন্য রূপের হলেও তার মূল প্রেরণা এসেছিল সবুজপত্র ও সবুজপত্র-গোষ্ঠী থেকে এবং আশীর্বাদ এসেছিল প্রমথ চৌধুরীর কাছ থেকে। এক হিসেবে আমি নিজেকে বাংলাদেশের সবচেয়ে ভাগ্যবান পুরুষ বলে মনে করি, কারণ বাঙালী সংস্কৃতির এই দুটি ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকার সুযোগ আমার হয়েছিল।

বৈঠকী কথার তলোয়ার খেলা যখন লিখিত রচনার রূপ নিত, তখন প্রমথ চৌধুরীর ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গী তীক্ষ্ণধার শাণিত তলোয়ারেরই মত ঝক্‌ঝক্ করত প্রমথ চৌধুরীর মননশীলতার রৌদ্রদীপ্তিতে। নতুন কিছু বলেই তিনি ক্ষান্ত হতে পারেননি, বক্তব্যের নতুনত্বকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বলার ঢং-এও এমন এক নতুনত্ব দিয়েছেন যে, সেই ঢং আজো বীরবলী ঢং বলে চিহ্নিত হয়ে আছে।

এই 'বীরবলী' ঢং শুধু লিপিনৈপুণ্যনির্ভর ছিল না, চিন্তাবৈভবের উপর সমান নির্ভরশীল ছিল। এই স্বকীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, তিনি বলেছেন, 'অহং'-বর্জিত সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, আর ইংরেজীতে তাকেই বলে—Style is the man.

একটি উদাহরণেই তাঁর কবিতারীতি বোঝা যাবে: "অরিন্দমে অঙ্কিত বেশী জবাসে তাজুদ—বাদশার জিলে তুমি খেলার পুতুল" কবিতাটি তাজমহল শীর্ষক। রচনারীতির এই স্বকীয়তা তাঁর প্রবন্ধে, গল্পে, কবিতায় সমান পরিস্ফুট। এই রচনারীতিকে যতই বিদগ্ধজনযোগ্য বলে শ্লেষ করা হোক না কেন, প্রমথ চৌধুরী অনন্যভাবে সংগ্রহ করেছেন শুধু বিদগ্ধ জীবন থেকে নয়, বাসো-বাবিদের জীবন থেকে, শহরে নিম্নশ্রেণীর ছেলেদের ঘুড়ি ওড়ানো ও রসজীবনের অন্য ক্ষেত্র থেকে, ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস খেলার মাঠ থেকে, দৌড় খেলার মাঠ থেকে ঘুরেই থেকেছেন তিনি সারাজীবন।

সাহিত্য কি, আর তার উদ্দেশ্যই বা কি, এ নিয়ে প্রমথ চৌধুরী যে মত ব্যক্ত করেছেন, তাঁর সাহিত্যে রসগ্রহণ করতে হলে সেই মত সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার বলে তারই কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

"সাহিত্য কস্মিনকালেও স্কুল মাষ্টারির ভার নেয়নি। এতে দুঃখ

করবার কোন কারণ নেই। দুঃখের বিষয় এই যে, স্কুল মাষ্টাররা এ যুগে সাহিত্যের ভার নিয়েছেন।...সাহিত্য শিক্ষার ভার নেয় না, কেন না, মনোজগতে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে কবির কাজের ঠিক উলটো। কবির কাজ হচ্ছে কাব্য সৃষ্টি করা, আর শিক্ষকের কাজ হচ্ছে প্রথমে তা বধ করা, তারপর তার শবচ্ছেদ করা এবং ওই উপায়ে তার তত্ত্ব আবিষ্কার করা ও প্রচার করা।...কারো মনোরঞ্জন করা সাহিত্যের কাজ নয়, কাউকে শিক্ষা দেওয়া নয়। সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়।"

তবে সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি? এর জবাবে তিনি বলেছেন, "সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারো মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুইয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি বুঝে নিলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্য খেলনা তৈরী করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে ধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলা দেশে আজ সুলভ নয়। কাব্যের ঘুমঘুমি, বিজ্ঞানের ঘুনিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙা লাঠি, ইতিহাসের নেকড়ার পুতুল, নীতির জিনের স্তেপ্ এবং ধর্মের জুজুক—এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্যের রাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তুষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বে লেখকের মনস্তুষ্টি হতে পারে না। কারণ, পাঠক-সমাজ যে খেলনা আজ আবদার করে, কাল সেটিকে ভেঙে ফেলে। সে প্রাচ্যই হোক, আর পাশ্চাত্য হোক, ফরাসীরই হোক, আর জার্মানীরই হোক, দুদিন ধরে তা কারুরই মনোরঞ্জন করতে পারে না।"

এই আনন্দ ও মনোরঞ্জনের পার্থক্যের মধ্যেই প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর মূল নিহিত আছে। 'আনন্দাৎ খল্বিমানি ভূতানি'—এই বিশ্বসৃষ্টির মূল আর তার আধারও আনন্দ এবং সেই কারণেই তা কল্যাণধর্মী।

৩

প্রমথ চৌধুরীর ক্ষেত্রে মনের এবং চরিত্রের যে শক্তি, কর্মশক্তি ও মননশক্তি, জীবনকে জড়তা থেকে মুক্তি দিয়ে গতিশীল করতে পারে সেই শক্তিই ছিল তাঁর উপাস্য এবং সেই শক্তি সঞ্চার করাই তাঁর মতে সাহিত্যের প্রধান। "আমরা নিত্য লেখায় ও বক্তৃতায় দৈন্যকে ঐশ্বর্য বলে, জড়তাকে সাত্ত্বিকতা বলে

আলস্যকে ঔদাস্য বলে, অজ্ঞান বৈরাগ্যকে ভূমানন্দ বলে, নিষ্কর্মাকে নিষ্ক্রিয় বলে প্রমাণ করতে চাই। এর কারণও স্পষ্ট। হৃদয় দুর্বলের বল, যে দুর্বল সে অপরকে প্রতারিত করে আত্মরক্ষার জন্য আর নিজেকে প্রতারিত করে আত্ম-প্রসাদের জন্য। আত্মপ্রবঞ্চনার মত আত্মঘাতী জিনিষ আর নাই। সাহিত্য জাতির খোরপোষের ব্যবস্থা করতে পারে না, কিন্তু আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারে।' 'সাহিত্য হাতে হাতে মানুষের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে দিতে পারে না। কোন কথায় চিঁড়ে ভেজেনা, কিন্তু কোন কোন কথায় মন ভেজে এবং সেই জাতীয় কথারই সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিত্য।' এখানে 'মন ভেজা' কথাটাকে অবশ্য বিশিষ্ট অর্থে ধরতে হবে। কারণ, কি সাহিত্যে কি জীবনে চিরকাল তিনি বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করেছেন, সর্বদা হৃদয়কে বিকল করতে ইতস্তত করেন নি। লিখেছেন, 'কলপ্রসে তারতম্য গ্যাস্ট্রোস্কোপে ধরে উঠেছে।' হৃদয়বৃত্তিকে তিনি অনেক সময় আমলের মধ্যেই আনেন নি। এক জায়গায় বলেছেন, 'হৃদয়ের খোঁয়াই দিলে এদেশে নির্বুদ্ধিতার সাতখুন মাপ। হৃদয়টা আমাদের এতোবড় জিনিস। যার মাথা নেই তার মাথা ব্যথার কথা শুনলে আমরা অবশ্য হাসি কিন্তু যার বুক নেই তার বুকের ব্যাথার কথা শুনলে আমরা কাঁদি। এই আমাদের স্বভাব আর এই জন্যেই তো এদেশে কোন কাজের কথা বলা কঠিন। হৃদয় পদার্থটা অবশ্য খুব ভালো জিনিস এবং উদরের চাইতে ঢের উঁচু দরের জিনিস এবং উদর যে অনেক ক্ষেত্রে নিজেকে মস্তক বলে পরিচয় দিতে চায়, তাও অস্বীকার করবার জো নেই। কিন্তু মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়ের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। মানুষের চোখে দুটো চোখ আছে, বুকে একটাও নেই। হৃদয় অন্ধ, অতএব যে যত অন্ধ, সে তত হৃদয়বান—এই হচ্ছে লোকমত।' প্রমথ চৌধুরীর হৃদয়ধর্ম-বর্জিত বৈজ্ঞানিক-সুলভ নির্লিপ্ততা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : তাঁর যেটা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে সে হচ্ছে তাঁর চিত্তবৃত্তির বাহুল্য বর্জিত আতিজাত্য। সেটা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় তাঁর বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতায়—এই মননধর্ম মনের সঙ্গে সেই সূক্ষ্ম শিখরেই অনাবৃত থাকে, যেটা অবাস্তুতায় বাষ্পস্পর্শহীন।' কাজেই 'মন ভেজে' বলতে প্রমথ চৌধুরী যা বলতে চেয়েছেন, আমার মতে, তা মননকে ধাক্কা মারার কথা।

ইউরোপ সম্পর্কে তিনি বলেছেন : ইউরোপ আমাদের মনকে নিত্য যে নাড়া দিচ্ছে, তাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। ইউরোপের সাহিত্য, ইউরোপের

দর্শন মনের গায়ে হাত বুলায় না, কিন্তু ধাক্কা মারে। ইউরোপের সভ্যতা অমৃতই হোক, মদিরাই হোক, আর হলাহলই হোক, তার ধর্মই হচ্ছে মনকে উত্তেজিত করা, স্থির থাকতে দেওয়া নয়। এই ইংরেজী শিক্ষার প্রসাদে, এই ইংরাজী সভ্যতার সংস্পর্শে আমরা দেশশুদ্ধ লোক যেদিকে হোক, কোন একটা দিকে চলবার জন্য এবং অন্যকে চালাবার জন্য আকুবাকু করছি। কেউ পশ্চিমের দিকে এগোতে চান, কেউ পূর্বদিকে পিছু হটতে চান, কেউ আকাশের উপরে দেবতার আত্মার অনুসন্ধান করছেন, কেউ মাটির নীচে দেবতার মূর্তির অনুসন্ধান করছেন। এককথায় আমরা উন্নতিশীলই হই আর অবনতিশীলই হই, আমরা সকলেই গতিশীল, কেউ স্থিতিশীল নই। ইউরোপের স্পর্শে আমরা আর কিছু না হোক, গতিলাভ করেছি, অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিক সকল প্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তি পাভ করেছি।'

কিন্তু সবুজপত্র প্রকাশের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় বলেছেন : 'ইউরোপের প্রবল ধাক্কুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন দুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্থির করতে না পারলে তাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হবে না। বর্তমানের চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত মনোভাব সকলকে যদি প্রথমে মনোদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিম্বিত করে নিতে পারি, তবে তা পরে সাহিত্য দর্পণে প্রতিফলিত হবে।' অর্থাৎ একটা নতুন কিছু করবার জন্য নয়, বাঙালীর জীবনে যে নতুনের এসে পড়েছে, তাই পরিষ্কার করে প্রকাশ করবার জন্য 'সবুজ-পত্র' এর প্রতিষ্ঠা।

কারো কারো মতে প্রমথ চৌধুরী রাজনীতি-নিরপেক্ষ ছিলেন। নিজেই একজায়গায় বলেছেন, যে, পলিটিকাল পরমহংস হবার শক্তি বা ইচ্ছে তাঁর নেই। কিন্তু পলিটিক্স যেখানে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের প্রধান চালকশক্তি তখন আধুনিক জীবন-সচেতন প্রমথ চৌধুরী তাঁর চিন্তায় পলিটিক্সকে এড়িয়ে চলেন নি। বলেছেন, আমরা কল্পনারাজ্যে সংসার পাততে পারিনে, আর পলিটিক্সের বিষয় হচ্ছে জাতীয় ঘর-করনার বিষয়, সুতরাং পলিটিক্স সম্বন্ধে আমরা মুখে মৌন থাকলেও মনে আলগা থাকতে পারিনে ... ... শুধু একালে নয়, কোন কালেই সাহিত্যিকেরা পলিটিক্স এড়িয়ে যেতে পারেননি।

এই পলিটিক্স প্রসঙ্গেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর স্বকীয়তা সবচাইতে বেশি পরিস্ফুট হয়েছে। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী পলিটিক্স মুক্তোপ্রসূত ও শক্তির বলে তাঁকে

শুধু পীড়িত করেছে তাই নয়, ইউরোপীয় সভ্যতায় এই লোভপরায়ণতাকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী ভাঙাগড়া তাঁকে রীতিমত পীড়িত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ করে তুলেছিল। যুদ্ধপ্রসঙ্গে একদিন আমার সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল তা থেকেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সম্যক উপলব্ধি করা যায়। যুদ্ধের সময় ইংরেজরা আমাদের অনেক আশ্বাস দিয়েছিল, কিন্তু তার কিছুই হল না—এই কথা বলেছিলাম আমি। প্রচুর নৈরাশ্যের সঙ্গে তিনি একটানা যা বলে গেলেন, তাতে তাঁর মনের নৈরাশ্য এবং বিক্ষোভ উদ্ভাসিত হল।

'সারা দুনিয়ার দুঃখের উপসংহার দেখে নিরাশ হয়েছি। এই কুরুক্ষেত্রে অন্নযুক্ত পঞ্চপাণ্ডবের সন্ধিপত্রে যা আছে, সে শুধু দেনা-পাওনা, হিসেবে নিকেশে, আর পৃথিবীর জমির ভাগ-বাঁটোয়ারা—এক কথায়, জ্যামিতি আর পাটিগণিত। কবিতার বদলে মিলল অঙ্ক। আমরা দেখতে চেয়েছিলাম সভ্যতার একটি নতুন প্রাণচিত্র, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর একখানি নতুন মানচিত্র। মুশকিল কি জানো, মাটিকে আমরা যেমন ইচ্ছে ভাগ করতে পারি। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগবিয়োগ করা নিয়েই তো যত মুশকিল। যুদ্ধ মাটি নিয়েই হয়, শান্তি কিন্তু মনুষ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেখছনা জার্মান বলছে, তোমাদের যা সন্ধি হোল তা তো আসলে বিচ্ছেদ। ওদিকে ইতালী বলছে, সন্ধি হোল, কিন্তু সমাস কই!'

'কিন্তু প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতার দাবি মুখে তো ওরা মেনে নেয়,' আমি বললাম।

'কিন্তু সেখানেও গোলমাল আছে যে। কারণ জাতির ইংরেজী প্রতিশব্দ নেশন আর ভাশানালিটিতে রয়েছে বিরোধ। একটা অধিগত, আর একটা রক্তের সম্পর্ক। এ দুটো বিরোধী অর্থের সমন্বয় করতে গিয়েই হয় বিরোধ। এক চৌহদ্দির ভিতর যেমন নানা জাত বাস করে, তেমনি একজাতের লোকও নানা দেশে বাস করে।'

'কিন্তু সে তো ইউরোপের সমস্যা, ভারতবর্ষকে দাবিয়ে রাখার সে যুক্তি খাটে না।'

'খাটানোই খাটে, শান্তির দরবারে তো ঠিক হয়ে গিয়েছে যে, সমগ্র আফ্রিকা এবং এশিয়ার বেশীর ভাগ জাতিই নাবালক। যতদিন তারা সাবালক না হয় ততদিন তাদের শাসন-সংরক্ষণ করবে কয়েকজন অছি। আর জানই

তো, ইউরোপের মত—নাবালকদের শিক্ষার একটা মোটা কথা হচ্ছে—spare the rod and spoil the child। আমাদের অবস্থাটা আর একটু সোলমেলে। আমরাই হচ্ছি মানব-সমাজে একমাত্র living contradiction : এক সঙ্গে সাবালক ও নাবালক। নীগ অব নেশন্‌স্-এর হিসেবে আমরা হলাম নাবালক আর নেশন হিসেবে আমরা থেকে গেলাম নাবালক।'

'তারা বললেই তো আমরা মেনে নেবো না যে আমরা নাবালক।'

'সেখানেই তো আমাদের গোল। আমরা যারা নাবালকত্ব স্বীকার করি না, নাবালকদের বয়স দেখি, তারাই রাজনীতিতে Extremist, আর যাঁরা হিসেব-নিকেশ করে সাবধানে পা ফেলতে চান তাঁরা মডারেট।'

'আপনি এঁদের কোন্ দলের?' আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম।

চৌধুরী মশায় জবাব দিলেন, 'তুমি তো জানো, আমার কলমের মুখ দিয়ে না বেরোয় তা বোমা নয়, সংখ্যাও নয়, সেরেফ, অক্ষর। কাজেই গোল পৃথিবীকে চৌকোণ করার চেষ্টায় আমি কি করতে পারি?'

কিছু করতে পারেন না বলে যে নৈরাশ্য প্রকাশ করেছিলেন, তা সাময়িক, অন্তত উদাসীনতা তাকে কোনমতেই বলা চলে না। কারণ, সাহিত্যের ভিতর দিয়ে নতুন সমাজ এবং রাষ্ট্রগঠনের শুরুত্বের ইঙ্গিত তাঁর বহু লেখায় বহু কথায় বহু গল্পে বহু সময়ে পাওয়া গেছে।

অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না, নিজেকে বলতেন, 'ism-বাদ্দিক,' কিন্তু অর্থের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক না থাকলেও অর্থনীতির সঙ্গে সাহিত্যিকদের সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ, একথা তিনি স্বীকার করেছেন, যদিও 'সাহিত্য বনাম পলিটিক্স'-এর আলোচনায় সাহিত্যের ও পলিটিক্সের ধর্মের পার্থক্য খুব জোরের সঙ্গেই প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাছে পলিটিক্সের দাম ছিল জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। কিন্তু যেহেতু সাময়িক জীবনকে তিনি পলিটিক্সের চেয়ে বড় করে দেখেছেন, মনকে মতের চেয়ে উচ্চ স্তরের বলে গণ্য করেছেন, সেই জন্যই পলিটিক্সে কোন বিশিষ্ট প্রচলিত মতবাদ তাঁর মধ্যে কোন দিন খুঁজে পাওয়া যায় নি।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য মুখ্যত আলোচনা, তর্ক ও বক্তৃতায় বড়। এমন কি, তাঁর গল্পেও আলোচনা-বাহুল্য, প্রবন্ধধর্মী। সে ক্ষেত্রে জীবনের প্রকাশ যে তাঁর সাহিত্যে মুখ্য উপজীব্য হবে তাতে আর আশ্চর্য কি আছে: সেইজন্যই,

ism-বাদিক হয়েও তিনি ছিলেন individualism ও liberalism-এ ঘোরতর বিশ্বাসী. এক কথায়, খাঁটি গণতান্ত্রিক। গণতন্ত্র তাঁর কাছে রাজনৈতিক সংজ্ঞা মাত্র নয়, শাসনব্যবস্থার বিশিষ্ট রূপও নয়, ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যেই তিনি গণতন্ত্রকে খুঁজে পেয়েছেন, সে গণতন্ত্রকে শুধু দেশের মধ্যেই দেখতে চান নি, দেখতে চেয়েছেন সাহিত্যের মধ্যে। তিনি বলেছেন, 'নবসাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন করছে। অতীতে অন্য দেশের ন্যায় এ দেশের সাহিত্য-রাজ্য তখন দু-চার জন লোকের দখলে ছিল, যখন লেখা পুরে থাক, পড়বার অধিকারও সকলের ছিল না, .. বস্তুজগতের ন্যায়, সাহিত্যজগতেরও প্রাচীন কীর্তিগুলি দূর থেকে দেখতে ভাল কিন্তু নিত্য ব্যবহার্য নয়।...নবযুগের ধর্ম হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন করা, সমগ্র সমাজকে ভাঙ্গুর রকমে আবদ্ধ করা,—কর্তাকে ছাড়া নয়, কাউকেও ছাড়তে দেওয়া নয়।...

ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবি তিনি আরো জোরের সঙ্গে ঘোষিত করেছেন, যখন বলেছেন, 'এ যুগে মানুষের উপর মানুষের কোন অধিকার নেই। প্রতি লোকেই নিজের ইচ্ছা, রুচি ও চরিত্র অনুসারে নিজের জীবন গঠন করতে পারে। প্রাচীন প্রথার বন্ধন থেকে সবাই মুক্ত। ধর্ম সম্বন্ধে, চিন্তা সম্বন্ধে, মতামত প্রকাশ সম্বন্ধে সকলেরই সমান স্বাধীনতা আছে।...এ কথা নির্ভয়েই বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই ডিমোক্রাসির গোড়ার কথা, আর তার শেষ কথা। এবং ঐ স্বাধীনতাই হচ্ছে ডিমোক্রাসির ভিত্তি ও চূড়া।'

বস্তুত, উপরোক্ত মন্তব্য থেকে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যচিন্তার একটি সুনির্দিষ্ট ছবি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সম্পাদিত সবুজপত্র সেই বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তি-স্বাধীনতারই প্রকাশ। বস্তুত বাংলা সাহিত্যে তাই সবুজপত্রের তাৎপর্য অসামান্য গুরুত্বে ও সম্মানে। তার স্থায়ী কোন ট্রাডিশন নেই, কিন্তু উজ্জ্বল উপস্থিতিই একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস রচনায় স্বাক্ষর রেখে গেছে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও 'পরিচয়'-এর প্রকাশ

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

সুধীন্দ্রনাথ ১৯২২ সালে গ্রাজুয়েট হন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে এম, এ, ক্লাসে ভর্তি হন। একই সঙ্গে ল' ক্লাসে যোগ দেন এবং বাবার অফিসে আর্টিক্লড ক্লার্ক নিযুক্ত হন। ডালহৌসী অঞ্চলে গুড শেপার্ডস ষ্ট্রীটে বাবার অফিস ছিল, সলিসিটর্স ফার্ম, এইচ, এন, দত্ত এণ্ড কোং। সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্য অধ্যয়ন, ল ক্লাস ও বাবার অফিসে শিক্ষানবিশী পর পর চলতে থাকলো। যদিও বাবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল বড় ছেলে তাঁর কাজের দায়িত্ব নেবে, কিন্তু ক্রমশঃ সুধীন্দ্রনাথ সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তে থাকলেন। ফলত তাঁর ল' পরীক্ষা অথবা আর্টিক্লড ক্লার্ক হিসেবে পাঁচ বৎসর সময় যায় করা সত্ত্বেও যথাযোগ্য পরীক্ষা দেওয়া হলনা।

এই সময়ই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয় এবং প্রায়ই সুধীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে যাতায়াত করতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্য (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সাহিত্য,) নিয়ে তিনি অনেক সময়ই তর্ক করতেন এবং রবীন্দ্রনাথ প্রশান্ত চিত্তে অনুসন্ধিৎসু তরুণ সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহিত্য-আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। বিশেষ করে বিদেশী সাহিত্য, য়ুরোপীয় সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর ব্যুৎপত্তি দেখে তিনি মনে মনে সুধীন্দ্রনাথকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেন এবং বয়সের বিরাট ব্যবধান সত্ত্বেও বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন। এই সময় সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের এত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন যে তিনি বিদেশ যাত্রার সময় বড়দাকে সঙ্গে করে নিতে চাইলেন। বাবা সানন্দে অনুমতি দিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিরল সাহচর্যে ও বিদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে সুধীন্দ্রনাথের মনের পরিধি প্রসারিত হ'ল এবং বিশ্ব ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে প্রগাঢ় অনুরাগ সঞ্চারিত হল।

দেশে ফিরে এসে সুধীন্দ্রনাথ বাবার কার্যে কাজ না করে আমার মামা সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক প্রতিষ্ঠিত লাইট অব এশিয়া ইনসিওরেন্স-এ যোগ দেন। কিন্তু সে কাজ তাঁর বেশী দিন ভাল লাগেনি, লাগার কথাও নয়। বিদেশ যাবার

পূর্বে সাংবাদিকতা করবার অভিপ্রায়ে শরৎচন্দ্র বন্ধু-প্রতিষ্ঠিত নিবাচি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। সে সময়েই আমাদের বাসায় একতলার বৈঠকখানা ঘরে সাহিত্যের আড্ডা বসত। দাদার বন্ধুবান্ধব নিয়মিত আসতেন। মূলত সাহিত্য বৈঠক হলেও সাহিত্য ছাড়াও ধর্ম ইতিহাস দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা চলত। তৎকালীন য়ুরোপীয় সাহিত্যের আদর্শ নিয়ে, কবিতার বিষয়বস্তু নিয়ে প্রায়ই তর্ক বাধত। একটি সাহিত্যপত্র প্রকাশ করলে মন্দ হত না এমন একটা চিন্তা ভাবনা তখন অনেকে করতে থাকলেন। কিন্তু রুচি ও আদর্শ অনুযায়ী পত্রিকা প্রকাশ করা সহজসাধ্য নয়। বাংলাদেশে তখন 'প্রবাসী' সবচেয়ে অভিজাত পত্রিকা। এবং সুধীন্দ্রনাথের রুচি যে ইতিমধ্যেই উচ্চ সুরে বাঁধা হয়ে গেছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। পত্রিকা প্রকাশ করলে এমনই করতে হবে যে বাংলা সাহিত্যের সুধী ও বিদগ্ধজনের কাছে তা বরণীয় হবে।

সে সময়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুক্ত পরবর্তী আধুনিক ইংরেজী কবিতার কর্ম ও বিষয় বৈচিত্র্য নিয়ে সুধীন্দ্রনাথের দীর্ঘ বিতর্ক উপস্থিত হয়। বিষয় গৌরবের মূল্য কবিতার ক্ষেত্রে গৌণ, এমন অভিমত প্রকাশ করায় রবীন্দ্রনাথ সকৌতুকে সুধীন্দ্রনাথকে বললেন, তাহলে মোরগের ওপর কবিতা লেখ তো, দেখা যাক কিরকম উতরোয়। সুধীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, কবিতা হবেই এবং সে-কবিতা আপনার বিচারে উত্তীর্ণ হবে, আশা রাখি।

কয়েকদিন বাদে সুধীন্দ্রনাথ 'কুকুট' নামে একটি কবিতা লিখে রবীন্দ্রনাথের কাছে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে হাজির হলেন। বাইরে যতই সাহস থাক, মনে অবশ্যই দুর্বলতা ছিল—আর কেউ নয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পড়বেন এবং তিনি যখন তাঁর খ্যাতির মর্যোচ্ছ লিখবে। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পেশ করে তিনি উৎকণ্ঠিতচিত্তে অপেক্ষা করলেন। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি পড়লেন, আবার পড়লেন। প্রশান্ত হাসিতে তাঁর মুখ ভরে উঠল। 'না, তুমি লিখেছ'—রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন এবং নিজেই 'প্রবাসী' পত্রিকায় কবিতাটি পাঠিয়ে দিলেন, প্রকাশের জন্য। প্রবাসীতে 'কুকুট' নামে কবিতাটি ('তন্বী' কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত) প্রকাশিত হল। এই কবিতাটিই তার সর্বপ্রথম প্রকাশিত কবিতা।

এরকম সময় সুধীন্দ্রনাথ সাহিত্য নিয়ে তীব্রভাবে মেতে গেলেন, কবিতা

লিখতে আরম্ভ করলেন, কাব্য সম্বন্ধে বৈঠকখানায় ঘরে তো নিয়মিত বৈঠক বসতই। এর কিছুদিন পূর্বে য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে আয়োজিত একটি সাহিত্য সভায় সুধীন্দ্রনাথ 'কাব্যের মুক্তি' নামক বিষয়ে একটি দীর্ঘ আলোচনা করেন।[১] উক্ত সভায় শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং সুধীন্দ্রনাথের বক্তৃতার পরেও নিজে দীর্ঘ আলোচনা করেন। সুধীন্দ্রনাথের সেই সময় মনে হয়েছিল, সাহিত্যচর্চাই সম্ভবত তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসায় ও আশীর্বাদে উৎসাহিত হলেন খুবই এবং সীমিত হলেও, নিয়মিত কাব্যচর্চা চলতে লাগল। কয়েকটি কবিতা ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশার্থে পাঠান। বলা বাহুল্য, তৎকালে আধুনিকপন্থী সুধীন্দ্রনাথের কবিতা, সাময়িক পত্রে দু একটা প্রকাশিত হলেও, toneএর সঙ্গে মিল ছিলনা বলে সম্পাদক সুনজরে দেখলেননা; কবিতা প্রকাশিত হ'লনা। অন্যদিকে 'শনিবারের চিঠি'তে সেকালে একটি মোরগের ছবি প্রচ্ছদপটে ছাপা হত। সুধীন্দ্রনাথ 'মুরগি' শীর্ষক কবিতা লেখবার ফলে উক্ত পত্রিকার পরিচালকবৃন্দ মনে করলেন যে সুধীন্দ্রনাথ ইচ্ছে ক'রেই তাঁদের পত্রিকাকে ব্যঙ্গ করবার জন্য কলম ধরেছেন।[২] এ-চিন্তা কতদূর অমূলক তা উপরে বর্ণিত ঘটনা থেকে বোঝা যায়। যাই হোক, শনিবারের চিঠির পরিচালকদের সঙ্গে পিতৃদেবের ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও, এই বিষয় নিয়ে একটা অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হল। এবং নানা কারণে সুধীন্দ্রনাথ স্থির করলেন যে একটি পত্রিকা তিনি স্বয়ং প্রকাশ করবেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে তখন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুভোষ বসু, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, সহীদ সুরাবর্দি প্রভৃতি সকলেই খুব উৎসাহ দিলেন। মন স্থির করে তিনি আমাকে জানালেন, যে সব আয়োজন ঠিক হয়েছে, তুমি কিছু টাকা যোগাড় করে দাও। আমরাও তখন সাহিত্যের পরিবণ্ডলে বাস করছি। সবিশেষ উৎসাহিত বোধ করলুম। তাছাড়া দাদা বলছেন। অন্য চিন্তা না করে নিজের কাছে যা ছিল তা থেকে আড়াই শো টাকা দিলুম। পঞ্চাশজন গ্রাহক করে অগ্রিম দুশো টাকা বড়দাকে দিলুম। বাবার কাছে চাইতে উনিও দুশো টাকা বড়দাকে দিলেন। এমনি ক'রে সাকে দু'শো টাকায় যোগাড় হ'ল। বড়দার কাছেও

১ এই বক্তৃতাটি পরে 'পরিচয়'এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২ শনিবারের চিঠি 'মুরগি' কবিতার একটি parody প্রকাশ করেন: নৈশান্ধকার পর্ণশালা
কপাল উদয়ার অন্তরাল ইত্যাদি

কিছু টাকা ছিল। সব মিলিয়ে আশা হল যে অল্পভাবে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হবে। কৌশলায় মডার্ণ আর্ট প্রেসে ছাপা হবে। তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে 'পরিচয়' এর পরিচালক হিসাবে বর্তমান উত্তরা-সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তীও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে জানানো হ'ল। প্রথম সংখ্যায় তিনি কিছু লিখলেন না কিন্তু পত্রিকা দেখে দ্বিতীয় সংখ্যাতেই চিঠি পাঠালেন—নামে চিঠি হলেও বহুত প্রবন্ধের আকৃতি।* প্রথম সংখ্যায় লেখকদের মধ্যে কয়েকজন : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বীরবল, প্রবোধ বাগচী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুশোভন সরকার, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ, হেমেন্দ্রলাল রায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি। পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা হ'ল ১৫৪ ; দাম প্রতি সংখ্যা ১৲ বার্ষিক ৪।০। ত্রৈমাসিক পত্রিরূপে বাংলা ১৩৩৮ সনের শ্রাবণ মাসে 'পরিচয়' প্রকাশিত হ'ল। পত্রিকার নাম অনুমোদন করেন আমাদের মোসোমশায় চারুচন্দ্র দত্ত। এরও 'পরিচয়' পত্রিকার জন্মই, সুধীন্দ্রনাথের সবিশেষ অনুরোধে, চারুচন্দ্র দত্ত সর্বপ্রথম লিখতে আরম্ভ করেন এবং 'পুরোনো কথা'র সূত্রপাত হয়। পিতৃদেবের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বহু রচনাও পর পর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক বৈঠক আবার নিয়মিত বসতে সুরু করে এবং প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় আমাদের বাইরের ঘরে অপূর্ব চন্দ, নীরেন রায়, শহীদ সুহরাবর্দি, সত্যেন বসু, প্রবোধ বাগচী, প্রশান্ত মহলানবিশ, যামিনী রায়, সুশোভন সরকার, ধূর্জটিপ্রসাদ, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, হায়াতুল্লা দেব, হিরণ সান্যাল, বিষ্ণু দে, এবং আরো অনেকে আসতে লাগলেন। এদের অনেকে প্রায় রোজই আসতেন, তবে ঐ দিনটিতে বিশেষ ভাবে একটি সাহিত্যের বৈঠকী মেজাজ নিয়ে সকলে বসতেন। পাশের ঘরে পিতৃদেব তাঁর প্রয়োজনীয় কাজকর্ম ও পড়াশুনা করতেন। বৈঠকে কখনো আসেননি বটে, তবে প্রয়োজনে সর্বদাই পত্রিকার শুভাশুভ চিন্তা করেছেন। প্রথম দিকে পত্রিকায় কোন গ্রন্থসমালোচনা হয়নি তবে পরবর্তীকালে যামিনী রায় 'পরিচয়'এর জন্য একাধিক প্রবন্ধ এঁকে দিয়েছেন। 'পরিচয়' পত্রিকার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল পুস্তক পরিচয়। মনে পড়ে, আমি যখন আমার পূজ্যপাদ অমরেন্দ্রনাথের জীবনী লিখি ও পরে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়† ধূর্জটিপ্রসাদ বইটির একটি উল্লেখযোগ্য

* এই চিঠিতে 'নবযুগপত্র' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা আছে।

† অমরেন্দ্রনাথ : চট্টোপাধ্যায় দত্ত। বস্তুত চট্টোপাধ্যায় দত্ত ও বর্তমান প্রবন্ধের লেখক রবীন্দ্রনাথ দত্ত একই ব্যক্তি এবং ঐ অমরেন্দ্রনাথের মাতুলপুত্র ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তের দ্বিতীয় পুত্র।

সমালোচনা করেন। যাই হোক, পত্রিকা দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল—বাংলা দেশের সর্বশ্রেণীর লেখক 'পরিচয়' পত্রিকাতে না লিখলেও একটি বিশেষ শ্রেণীর পাঠক ও লেখকের কাছে যে এর অপরিহার্য আবেদন ছিল তা ঐতিহাসিক সত্য এবং সেযুগের অন্যান্য বিশিষ্ট পত্রিকা সবুজপত্র, প্রবাসী, বিচিত্রা প্রভৃতির পাশেই 'পরিচয়' তার একটি সুনির্দিষ্ট আসন তৈরী করে নিতে পেরেছিল। এর প্রায় একক কৃতিত্ব সুধীন্দ্রনাথের। বাংলা সাহিত্যের চিন্তার জগতে, মনন ও যুক্তি উদার বুদ্ধিবাদের প্রেক্ষিতে 'পরিচয়'-এর অবদান এখন পর্যন্তও উদাহরণ স্বরূপ। কবি ও সমালোচক সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যকীর্তি যতটা তাৎপর্য, সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথের মনীষাও ততটাই উজ্জ্বল ও দীপ্তিময়। 'পরিচয়' পত্রিকার জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকায় ফলে সুধীন্দ্রনাথ ষষ্ঠ বর্ষ থেকে তাকে মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করেন। সুধীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকার শেষ প্রকাশ ১৩৬০, আষাঢ় ১২শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও তাঁর কবিতা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

কোনো কৃতী কবির রচনা নিয়ে সমালোচকরা প্রায়ই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি কোনো পূর্বগামীর অনুসারী কি না কেউ এ অনুসন্ধানে ব্যস্ত হন কেউবা তাঁকে কোনো মতবাদে সংশ্লিষ্ট করতে পারলে সুখী হন। সমালোচকরা ভুলে যান কৃতী কবিমাত্রেই বিচিত্রপথগামী। তাঁদের রচনায় তাই অনেক সময় অসঙ্গতি এবং বিরোধিতা বর্তমান। সবটুকু নিয়েই কবির কৃতিত্ব। তা বিস্মৃত হয়ে কবিকে আলোচনা করতে গেলে সে আলোচনা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য।

একালে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার আলোচনা পড়ে আমার এমনি মনে হয়েছে। কেউ তাঁকে বলেছেন ক্লাসিসিষ্ট, কেউবা রোমান্টিক। আবার কেউ বলেছেন তিনি মালার্মে-ভ্যালেরির অনুসারী, কেউবা মত প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্র-অনুসারী বলে। তাঁর জীবনের ও কাব্যান্তর্গত তাঁদের বিরোধিতার প্রতিও কেউ ইঙ্গিত করেছেন। তাঁরা মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করেছেন একথা বলব না কিন্তু এ কথা আমার স্পষ্টই মনে হয়েছে যে তা সুধীন্দ্রনাথের কবিতার প্রকৃত আলোচনা নয়। হয়ত সব আলোচনা মিলিয়ে পড়লে তাঁর কবিতা বুঝতে সহজ হয় কিন্তু কোনো একটি বিশেষ আলোচনা সুধীন্দ্রনাথকে স্পষ্টভাবে বোঝাতে পারে না। সব মতবাদের ও প্রভাবের বাইরে গিয়ে সেখানে এই কৃতী কবি তাঁর স্বাতন্ত্র্যে দাঁড়িয়ে আছেন তার সন্ধান কেউ আজ পর্য্যন্ত দিয়েছেন বলে জানিনে। যে অধ্যবসায় ও অনুশীলনপরায়ণতা সুধীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন তা নিশ্চয়ই কারো অনুসারী হবেন বলে নয়, স্বাতন্ত্র্যের গৌরব অর্জন করবার জন্যেই। এই সহজ কথাটা কেন যে সমালোচকরা বিস্মৃত হয়ে তাঁর কবিতার পূর্ণ মর্য্যাদা দিতে পারেন নি, ভেবে বিস্মিত হই।

সুধীন্দ্রনাথের জীবনে একটা দ্রোহ সক্রিয় ছিল। তাঁর ছাপ তাঁর অনেক কবিতায় এসেছে। দ্রোহ রোমান্টিসিজমেরও একটি অঙ্গ আবার ক্লাসিসিজমেরও অঙ্গ। সুধীন্দ্রনাথের দ্রোহ যে কোন ধারায় তা বলা মুস্কিল। রোমান্টিকদের

নিকট যেমন ঈশ্বর মৃত বা নিহত, জড়বাদীদের নিকটও তাই। সুধীন্দ্রনাথের এ কথা—

উড়ায়ে যজ্ঞের বায়ে ছিন্ন বেদ-বেদান্তের পাতা
হলেছি পিশাচ হস্তে নিহত বিধাতা। (অর্কেস্ট্রা)

শুনে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না তিনি রোমান্টিক না জড়বাদী। তিনি নিজে বলেছেন: "অল্প বয়সেই অনেকান্ত জড়বাদের আশ্রয় নিয়েছিলুম।" তা থেকে বলা যায় যে তার নিরীশ্বরতা জড়বাদীরই লক্ষণ। কিন্তু রোমান্টিক কবির বর্ণনাও আমরা শুনি: That the artist, particularly the poet should be demoniac, is a very ancient idea which is formulated, provocatively in the work of the romantics." (The Rebel: Albert Camus) একথা শুনে এবং 'হলেছি পিশাচ হস্তে নিহত বিধাতা'-র কথা ভেবে সুধীন্দ্রনাথকে রোমান্টিক বলে না করে উপায় কী?

কিন্তু বিধাতাহীন জগতের কল্পনা সুধীন্দ্রনাথের 'অর্কেস্ট্রা' ও 'সংবর্তে' এসে থাকলেও 'ক্রন্দসী'র যুগে তা তেমন ছিল না। ভগবানের ব্যর্থতাকে তখন তিনি উপলব্ধি করেছেন, তার মৃত্যুতে পৈশাচিক আনন্দ পান নি। তখন তিনি শুধু বলেছেন:

হায় ভগবান,
হায়, হায় ব্যর্থ ভগবান
তোমার অমিত ক্ষমা, সে কি শুধু
অসুরের তরে? (ক্রন্দসী)

এখানে দ্রোহ নেই, রোমান্টিসিজম্ নেই, জড়বাদ নেই।

সুধীন্দ্রনাথ 'সংবর্তে' বলেছেন, "যেহেতু প্রস্রষ্টা আমি..."—'প্রস্রষ্টা' এ বিশেষণই তাঁর প্রতি প্রযোজ্য। বহুবিধ ভাবধারা ও কল্পনা কবি-হৃদয়ে প্রশ্রয় পায়, সুধীন্দ্রনাথের হৃদয়েও তা পেয়েছিল। রোমান্টিসিজম্ যদি প্রশ্রয় পেয়ে থাকে তা কালধর্মে। সাহিত্যের রোমান্টিক পরিবেশে তিনি কবিতা লিখেছেন। তাই তাঁর কতিপয় কবিতার পশ্চাৎপট যদি রোমান্টিসিজম্-রঞ্জিত হয়ে থাকে, তা ছিল অনিবার্য। কিন্তু কবিতার বিষয়কে তিনি রোমান্টিক করে তোলেননি।

রোমান্টিসিজমের অন্য লক্ষণ 'preference for the individual' ও তাঁর একটি কবিতায় আবিষ্কার করা যায়:

"নিখিল নাস্তির মৌনে লোহবাণ করেছি ক্ষেপণ :
বলেছি আমি সে আত্মা, যে উত্তীর্ণ হয়েছে তারায়
উধাও মনের আগে ... ... (সংবর্ত)

এখানে রোমান্টিকদের 'adventure of imagination'—ও আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কেউ যদি বলেন, এ হল 'নিশ্চিন্ত বৈদান্তিক' পিতারই যোগ্য সন্তানের উক্তি তাহলে প্রতিবাদ করার কিছু হয়ত থাকে না। যিনি আত্মার এ শর্ত্তা মানেন তিনি যদি বলেন, 'হয়তো ঈশ্বর নেই ; তৈরব সৃষ্টি আজও অনাথ।' তবু তাকে জড়বাদী বলে মেনে নিতে যুক্তিতে বাধে। ঘোটের উপর আমরা বলব, মনকে তিনি প্রণত করেছিলেন বিচিত্রধারার চিন্তার আশ্রয় রূপে।

জড়বাদের স্পর্শ যে তাঁর কবিতায় নেই, হয়ত এমন কথা বলা যায় না। জড়বাদীদের 'Evergreen is the tree of life'-এর উৎসাহব্যোতক ভাবনায় সুধীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই এ কথাগুলো বলেছিলেন :

অক্ষয় মনুষ্যবট নিস্পিকার যে প্রাণপরাগে
নিত্য বিকশিত হয় আত্মক্লান্ত নিখিলের ফলে
সে অনাদি চিৎসত্তা খুঁজি আমি আপন অন্তরে। (ক্রন্দসী)

কিন্তু সে খোঁজার ফলে যে সত্তা তাঁর উদ্ঘাটিত তা ঘোটেও ভাবের কাম্য নয়, এমন কি জড়বাদীরও কাম্য হতে পারে না :

আমার মনের আদিম আঁধারে
বাস করে প্রেত কাতারে কাতারে।
প্রাক্‌পুরাণিক বিকট পশুর
দারভাগ মোর শোণিতে নাচে। (উত্তরফাল্গুনী)

এ চিত্রে ফ্রয়েড-ডারউইনের শিষ্যরা খুশী হতে পারেন কিন্তু কাব্য-পাঠক মাত্রেই ব্যথিত হবেন।

সুধীন্দ্রনাথকে অপেক্ষাকৃত তরুণ কবিরা প্রগতী বলতে ইচ্ছুক। অনেকে মনে করেন গঠননৈপুণ্যই (workmanship) প্রগতী কবিতার লক্ষণ। তা যদি হয় তাহলে তাঁর 'অর্কেস্ট্রা' এবং 'বর্ষাস্তি' কবিতা দু'টি প্রগতী। কিন্তু প্রগতীত্ব কি শুধু বহিরঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত ? অন্তরঙ্গ কোনো হিয়, আদৌ তা কি প্রগতী কবিতার অধিষ্ঠ নয় ? কলাবাদী সুধীন্দ্রনাথ তেমন কবিতায় আদৌ ছিলেন কি না সন্দেহ। অতীতে ও ভবিষ্যতে যিনি আস্থাহীন ('প্রগতিতে যত

না' পঞ্চাশৎপদ, অত্যোধিক বিমুখ অতীতে।'— যযাতি) তাঁর পক্ষে ক্ষণদী কবিতার অন্তরঙ্গে বিশ্বাসী হওয়া অসম্ভব। তাঁর 'সাগরিকা'-ও শাশ্বতী নয়, ক্ষণিকা। যদিও

একটি কথায় ছিন্ন পরস্পর ছুঁড়ে
তার করেছিলো সাতটি অমরাবতী
একটি নিমেষ টাঙালে নয়না ভুরুতে
থামিলো কালের চিরচঞ্চল গতি। (অর্কেস্ট্রা)

তবু 'শুধু অঘটনে অঘটিকে সে ভালোবাসে।' এমন অভিজ্ঞতার পর স্বাভাবিক-ভাবেই সুধীন্দ্রনাথের কাছে 'মহাসত্য' এই :

অসম্ভব প্রিয়তমে, অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ
অসম্ভব চিরপ্রেম ... ... (অর্কেস্ট্রা)

কিন্তু এ স্বীকৃতি, অনিতাই তাঁর জীবন আর কাব্যে শেষ কথা নয়। কেননা এই ক্ষুদ্র সত্যও তাঁর জানা যে

ক্ষণভাগ মানুষের ভঙ্গুর ধরিল অঙ্গীকার
মর্ত্য-ফেনিল হয়ে ফুটে যায়বার (অর্কেস্ট্রা)

অনিত্যে, ভঙ্গুরতাতেই যেন তাঁর আনন্দ বেশি :

অনিত্য বলেই তুমি তীব্র তব নয়নের বাণী।

অনিত্যের সৌন্দর্যে যিনি প্রথম তাঁকে নিত্য শাশ্বত ক্ষণদী রচনাকার বলে মেনে নিতে মন চায় না। অর্কেস্ট্রার অনিত্যের স্তবটি উচ্চকিত। 'আজি আর ফিরিব না শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে'—পরিচ্ছন্ন ভাষায় তিনি এ কথা বলেছেন। কাজেই সুধীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি ক্ষণদী কবি বলা যায় কি না এ নিয়ে অবকাশ আছে।

অর্কেস্ট্রা-বইএর ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অর্কেস্ট্রার রবীন্দ্রনাথের একাধিক পংক্তি তো, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, এসে গেছে...' তাছাড়া তিনি যা বলেন নি, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিশেষ ছন্দের অনুকৃতিও অর্কেস্ট্রা কবিতায় দেখা যায়, কিন্তু তা বলে এ কথা কিছুতেই বলা চলে না, সুধীন্দ্রনাথের কবিতা রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত। তাঁরা দুজন দুই মানসিক ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছেন, কাজেই প্রভাবের কথা অবান্তর। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় শীতল সুর স্থিতির কবিদের আর সবার মধ্যেই হয়ত কিছু-না-কিছু অনুভব করা যায়—শুধু একমাত্র ব্যতিক্রম

সুধীন্দ্রনাথ। তাঁর কবিতার সৌরভ ধ্বনি তাঁকে পৃথক করে রেখেছে। 'এ সম্পর্কে তাঁর কথাই প্রামাণ্য: "বৈষয়িক উক্তি এ গ্রন্থের অনেক জায়গা জুড়ে আছে; এবং যেখানে সে কথা ইন্দ্রাকৃত সেখানেই আমার বক্তব্য বিশেষত অতিরাধীত্রিক।" (ভূমিকা, অর্কেস্ট্রা)।

সুধীন্দ্রনাথে মালার্মের প্রভাব যাঁরা দেখতে পান, তাঁদের হয়ত সুধীন্দ্রনাথের একথাগুলোই উৎসাহিত করেছে: "মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অদ্বিষ্ট; আমিও মানি যে কবিতায় মুখ্য উপাদান শব্দ..." (ভূমিকা, সংবর্ত)। এ মানাতেই এ কথা প্রমাণ হয় না যে মালার্মের অনুভব ও অভিজ্ঞতা সুধীন্দ্রনাথে বর্তেছে। মালার্মের মতো কবিতাকে শব্দ-শিল্প মনে করেছেন সুধীন্দ্রনাথ—তার বেশি কিছু নয়। মালার্মের ভাবের ঘরে উঁকি দিয়ে তিনি কিছু আত্মসাৎ করেন নি। প্রকরণের সমধর্মিতা ছাড়া মালার্মের সঙ্গে তাঁর আর কোনো মিল নেই। শব্দের গুণেই মালার্মের কবিতা অভিজাত, এবং সুধীন্দ্রনাথের কবিতাও তা-ই।

সুধীন্দ্রনাথ পূর্বাপর ক্ষণবাদী। 'অর্কেস্ট্রা' থেকে 'দশমী' পর্যন্ত তাঁর এই মনোভাব বিধৃত। এই স্বধর্মেই তিনি প্রতিষ্ঠিত। অর্কেস্ট্রার এই অভিজ্ঞতা:

মোদের ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের গানে,
স্থান পাবে হে ক্ষণিকা, সখনীবি যৌবন তোমার:

'দশমী'তে স্পষ্ট-ভাষণে ব্যক্ত হয়েছে: "আমি ক্ষণবাদী" তাঁর ভাষণে যা অভিজ্ঞতায় যা নেই তা নিয়ে তাঁকে চিহ্নিত করায় চেষ্টা অন্যায়। কিন্তু পরিতাপ এই যে সে অন্যায় করতে সমালোচকরা দ্বিধা করে না।

সুধীন্দ্রনাথকে পূর্বাপর ক্ষণবাদী বলে' আমি এখন ইঙ্গিত করছিনে যে তিনি আত্মসমীক্ষা থেকে ক্রমে বিশ্বমীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। 'সংবর্তে'র আলোকার অধ্যায়ে তাঁর স্মৃতি-সংগ্রহে যে স্মৃতি-সংসক্ত প্রেমের অভিজ্ঞতা ছিল তারই পর্যালোচনা করেছেন, কিন্তু সংবর্তের কালে সমস্ত বিশ্বের ঘটনা-প্রবাহ তাঁর সত্বিৎকে নাড়া দিয়েছে। কবিতার প্রধান উপজীব্য হয়েছে তখন বিশ্বনীতি, প্রেম-চর্চা নয়। 'বিপ্রলব্ধ বিশ্বমানব বিষাদে' যে অভিজ্ঞতা সঞ্চার হয়েছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন দিনগুলোতে তা আমরা শিহরিত হয়ে শুনতে পাই 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থে।

আমি আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে এক মত যে "Sudhindranath's

poetry is characterised by an unrivalled potency to express the deepest truths..." সত্য তাপণে তাঁর সমকক্ষ সত্তি কেউ নেই—প্রেম, সমাজ, দর্শন, রাজনীতি নিয়ে অনেক চমকপ্রদ সত্য সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় ছড়িয়ে আছে—অনেকস্থলে কবিতার চাইতে সত্যতাপণই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বেশি—যে কোনো সজাগ পাঠকের চোখেই তা ধরা পড়বে, তাই উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন।

সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত উচ্চমন্যতা এবং কবিতার উচ্চমন্যতা হয়ত এই সত্য-তাপণই ফল। মিথ্যার অন্ধকারে তিনি নিজেকেও ঢাকেন নি—স্বপ্নের কুহেলীজালে কবিতাকেও জড়ান নি। যে অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্মম পৃথিবী তাঁর কবিতায় পরিবেশ রচনা করেছে—তাতে তাঁর সত্য নিষ্ফল নয়; তাঁর অভিজ্ঞতা তার ঊর্ধ্বে প্রোজ্জ্বল। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা যদি ঠপদী বলে গণ্য হয়, তা হবে তিনি সত্যের মুখ উদ্ভাসিত করেছেন বলে।

আধুনিক বাংলা সাময়িকপত্র ও বাংলা সাহিত্যের এ-কাল

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আমার আজকের আলোচনার বিষয়, একালীন বাংলা সাময়িক পত্র ও বর্তমান বাংলা সাহিত্যের সমুন্নতিতে তার দান। বিষয়টি দীর্ঘ এবং অল্প সময়ের সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনাতে এর সব দিক উদ্ঘাটিত করা অসম্ভব। কাজেই আমার বক্তব্য মোটামুটি প্রয়োজনীয় কথাগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। যা বাদ পড়বে, তার জন্যে গোড়াতেই আমি মার্জনা চেয়ে রাখছি।

কিন্তু সর্বাগ্রে আধুনিক বলতে আমরা কি বুঝব এবং কোন সময় সীমা থেকে আমরা বাংলা সাহিত্যের আধুনিক অধ্যায়ের সূচনা নির্দেশ করব, সেটা ঠিক হওয়া দরকার। সহজ অর্থে যা সাম্প্রতিক, যা আজকের, তাই আধুনিক। সে হিসাবে আজকে যা কিছু লেখা হচ্ছে, তাই আধুনিক সাহিত্য। যা কিছু চিত্রকর্ম হচ্ছে, তাই আধুনিক চিত্রকলা বলে অভিহিত হতে পারে। কিন্তু আধুনিক সাহিত্য ও শিল্প বলতে আমরা কি শুধু তাদের উৎপাদন কালের সমসাময়িকতা বুঝি, অথবা একালীন চিন্তা-চর্চা ও মননশীলতার কতকগুলি বিশেষ লক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত রচনা বুঝি?

বলা বাহুল্য তাই। অর্থাৎ শেষোক্ত কথাটাই ঠিক। আজকের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে যার উদ্ভব এবং আজকের জীবনকে যা ছুঁয়ে আছে, হয় তাকে বুঝতে ও বোঝাতে চাইছে, নয় তাকে নূতনতর সম্ভাবনীয়তার পথে চালিত করে নিয়ে যেতে চাইছে, তাই সত্যিকার আধুনিক রচনা। চলতি বাজারের প্রয়োজনে প্রত্যহ যে রাশি রাশি গার্হস্থ্য উপন্যাস লিখিত ও প্রকাশিত হচ্ছে, গতানুগতিক ধারায় কবিতা প্রচারিত হচ্ছে, সাবেকী আদর্শের গল্প প্রণীত হচ্ছে, তার কোনটাই আধুনিক নয়, যদিও তা আজকের মাটিতেই জন্মাচ্ছে।

বেশ কথা, এই একালসিদ্ধ আধুনিকতার বিশেষ লক্ষণগুলি কি এবং ঠিক কবে থেকে বাংলা সাহিত্যে তাদের স্বীকৃতি ও অনুপ্রবেশ হল? বলা দরকার যে উনিশ শতকের শেষ দুই দশক থেকে বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের মধ্যে পশ্চিমী দুনিয়ায় বিজ্ঞানের যে অপ্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়েছে, তার ফলে সমগ্র পৃথিবীর মনেই পুরনো প্রত্যয় ও স্বীকৃত মূল্যমানগুলি উল্টে পাল্টে গেছে।

একালীন সাহিত্য-শিল্পের জন্ম এই ভাঙনের মৃত্তিকা থেকে। তাই তা আগে পূর্বতন থেকে অনিবার্য কারণেই আলাদা হয়েছে।

একটু সরল করে বলি। উপরোক্ত সময় সীমার মধ্যে বিজ্ঞান মানুষকে দেশ কালের বিবিধ বাধার ওপর জয়ী করেছে। যেভাবে এক পর দুই প্রেক্ষণ ও তড়িৎশক্তি ছোট বিমান একের পর এক আবিষ্কৃত হয়েই এই অসম্ভব সম্ভব করেছে — পারমাণবিক শক্তি মানুষের হাতে এনে দিয়েছে প্রকৃতির ওপর অসীম প্রভুত্ব স্থাপনের সুযোগ। জড়বস্তুর মধ্যে থেকে প্রাণের প্রাথমিক উপলব্ধি করে মানুষ বুঝেছে, জীবের জন্ম-মৃত্যুর পিছনে কোন রহস্যময় অধিচেতনার খেলা নেই। মনঃসমীক্ষণের আলোয় খুলে গেছে মানুষের অবচেতন লোকের বন্ধ দুয়ার। মানুষ বুঝেছে জৈব কামনাই জীবনের আদ্যা শক্তি। সমাজবিজ্ঞান ও অর্থবিজ্ঞান নূতন মূল্যায়নের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে সম্পত্তি, সম্পর্ক ও সমাজের।

এই যে শতমুখে প্রসারিত জ্ঞানের পটভূমি, এর দান সম্বল নিয়ে তৈরি হয়েছে তাঁদের মানসিকতা, তাঁরা অনিবার্য ভাবেই জগৎ ও জীবনকে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছেন নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে। পুরানো প্রত্যয় ও মূল্যমানকে স্বীকৃত মূল্যমান ঝেড়ে চলা সম্ভব হয় নি কোন মতেই তাঁদের পক্ষে। স্বভাবতই তাঁরা যে সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি করেছেন, তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধাত ও জাত নিয়ে গড়ে উঠেছে। এ না হবে কেন? এমন শক্তিশালী ও সর্বতোমুখী চিত্ত-বিপ্লব ত আগে কোনদিন হয় নি।

বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতিও এই বিশ্বব্যাপী ভাব-বিবর্তনের মধ্যে অনড় থাকতে পারে নি। তার মনের আকাশে এসেছে এই নূতন চিন্তার ঝড় এবং তা পুরোনো আস্থা ও আশ্রয়ের পুঁজি-পাটা ওলটপালট করে দিয়েছে, সেই সঙ্গেই দিয়েছে নূতনের জমি তৈরি করে। এই নূতনত্বের জোয়ার বাংলা ভাষায় এসেছে সব চেয়ে জোরালো হয়ে প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র থেকে এবং তার শক্তি কতখানি, তা বোঝা যাবে, খোদ রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত তার দ্বারা প্রভাবিত হতে দেখে। তিনি এখান থেকে শুধু নূতন ভাষারীতি গ্রহণ করেন নি, নূতন জীবনদর্শনেও উত্তীর্ণ হয়েছেন।

সুতরাং সবুজপত্রকেই আমরা আধুনিকত্বের প্রথম গণনীয় দিক-চিহ্ন

হিসাবে ধরব এবং মূল আলোচনা আমার সীমাবদ্ধ থাকবে সংবাদপত্র ও তার পরবর্তী সাময়িকপত্রিকার প্রসঙ্গেই।

কিন্তু তার আগে গোড়ার বনিয়াদটাও আমাদের অল্প একটু নাড়িয়ে দেখতে হবে। সবাই জানেন আশা করি যে বাংলা ভাষার শ্রীরামপুর পাদ্রীদের দিগ্‌দর্শনই প্রথম সাময়িক পত্র। তারপর রামমোহন রায়ের সংবাদ কৌমুদী, ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের তত্ত্ববোধিনীর আবির্ভাব; এইগুলি সবই সাপ্তাহিক এবং অনেকটা পর্যন্ত সংবাদপত্রগন্ধী কাগজ, যদিও সব গুলিই বিজ্ঞান, ইতিহাস ও পুরাবৃত্তির নানা প্রসঙ্গ প্রকাশ করত এবং ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক টুকরো বাদানুবাদ মূলক প্রবন্ধ প্রচার করত। বিশুদ্ধ সাহিত্য হিসাবে এদের স্থান গৌণ।

এর পর একে একে দেখা দেয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ, প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদারের মাসিকপত্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন। এই তিনটিই মাসিক এবং তিনটিই সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্র। এর মধ্যে বঙ্গদর্শন থেকেই প্রকৃত পক্ষে বাংলা সাময়িক পত্রের উদ্দীপন কাল আরম্ভ। মতবাদে ও জীবনচিন্তায় বঙ্কিম রক্ষণশীল শিবিরের অন্তর্গত ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর সমকালে সভ্য শিক্ষিতদের নিঃসন্দেহে তিনি প্রথম শ্রেণীর অধিকার সম্পন্ন ছিলেন। তাই বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা, ঐতিহাসিক বস্তুবোধ ও সামাজিক নীতি নিষ্ঠা, উনিশ শতকের মানসিকতার এই ত্রি-ধারাকে তিনি প্রথম সার্থকভাবে বাংলা সাহিত্যে নিয়ে আসেন। বঙ্গদর্শন থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতী, সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সাহিত্য ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবাসীতে এই ত্রি-ধারারই ক্রম পরিণতি লক্ষ্য করি।

ভারতী ও প্রবাসীর সঙ্গে ছিল ব্রাহ্মসমাজের পৃষ্ঠপোষকতা, তাই সমাজ বুদ্ধিতে তা প্রগতিশীলতার ও জীবন জিজ্ঞাসায় যুক্তিবাদিতার সমর্থক ছিল। আর সাহিত্য ছিল সনাতনী শিক্ষিতের কাগজ, তাই তার বিরোধ ছিল ব্রাহ্ম-সমাজের এবং সমাজপতিদের সঙ্গে। বঙ্গদর্শন ও তারপর প্রচার পর্বে বঙ্কিমের সঙ্গে ভারতী গোষ্ঠীর, মানে দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মাধর্ম ও সত্যাসত্যের সীমানা নিয়ে বিরোধ হয়েছিল। আর সাহিত্যপর্বে সমাজপতির বিবাদ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্লীলতা অশ্লীলতার সীমানা নিয়ে।

কিন্তু নীতি ও মতবাদের বিরোধের কথা যাই হোক, এই পত্রিকাগুলির

মধ্যে দিয়েই বঙ্কিমোত্তর ও রবীন্দ্র সমসাময়িক বিশিষ্ট লেখক প্রায় সকলের আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতী যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথ তখন বালক। আর ভারতী যখন বিদায় নেয়, তখন তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। সুতরাং বলা যেতে পারে, এই পত্রিকাখানি রবীন্দ্রনাথের জীবন-ব্যাপী সাহিত্য সাধনার প্রধানতই ধারক। ভারতীর পর তার ভূমিকা নেয় প্রবাসী এবং সব শেষে নেয় সবুজপত্র।

সবুজপত্র থেকেই আমাদের নবা সংস্কৃতির যাত্রা সুরু, এ কথা গোড়ায় বলেছি। যদিও এই অগ্রযাত্রার নায়কতা নেন প্রমথ চৌধুরী, কিন্তু লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন তার প্রাণ-পুরুষ ও প্রেরণা দাতা। সবুজপত্রের সংস্কৃতিক সন্নিবেশে এসে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি ও জীবন দর্শনে হয়েছে একটি মৌলিক পরিবর্তন। বলতে পারি, জাতীয়তার গণ্ডী থেকে তাঁর মননশীলতা যেমন আন্তর্জাতিকতার উত্তীর্ণ হয়েছে, তেমনি তাঁর জীবনবোধে ও পুরস্কিগুলা ভাবের মানুষ থেকে অনেকটা বাস্তব মানুষের দিকে ঝোঁক দিয়েছে। আর একটা জিনিসও লক্ষণীয়। এখান থেকেই তিনি ধনি-গরীব সমস্যা পরিহার করে আশ্রয় নিয়েছেন কলকাতার শিষ্ট সমাজের কথা তাদেকে, তাঁর আত্মপ্রকাশের একমাত্র বাহন রূপে।

সবুজপত্রই প্রথম বাংলা পত্রিকা, যা বাংলা সাহিত্য থেকে শ্যাঙ সেঁতে ভাবালুতার অবসান ঘটিয়ে সেখানে বিচারসিদ্ধ বিশ্ব বৈদগ্ধ্যের পটভূমি সৃষ্টি তোলে। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প-সাহিত্য ও সমাজ চিন্তার আলোকের সংযুক্ত করে সমসাময়িক কালের সঙ্গে। এক কথায় বাংলা সাহিত্য এখান থেকেই হয় বিশ্ব সাহিত্যের সহযাত্রী, নিছক বাংলা ও বাঙালীত্বের সীমার মধ্যে আর তাকে ধরে রাখা সম্ভব হয় না।

কিন্তু বৃহৎ একটি নূতন মানসিকতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেও, সবুজপত্র নিজে বৃহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেনি। অর্থাৎ এমন কোন বড় সাহিত্যিকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় না সবুজপত্রে, যাঁদের প্রথম আবির্ভাব ঐ কাগজে। এর কারণ সবুজপত্রের সাংস্কৃতিক আভিজাত্য ছিল কতকটা প্রমথ চৌধুরীর পারিবারিক আভিজাত্যের প্রতিফলিত দ্যুতির মতো। তা বাড়ি ও মানুষের সঙ্গে সরাসরি পরিচয়ের সাহায্যক হয় নি। তা বইয়ের ভেতর দিয়ে দুনিয়াকে দেখেছে। সেখা দুনিয়া থেকে বইকে জন্ম দেয় নি।

বিপিনচন্দ্র পাল যে এই সময় রবীন্দ্রনাথ ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে যন্ত্রসভ্যতা বর্জিত জাতিক কাজ-কলা সৃষ্টির অভিযোগ এনেছিলেন এবং রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও বিনয়কুমার সরকার যে সমূহস্বার্থ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সমাজ কল্যাণের পঞ্চায়েতী-নায়ে বসে সত্য সমাজকে উপেক্ষা করা ও বিশ্ব সাহিত্যের কৃপা কটাক্ষিতে মুখ সমাজের বুদ্ধি বিভ্রান্তির ঘটানোর অপবাদ দিয়েছিলেন, হয়ত তাতে আতিশয্য কিছু ছিল। কিন্তু তিক্ততা অবশ্যই অযাচিত নয় এ সব অভিযোগের।

৩

এরপর এল কল্লোল, কালি-কলম প্রভৃতি পত্রিকা এবং এরা যে সাহিত্য পরিবেশন করেছে দেখা গেল, তার মধ্যে রূপ নেবার মূলতই একটি নূতন দৃগ্ভঙ্গি। সমাজের যারা সব নিম্ন সোপানের মানুষ, যারা বঞ্চিত ধিক্কৃত অস্বীকৃত, তাদের জীবন নিয়ে গল্প উপন্যাস লেখা হতে লাগলো। যে সমস্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা ও কাম ও কল্পনাকে মানুষ জীবনে স্বীকার করে, তিক্ত সাহিত্যে সিনেমা ছবাচরণীয় বলে মনে করেনি, তাদের তারা দেওয়া সুরু হল কবিতায়, কথাসাহিত্যে। প্রবাসীর শুচিতা ও সমূহস্বার্থের নৈদর্ঘ্যের বন্ধ্যা মাটিতে নব যৌবনের জোয়ার এল একটা।

সময়টা আমাদের মনে রাখতে হবে। ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। রক্তস্নান শেষ করে ভগ্ন ক্লেদাক্ত ইউরোপ তখন আবার ভয়ে ভয়ে চোখ মেলছে। রাষ্ট্র, সমাজ, নীতি ও জীবনচিন্তার কোথাও নেই কোন ধ্রুব মূল্যমান। সামনে প্রলম্বিত মস্ত একটা বিশ্বগ্রাসী নৈরাজ্যের মধ্যে দুলছে পশ্চিমী মানুষের মন। একদিকে সমাজ জীবনে প্রচণ্ড অনিশ্চয়, অন্যদিকে মার্কসবাদ, ফ্রয়েডবাদ ও আইনষ্টাইন বাদের ব্যাপক প্রচার আগিয়ে তুলেছে চিন্তা জীবনেও একটা অনিশ্চয়তার পটভূমি। ইতি থেকে নেতিতে, স্থির থেকে গতির দিকে ঝুঁকে পড়ছে মানুষ। এই ভাঙা-চোরার সংঘাতে ওঠা-পড়া করছে যারা তাদের রচিত সাহিত্য ও শিল্প আমাদের চেনা দুনিয়ার নাগাল না এড়িয়ে যাবে কেন?

[নূতন বাংলা সাহিত্য জেগে উঠল এই জোয়ারের ধাক্কায়। তাই উনিশ শতকের বুদ্ধি মুক্তি আন্দোলন ও মানবতাবাদী দর্শন বা বিশ্ব মৈত্রীবাদ এদেশে

এনেছিল যে যে সাহিত্যকৃতি, তা বিলকুল বাতিল হয়ে গেল এই সময় এবং তীব্র একটা বিদ্রোহ, একটা অসন্তোষ, সুখ ও জীবন সম্পর্কে একটা অসহিষ্ণুতা, জিজ্ঞাসা নিয়ে যাত্রা সুরু করল এই সাহিত্য। অনিবার্যভাবেই সনাতনী শিবিরের সঙ্গে বাধল তার বিবাদ। এই সনাতনী পক্ষের মুখপত্র হল শনিবারের চিঠি। জরী হিস্টিরানি ও বিচার বিমূঢ় বাঙালীপনার ধারা ফুলে ধরল শনিবারের চিঠি। তথাকথিত তরুণদের মাথা আস্তে বেরিয়ে দেখা পর্যন্ত মাথা দেখলেই তাতে বাড়ি মেরার হুকুম দাঁড়াল তার নেশা এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বাদ পড়লেন না তার গদাঘাত থেকে। এতখানি প্রতিক্রিয়ার মুখেও নূতন সাহিত্য আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারল, এটা কম কথা নয়।

অবশ্য প্রবাসী, সবুজপত্র এবং কল্লোল, কালিকলমের মাঝখানে আরো অনেক কাগজ হয়েছে এবং তার কোন-কোনটার গলাটিপে দেওয়া হয়েছে। যেমন শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনাবলী প্রকাশের গৌরব দাবী করতে পারে যমুনা। প্রবাসীর গোষ্ঠী-কৌলীন্যের বাইরে পড়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের একত্র করে ভারতবর্ষ একটা সাহিত্যিক সাধারণতন্ত্রের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। নারায়ণ, বঙ্গবাণী ও বিচিত্রার নামও অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। নারায়ণ কুখ্যাত হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে চিত্তরঞ্জনকে বড় কবি প্রমাণের চেষ্টা করে। নারায়ণের অন্যতম লেখক ছিলেন কল্লোলে হাত মক্সো করা সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। বাংলা ভাষায় নিম্ন বর্গের মানুষদের জীবন নিয়ে উপন্যাস লেখার সূত্রপাত করেন যাঁরা, তাঁদের প্রথম সারির একজন তিনি। প্রমথনাথ বলে যাঁরা মেতে পারে যে চিত্তরঞ্জনের তালিম এবং প্রাণপ্রতিষ্ঠা পায় দুটি আসলে এঁরই রচনা, যেমন তাঁর নামিত প্রবন্ধগুলি সবই লেখা গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর।

বিচিত্রা নবীন ও প্রবীনদের সেতুস্বরূপ হবে কথা ছিল। কার্যত কিন্তু প্রবীনরাই তার আসর দখল করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যধর্ম প্রবন্ধ বিচিত্রাতেই প্রকাশিত হয়, যাকে কেন্দ্র করে একদা দেশে সাহিত্যের লক্ষ্যবস্তু নিয়ে নবীনে প্রবীণে প্রচণ্ড বসীযুদ্ধ হয়েছিল। নবীন পক্ষে বিচিত্রার লেখনী ধরেছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং বঙ্গবাণীতে শরৎচন্দ্র। এসবের বাদানুবাদের জবাব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে প্রকাশিত 'সাহিত্যের সীমানা' নামক আর একটি প্রবন্ধে। সেখানেই যবনিকাপাত হয়।

বলতে ভুল হয়েছে, যে যমুনা ও বিচিত্রা যথাক্রমে সম্পাদিত হত ফনীন্দ্রনাথ পাল ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে। নামাঙ্কণ বহন করত সম্পাদক হিসাবে চিত্তরঞ্জন দাসের নাম, তবে সম্পাদন কর্ম করতেন অন্যেরা। কয়েকটি সাপ্তাহিক ছিল এই সময়। তার মধ্যে ধূমকেতু, বিজলী ও আত্মশক্তি প্রসিদ্ধ। প্রথমটি নজরুলের এবং পরবর্তী দুটি নবীন গোষ্ঠীর কাগজ ছিল। সব কটিই সাহিত্যপত্র হলেও ছিল খানিকটা রাজনীতি ঘেঁষা।

ঘোটের ওপর রবীন্দ্রযুগের শেষার্ধে যে নূতন সৃষ্টির আন্দোলন এসেছিল বাংলা সাহিত্যে, তার নায়কতার কল্লোলের নামই বিশেষভাবে উচ্চার্য। কারণ সত্যিকার নূতন একটা সাহিত্য চেতনা কল্লোলই এনেছিল এবং আজকের যাঁরা গণনীয় লেখক, অন্নদাশঙ্কর রায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া প্রায় সবাই তাঁরা কল্লোলের গোষ্ঠিভুক্ত। এই দুজন ছিলেন বিচিত্রায়। বিভূতি-ভূষণের পথের পাঁচালী প্রকাশিত হয় বিচিত্রাতেই।

অবশ্য বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা করতে হলে এ কথা বলতেই হবে যে কল্লোল থেকে নূতন সাহিত্য সৃষ্টির জোয়ার এলেও, তার পূর্বাভাস আগেই পাওয়া গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই স্বয়ং সম্পূর্ণ সাহিত্যিক ব্যক্তির রূপে যখন প্রথম চৌধুরী ও শরৎচন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তখনই কবিতায় মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুল ইসলাম এবং কথা সাহিত্যে সত্যেন্দ্র কুমার গুপ্ত, জলধর সেন ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত নূতন পথ খোঁজার প্রয়াসে কলম ধরেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, জীবনানন্দ দাশ ও বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে দেখি তারই পরবর্তী সোপান।

যাতখানেকার এই সোপানটার এখানকার সমালোচনায় প্রায় অনুল্লেখ দেখি, কেন ঠিক বলতে পারি না। আর একটা কথাও এই সূত্রে না বলে উপায় নেই যে যে-নূতন সাহিত্যাদর্শ নিয়ে কল্লোল প্রথম দেখা দিয়েছিল, তা বর্জন করেই তার লেখকরা পরে কৃতী হয়েছেন। আজ তাই দেখি তাঁদের কেউ মহাপুরুষ জীবনের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত আছেন। কেউ কংগ্রেসী

গঠন পরিকল্পনার পুনঃসোধকতা করছেন লেখনীর সাহায্যে। কেউ ভাগবতী রস উদ্ভূত স্মরণ কথা পরিবেষণ করছেন। সেই নূতন সমাজ গড়ার স্বপ্ন, জীবন ও জগতের বিচারে নূতন মূল্যমান প্রবর্তনের মত্ততা, সেই অকপট সত্যানুভূতিকে নিরাবৃত ভাষায় ব্যক্ত করার সাহস.....কোনটাই তাঁদের নেই। অর্থাৎ তাঁরা জয়ী হয়েছেন প্রতিক্রিয়ার পথে।

কেন এমন হল? বলা, তার কারণ কল্লোলের আন্দোলনটা এসেছিল দেশে বাইরের একটা ধাক্কা খেয়ে। দেশের জীবন ও সমাজের মাটিতে তার শিকড় প্রোথিত হয় নি, আমাদের অনুভূতির মধ্যে তা একান্তভাবে লাভ করে নি। মার্কসবাদ, ফ্রয়েডবাদ, অ্যাঁদ্রেবাদ, অস্তিত্ববাদ, অনেক নামের হিজাবে আলোড়িত হয়েছিলেন লেখকরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে এসবের তাৎপর্য গ্রহণ করতে পারেননি। সে রকম পরিণত বয়স এবং বুদ্ধিও তাঁদের ছিল না। তাই দম ফুরিয়ে গেল যখন, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন তাঁরা সনাতনী শিবিরে এসে।

কিন্তু তাঁরা নেমে গেলেও, নদীর থামে নি। তা পূর্ব বেগে এগিয়ে গেছে এবং এই চলার পথে আবার নূতন দিগন্তের বাতায়ন উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আমি বলছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অব্যবহিত আগের এবং সমকালের কথা। এই সময় প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক পরিচয়, পূর্বাশা, অগ্রগতি এবং কবিতা প্রভৃতি পত্রিকা, যা আবার একটা নূতন আন্দোলনের ভূমি তৈরি করে তোলে। এর মধ্যে পরিচয় ও কবিতার দান নিঃসংশয়ে সমধিক।

সুধীন্দ্র দত্ত সম্পাদিত পরিচয়, সবুজপত্রের পর নিঃসন্দেহে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বৃহৎ একটা দিকচিহ্ন স্বরূপ। তা নূতন করে আবার দেশে নিয়ে আসে বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন, যা অনেকটা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল কল্লোলী জল কল্লোলে। এর প্রবন্ধ ও পুস্তক সমালোচনার সঙ্গে যে প্রখর, বৈদগ্ধ্য এবং চিন্তার পরিচয় থাকত, কোন দিনের কোন বাংলা পত্রিকাই তা দাবী করতে পারে নি। হীরেন দত্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নীরেন রায়, সুশোভন সরকার, সত্যেন বসু, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, গোপাল হালদার, হিরণ সান্যাল, বিষ্ণু দে, বর্তমান লেখক এবং আরো কয়েকজন প্রাবন্ধিকরূপে সংযুক্ত ছিলেন এই পত্রের সঙ্গে : কবিতার সম্পাদও থাকত তাতে। তবে কথাসাহিত্যে অগ্রগণ্য

স্থান ছিল না। কবিতা পত্রিকা দেখে এনেছিল নূতন কবিতা সৃষ্টির আন্দোলন এবং আজকের জনপ্রিয় কবি অনেকেরই উদয় তার আসর থেকে। দীনেশ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সেখান থেকেই।

পূর্বাশা প্রথম প্রকাশ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধ ঘোষের রচনা। সম্পাদক সুধীর ভট্টাচার্য সহ এই দুজন নিয়ে পূর্বাশার সাহিত্যিক দান বিস্তর অল্প নয়। অগ্রগতি প্রকাশের পেছনে ছিলেন সুকোমল ঠাকুর, দিনেশ দাস, আশু চট্টোপাধ্যায়, বিমল মুখোপাধ্যায়। পরিচয়ের তুলনায় পূর্বাশা ও অগ্রগতির সাংগঠনিক সুর অবশ্যই তরল ছিল। কিন্তু একদিকে দলীয় রাজনীতির উদ্ধার দাপাদাপি, অন্যদিকে নৃত্যাঙ্কিত ও ছায়াচিত্রের চটুল খেলোয়ী যেদিন সাধারণ সাহিত্যকে প্রায় গিলে ফেলেছিল, সেদিন শুধু পরিচয়ের মতো দুয়ারোহে পত্রিকা নয়, দুটি পত্রিকাই সাধারণের মানসিক ভারসাম্য রাখার সহায়তা করেছে দেশে সব চেয়ে বেশী।

রাজনীতির দাপাদাপির কথা বলেছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে এটা প্রবল হয়ে ওঠে এবং সাহিত্যের দুনিয়া দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দুই বিভক্ত দলে ভাগ হয়ে যায়। বামপন্থীরা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সহ কল্লোলগোষ্ঠীর অনেককেই বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত করে দেখতে সুরু করেন এবং দক্ষিণপন্থীরা তাঁদের প্রতিপক্ষকে বিদেশী রাজনীতিক স্বার্থের এজেন্ট বলে প্রচার করতে থাকেন। এই বিষবাষ্প যত জোরে হয়েছে, সে অনুপাতে শক্তিশালী সাহিত্য সৃষ্টি হয় নি। তবে মধ্যবিত্ত, চতুষ্কোণ, নব পর্যায় পরিচয় প্রভৃতির মাধ্যমে বামপন্থীরা নূতন একটা সাহিত্যিক মনস্তত্ত্ব গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। দক্ষিণপন্থী সাহিত্যিকরা ইতিমধ্যে কোথা থেকে কোন জায়গায় এসেছেন এই অধ্যায়ের সুরুতেই সে কথা বলেছি।

স্বাধীনতার পরে এই বিরোধ নিরস্ত হয়েছে। তবে দক্ষিণপন্থীরা ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্রণযিত শক্তি এবং বামপন্থীরা খণ্ডিতোত্তাপ। কাজেই সাহিত্য আজ একটা স্তম্ভিত মধ্যবিত্তে নিশ্চল হয়ে রয়েছে। একদিকে প্রবন্ধ নাম দিয়ে ছাত্রপাঠ্য বিবরণ পত্রী সমূহ প্রকাশিত হচ্ছে, অন্যদিকে ভ্রমণ, ইতিবৃত্ত, জীবনী ও আত্মস্মৃতির জগাখিচুড়ী প্রচারিত হচ্ছে মধ্য রচনা নামে। এ দুইয়ের প্রথমোক্ত বিভাগের লেখকরা বেশীর ভাগই ভট্টর এবং দ্বিতীয়োক্ত বিভাগের প্রায় সকলেই ছদ্মনামী। সুনামে ধন্য জনপ্রিয় উপন্যাসাদি লেখেন, তাঁদের কথা আমি

বলব না। ওদের অধিকাংশই সাধারণ, গো, তরল-আলতার মতো প্রতিদিনের পদার্থ। তবে নূতন কবিতার যে পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে, তার মধ্যে নিশ্চয় কিছুটা সম্ভাবনীয়তার আশা রাখি আমি। আর রাখি সাম্প্রতিক প্রবন্ধ রচনায় ওপরেও। নিত্য নূতন পত্রিকার পৃষ্ঠায় এই দুটো দিকেই শুধু একটা চলন্ত মুসমানসের সাক্ষাৎ পাই আর সব দিকেই এসে গেছে অসাড় অত্যন্ততা।

আমার মতে চাই বলিষ্ঠ সাহিত্যচেতনার অর্থাৎ নূতন জীবনবোধের উদ্বোধন এবং সেজন্য চাই নূতন শক্তিশালী পত্র পত্রিকা। কিন্তু তা কোথায়? পুঁজিবাদী সমাজের ধনশক্তি আজ সংহত হয়েছে বণিকতন্ত্রের হাতে এবং তাঁরা সংবাদপত্রকেই করে তুলেছেন সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিস্তারের মাধ্যম, আর তার ফলে ভুল মিশ্রিত তরল ও ক্ষীণ সাংবাদিকতা আজ চলছে সাহিত্য নামে। অথচ তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এটে ওঠার শক্তি হারিয়েছে বিশুদ্ধ সাহিত্য। কেননা তা প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যম নেই। সংবাদপত্রের সাহিত্য বিভাগই আজ সাহিত্যের নিয়ন্ত্রক, তাই রবীন্দ্র পুরস্কার ও একাডেমী পুরস্কারেই তার পরমাগতি।

বাংলা সাময়িক সাহিত্যের রূপরেখা

বিগত অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে কলকাতায় ছাপাখানার কাজকর্ম সুরু হলেও উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই বাংলা সাময়িক-পত্র প্রচার ও প্রসার লাভ করে। ছাপাখানার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুগের ধারা অনুযায়ী এ কাজের একটি গতিপথ নির্দিষ্ট হয়।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম সাময়িকপত্র প্রকাশের পর প্রায় দেড়শত বছরে বাঙালীর জাতীয় জীবনে এর ব্যাপকতা এই ক্ষুদ্র পরিসর তালিকার মধ্যে পাওয়া যাবে। এই সংক্ষিপ্ত তালিকায় ১৮১৮ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকার নাম সংকলন করেছি।

দিগ্দর্শন। এপ্রিল ১৮১৮। বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক পত্র, শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন পরিচালিত। সম্পাদক: জে. সি. মার্শম্যান।

সমাচার দর্পণ। ২৩শে মে ১৮১৮। সম্পাদক: জে. সি. মার্শম্যান। বাংলা ভাষায় প্রথম সাপ্তাহিক পত্র, শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন পরিচালিত। এই পত্রে সংবাদ, সম্পাদকীয় প্রকৃতির সঙ্গে সাহিত্য-পত্র অর্থাৎ "ম্যাগাজিন" অংশও ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাথমিক রচনাও এতে প্রকাশ হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের গ্রন্থ-সংগ্রহ থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর যে সকল সংখ্যা সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলির সূত্র থেকে সঙ্কলন করে তিনি "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" নামে দুখণ্ডে (তৃতীয় সংস্করণ: ১৩৪৮) প্রকাশ করেন।

বাঙ্গাল গেজেটি। জুন ১৮১৮। বাঙ্গালী পরিচালিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্র। সম্পাদক: গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। এর কোন সংখ্যা অদ্যাবধি সংগৃহীত বা হস্তগতে, এ বিষয়ে কোন সঠিক আলোচনা সম্ভব হয় নি।

সমাচার ম্যাগাজীন। ডিসেম্বর ১৮১৯। খৃষ্টীয় মিশনারি পরিচালিত সাম্প্রদায়িক পত্র।

ব্রাহ্মণ সেবধি সেপ্টেম্বর ১৮২১। রামমোহন রায় পরিচালিত পত্র। প্রধানত ধর্মত প্রচারকল্পে কল্পিত।

সম্বাদ কৌমুদী। ৪ ডিসেম্বর ১৮২১। তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়।

পত্রাবলী। ফেব্রুয়ারী ১৮২২। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত রেভা: লঙন সঙ্কলিত মাসিক পত্র। উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের অভাবের জন্য 'পত্রাবলী' ও 'দিগ্দর্শন' পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্ধারিত হয় ও একাধিকবার পুনর্মুদ্রিত হয়।

সমাচার চন্দ্রিকা। ৫ মার্চ ১৮২২। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মুখপত্র হিসাবে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্র।

এর পর অল্পদিনের জন্য মধ্যে প্রচারিত হয়—সম্বাদ তিমিরনাশক (সাপ্তাহিক) অক্টোবর ১৮২৩; 'বঙ্গদূত' (সাপ্তাহিক) ১০ মে ১৮২৯ ও 'সর্বতত্ত্ব-দীপিকা ও ব্যবহার দর্পণ' (মাসিক) জুলাই ১৮২৯ ও এবং 'শাস্ত্রপ্রকাশ' জুন ১৮৩০।

সংবাদ প্রভাকর। প্রথমে সাপ্তাহিক রূপে ২৮ জানুয়ারি ১৮৩১ প্রকাশিত হয়। তাঁর মধ্যে দুবার পৌষক তার অভাবে পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ থাকে। ২৪ জুন ১৮৩৯ তারিখে সংবাদ প্রভাকর দৈনিকপত্ররূপে প্রকাশিত হয়ে বাংলা দেশে নূতন যুগের সৃষ্টি করে। সম্পাদক ছিলেন প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মৃত্যুকাল (২৩শে জানুয়ারী ১৮৫৯) পর্যন্ত কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। প্রকৃতপক্ষে প্রভাকরই বাঙালী জনসাধারণের "আশা ও ভাষা" রক্ষার কাজ করেছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল পর্যন্ত এর প্রভাব বজায় ছিল। প্রভাকর সম্বন্ধে তথ্যবহুল আলোচনা ইতিপূর্বে 'উত্তরসূরী'র ১৩৬৬ বর্ষে (কার্তিক-পৌষ সংখ্যায়) আলোচিত হয়েছে। এই পত্রিকার উপযোগিতা উপলব্ধি করে শ্রীবিনয় ঘোষ তাঁর 'বাংলা সাময়িকপত্রে সমাজ চিত্র', ১ম খণ্ড (১৩৬৯) গ্রন্থে 'সংবাদ প্রভাকরে'র পুরাতন সংখ্যা থেকে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি সংযোগে একটি সংকলন গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন।

জ্ঞানান্বেষণ। ১৮ জুন ১৮৩১। ইংরাজী শিক্ষিত উদার মতাবলম্বী বাঙালী যুবক ও ছাত্রসমাজের মাসিকপত্র। এর পূর্বে উল্লেখযোগ্য 'সম্বাদ সুধাকর' ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি ও সমাচার 'সত্যান্বেষণ' ৭ মার্চ তারিখে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকাদ্বয়।

'বিজ্ঞান সেবধি' (মাসিক) এপ্রিল ১৮৩২ ও 'বিজ্ঞান সংগ্রহ' (পাক্ষিক) ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়। সাপ্তাহিক পত্র। ১০ জুন ১৮৩৪। হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রথম সম্পাদক। তৎপরে আমড়াতলার আঢ্য পরিবারের পোষকতা ও সম্পাদনায় ১৯০৮ মার্চ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। বাঙালী সমাজে প্রভাকরের পরই এর স্থান ছিল। এর কিছু সংখ্যা থেকে সঙ্কলন 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'য় প্রকাশিত হয়েছে।

সৌদামিনীকর ভট্টাচার্যের 'সম্বাদ ভাস্কর' সাপ্তাহিক পত্র। মার্চ ১৮৩১ ও 'সম্বাদ হুতোম' ২৯ শে নভেম্বর ১৮৩১ এ সময়ের প্রধান পত্র।

হিতার্ণব জুন ১৮৪২। সম্পাদক: অক্ষয়কুমার দত্ত ও প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। মাসিক। আগস্ট ১৮৪৩ প্রথম বর্ষে ৮ সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। প্রায় ৯২ বৎসর এই পত্রিকা জীবিত ছিল।

বিদ্যাকল্পদ্রুম। ত্রৈমাসিক। ২৬ জানুয়ারি ১৮৪৬। সম্পাদক: কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রঙ্গপুর বার্তাবহ। সাপ্তাহিক আগস্ট ১৮৪৭

সংবাদ সাধুরঞ্জন। সাপ্তাহিক। আগস্ট ১৮৪৭ ও পরে পাক্ষিক ১০ জুন ১৮৪৮। সম্পাদক: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

সত্যপ্রদীপ। সাপ্তাহিক। ৪ মে ১৮৪০। সম্পাদক মেরিডথ টাউনসেণ্ড।

বিবিধার্থ সংগ্রহ। মাসিক। অক্টোবর ১৮৫১। সম্পাদক: রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

মাসিক পত্রিকা। ১৬ আগস্ট ১৮৫৪। সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদার।

এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ। ৪ জুলাই ১৮৫৬। সম্পাদক: ওয়াটসন স্মিথ।

অরুণোদয়। পাক্ষিক। আগস্ট ১৮৫৬। সম্পাদক: রেভাঃ লাল-বিহারী দে।

সোমপ্রকাশ। সাপ্তাহিক। ১৫ নভেম্বর ১৮৫৮। সম্পাদক: দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

ঢাকাপ্রকাশ। সাপ্তাহিক। ১ মার্চ ১৮৬১। সম্পাদক: কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা। মাসিক। এপ্রিল ১৮৬৩। সম্পাদক: হরিনাথ মজুমদার।

মাসিকা পত্রিকা। মাসিক। আগস্ট ১৮৬৩। সম্পাদক: উমেশচন্দ্র দত্ত।

রহস্য-সন্দর্ভ। মাসিক ১৮৬৩ ফেব্রুয়ারি। সম্পাদক: রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

ধর্মতত্ত্ব। মাসিক ১৮৬৪। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আদর্শে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র।

অবলাবান্ধব। পাক্ষিক। ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৬। সম্পাদক: দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

সুলভ সমাচার। সাপ্তাহিক। ১ অগ্রহায়ণ ১২৭৭।

বঙ্গদর্শন। মাসিক। বৈশাখ ১২৭৯। প্রথম চারি বৎসরের সম্পাদক: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (৫ম—৯ম) বর্ষ সম্পাদক: সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইহার পর ১২৯০ সালের কয়েক মাস পত্রিকা সম্পাদনা করেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। বঙ্গদর্শন নবপর্যায় রূপে প্রকাশিত হয় ১৩০৮ বঙ্গাব্দে। সম্পাদক: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইহার বহুদিন পরে যোহিতলাল মজুমদারের সম্পাদনায় ১৩৪৪ আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়।

অমৃত বাজার পত্রিকা। সাপ্তাহিক। সম্পাদক: শিশিরকুমার ঘোষ। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ প্রকাশিত হয়।

সাধারণী। সাপ্তাহিক। ১১ কার্তিক ১২৮০। সম্পাদক: অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

ভ্রমর। মাসিক। বৈশাখ ১২৮১। সম্পাদক: সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আর্যদর্শন। মাসিক। বৈশাখ ১২৮১। সম্পাদক: যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

বান্ধব। মাসিক। আষাঢ় ১২৮১। সম্পাদক: কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

ভারতী। মাসিক। শ্রাবণ ১২৮৪। সম্পাদক: দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আনন্দবাজার পত্রিকা। সাপ্তাহিক। বৈশাখ ১২৮৫।

বীণা। মাসিক। বৈশাখ ১২৮৫। সম্পাদক: রাজকৃষ্ণ রায়।

বালকবন্ধু। পাক্ষিক। ২০ বৈশাখ ১২৮৫।

তত্ত্ব-কৌমুদী। পাক্ষিক। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫। সম্পাদক: শিবনাথ শাস্ত্রী।

পঞ্চানন্দ। মাসিক। ভাদ্র ১২৮৫। সম্পাদক: ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গবাসী। সাপ্তাহিক। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৮৮। সম্পাদক: জ্ঞানেন্দ্রলাল মিত্র।

সখা। মাসিক। জানুয়ারী ১৮৮৩। সম্পাদক: প্রমদাচরণ সেন।

সঞ্জীবনী। সাপ্তাহিক। ৩ বৈশাখ ১২৯০। সম্পাদক: দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

সমাচারচন্দ্রিকা। মাসিক। বৈশাখ ১২৯০। সম্পাদক: দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।

নবজীবন। মাসিক। শ্রাবণ ১২৯১। সম্পাদক: অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

বালক। মাসিক। ১২৯২। সম্পাদক: জ্ঞানদানন্দিনী দেবী।

প্রচার। মাসিক। শ্রাবণ ১২৯৬। সম্পাদক: রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য। মাসিক। বৈশাখ ১২৯৭। সম্পাদক: সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

হিতবাদী। সাপ্তাহিক। ১১ বৈশাখ ১২৯৮। সম্পাদক: কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য।

সাধনা। মাসিক। অগ্রহায়ণ ১২৯৮। প্রথম তিন বৎসর সম্পাদক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চতুর্থ বৎসরে সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দাসী। মাসিক। আষাঢ় ১২৯৯। সম্পাদক: হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ত্রৈমাসিক। শ্রাবণ ১৩০১। সম্পাদক: রজনীকান্ত গুপ্ত।

মুকুল। মাসিক। আষাঢ় ১৩০১। সম্পাদক: বিশ্বনাথ শাস্ত্রী।

সৌরভ। মাসিক। শ্রাবণ ১৩০২। সম্পাদক: গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

বসুমতী। সাপ্তাহিক। ১৩ ভাদ্র ১৩০৩। সম্পাদক: যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দৈনিক সংস্করণ ২১ শ্রাবণ ১৩২১ সালে। বৈশাখ ১৩২৯ থেকে মাসিক বসুমতী প্রকাশিত হচ্ছে।

ঐতিহাসিক চিত্র। ত্রৈমাসিক। পৌষ ১৩০৪। সম্পাদক: অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

পন্থা। মাসিক। ১৩০৪। সম্পাদক: বসন্তকান্ত বসুমল্লিক ও শ্যামলাল গোস্বামী।

পুণ্য। মাসিক। আশ্বিন ১৩০৪। সম্পাদিকা: প্রজাসুন্দরী দেবী।

প্রদীপ। মাসিক। পৌষ ১৩০৪। সম্পাদক: হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়।

উদ্বোধন। পাক্ষিক। ১ মাঘ ১৩০৪। সম্পাদক: স্বামী ত্রিগুণাতীত। ১০ম বর্ষে ইহা মাসিকে পরিণত হয়ে আজও প্রকাশ অব্যাহত আছে।

বীরভূমি। মাসিক ১৩০৬। সম্পাদক: নীলরতন মুখোপাধ্যায়।

নবপর্যায় ১ম বর্ষ ১৩১৭-১৮ দ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪র্থ বর্ষ ১৩২১। সম্পাদক : কুলদাপ্রসাদ মল্লিক।

প্রভাত। সাপ্তাহিক। বৈশাখ ১৩০৭। সম্পাদক : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

প্রভাবতী। মাসিক। ১৩০১। সম্পাদক : কবীন্দ্রনাথ পাল।

প্রবীণ-প্রকাশিকা। মাসিক। ১৩০৮। সম্পাদক : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রবাসী। মাসিক। বৈশাখ ১৩০৮। সম্পাদক : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর আশ্বিন ১৩৪৯ হইতে সম্পাদক : শ্রীকেদার নাথ চট্টোপাধ্যায়।

অর্চ্চনা। মাসিক। ১৩১০ সাল। সম্পাদক : জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৩য় বর্ষ ১৩১৫-১৬ সাল। সম্পাদক : কেশবচন্দ্র গুপ্ত। ৪র্থ বর্ষ ১৩১৬-১৭ সাল। সম্পাদক : [illegible] ও কেশবচন্দ্র গুপ্ত। ১০ম বর্ষ ১৩১৯-২০ সাল। সম্পাদক : কেশবচন্দ্র গুপ্ত। ১৮ বর্ষ ১৩২৭-২৮ সাল। সম্পাদক : কেশবচন্দ্র গুপ্ত ও [illegible]। ৪১ বর্ষ ১৩৪১ সালে চিত্রিতা দেবী এই পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন।

অরুণোদয়। মাসিক। ১৩১১। সম্পাদক : নবকুমার বসু। ৭ম বর্ষে সম্পাদক (১৩১৭-১৮) ভূবনেশ্বরী বসু। ১১শ বর্ষে সম্পাদক : লালবিহারী বসু ও সরলচন্দ্র ঘোষ। ১২শ বর্ষ : সম্পাদক সরলচন্দ্র ঘোষ।

উপাসনা। মাসিক। ১৩১১ সাল। সম্পাদক : চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। ৯ম বর্ষ ১৩১৯-২০। সম্পাদক : যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২শ বর্ষ ১৩২৩-২৪। সম্পাদক : রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। ২০শ বর্ষ ১৩৩১-৩২ সাল। সম্পাদক : রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। ২১শ বর্ষ ১৩৩২-৩৩ সাল। সম্পাদক : সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

আত্মশক্তি। মাসিক পত্র। ১৩১২। সম্পাদক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাণী। মাসিক। ১৩১২। সম্পাদক : অমূল্যচরণ ঘোষ।

উদ্বোধন। পাক্ষিক। পরে মাসিক। ১৩০৬। সম্পাদক : স্বামী শিবানন্দ স্বামী।

উৎসব। মাসিক। বৈশাখ ১৩১৩। সম্পাদক : রামদয়াল মজুমদার।

প্রবাস। সাপ্তাহিক। ১৩১৩। সম্পাদক : ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

সুপ্রভাত। ভাদ্র। মাসিক। ১৩১৪। সম্পাদিকা: সুমুদিনী মিত্র।

মানসী। মাসিক। ১৩১৫। সম্পাদক: ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিবরতন মিত্র ও সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ২য় বর্ষ ১৩১৬-১৭। উপরোক্ত তিন জন বাদ শিবরতন মিত্র। নবাগত যতীন্দ্রমোহন বাগচী। ৬ষ্ঠ বর্ষ ১৩২০-২১। সম্পাদক: যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

অলৌকিক রহস্য। বৈশাখ ১৩১৬ সাল। সম্পাদক: ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

যমুনা। মাসিক। ১৩১৬। সম্পাদক: বীরেন্দ্রনাথ পাল। ৬ষ্ঠ বর্ষ কণীন্দ্র নাথ পাল ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গৃহস্থ। মাসিক। ১৩১৬। সম্পাদক: বিনয়কুমার সরকার।

আর্যাবর্ত্ত। মাসিক। ১৩১৭। সম্পাদক: হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

নাট্য মন্দির। মাসিক। ১৩১৭। সম্পাদক: অমৃতলাল বসু।

চারু প্রিন্টিং ও সম্মিলন। মাসিক। বৈশাখ ১৩১৮। সম্পাদক: বিধুভূষণ গোস্বামী ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

অর্ঘ্য। মাসিক। ১৩১৮। সম্পাদক: অমূল্যচরণ সেন। ৬ষ্ঠ বর্ষ ১৩২২ সাল। সম্পাদক: সুরেশচন্দ্র পালিত। ৭-১১ বর্ষ ১৩২৩-২৭। সম্পাদক: অমূল্যচরণ সেন ও সুরেশচন্দ্র পালিত।

প্রতিভা। ত্রৈমাসিক। ১৩১৮। সম্পাদক: বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ২য় বর্ষ ১৩১৯। সম্পাদক: অবিনাশচন্দ্র মজুমদার। ৭ম বর্ষ ১৩২৪। সম্পাদক: উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। ৯ম বর্ষ ১৩২৬। সম্পাদক: অতুলচন্দ্র সরকার। ১১ বর্ষ ১৩৩১। সম্পাদক: নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও নিশিকান্ত চক্রবর্তী।

প্রবাসিনী। ত্রৈমাসিক ১৩১৯। সম্পাদক: পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সৌরভ। মাসিক। ১৩১৯। সম্পাদক: কেদারনাথ মজুমদার।

গল্প লহরী। মাসিক। ১৩১৯। সম্পাদক জানেন্দ্রনাথ পাল। নব পর্যায়ে কণীন্দ্রনাথ পাল-এর সম্পাদনায় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষ। আষাঢ় ১৩২০। সম্পাদক: অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও জলধর সেন।

সন্দেশ। মাসিক। বৈশাখ ১৩২০। সম্পাদক: উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

১৩২৩ উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর [৪ঠা পৌষ ১৩২২] সুকুমার রায়চৌধুরী। তাঁহার রোগশয্যায় যুগ্মভাবে সুকুমার রায়চৌধুরী ও সুবিনয় রায়চৌধুরী। সুকুমার রায় চৌধুরীর মৃত্যুর [২৪ ভাদ্র ১৩৩০] পর সুবিনয় রায়চৌধুরী। দীর্ঘকাল বন্ধ থাকবার পর আবার প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমান সম্পাদক : সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা। মাসিক। শ্রাবণ ১৩১০। সম্পাদিকা : প্রতিভা দেবী ও ইন্দিরা দেবী।

প্রবাহিনী। সাপ্তাহিক। ১৩২০। সম্পাদক : অমরেন্দ্রনাথ রায় ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সবুজপত্র। মাসিক। ১৩২১। সম্পাদক : প্রমথ চৌধুরী।

সন্ধ্যা। মাসিক। ১৩২১। সম্পাদক : চারুচন্দ্র মিত্র ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

বালক। মাসিক। ১৩২১। সম্পাদক : কালীপ্রসন্ন [illegible]।

নারায়ণ। মাসিক। ১৩২১। সম্পাদক : চিত্তরঞ্জন দাশ।

প্রবর্তক। পাক্ষিক। ১৩২২। সম্পাদক : যতীন্দ্রনাথ বসু। ৭ম বর্ষ ১৩২৮-২৯। মাসিক। সম্পাদক : মতিলাল রায়।

মর্মবাণী। সাপ্তাহিক। ১৩২২। সম্পাদক : জগদিন্দ্রনাথ রায় ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

মানসী ও মর্মবাণী। মাসিক। ফাল্গুন ১৩২২। সম্পাদক : জগদিন্দ্রনাথ রায় ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

যৌচাক। মাসিক। ১৩২৭ বৈশাখ। সম্পাদক : সুধীরচন্দ্র সরকার।

প্রভাতী। দ্বিমাসিক, পরে মাসিক। ১৩২৭। সম্পাদক : নলিনীমোহন রায়চৌধুরী। পরবর্তীকালে মনীন্দ্রচন্দ্র সমদ্দার।

বিজলী। সাপ্তাহিক। ১৩২৭। সম্পাদক : নলিনীকান্ত সরকার। ৩য় বর্ষ ১৩২৯-৩০। সম্পাদক : শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ৬ষ্ঠ বর্ষ ১৩৩২-৩৩। সম্পাদক : অরুণচন্দ্র সিংহ ও দীনেশরঞ্জন দাশ। ৭ম বর্ষ ১৩৩৮-৩৯। সম্পাদক : ধীরেন্দ্রকুমার ঘোষ।

প্রবাসজ্যোতিঃ। সাপ্তাহিক। ১৩২৮ সাল বাংলা। সম্পাদক : মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলার কথা। সাপ্তাহিক। ১৩২৮–২৯। সম্পাদক: চিত্তরঞ্জন দাস ও বাসন্তী দেবী।

বঙ্গবাণী। মাসিক। ১৩২৮। সম্পাদক: দীনেশচন্দ্র সেন ও বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আত্মশক্তি। সাপ্তাহিক। ১৩২৮-২৯ সাল। সম্পাদক: উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিক্ষাসাথী। মাসিক। বৈশাখ ১৩২৯। সম্পাদক: বৃন্দাবনচন্দ্র ধর।

ধূমকেতু। পাক্ষিক। ১৩২৯। সম্পাদক: নজরুল ইসলাম।

নিশির। সাপ্তাহিক। ১৩২৯। সম্পাদক: নিশিরকুমার মিত্র।

অকলিস। সাপ্তাহিক। ১৩২৯। সম্পাদক: জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার ও মন্মথমোহন বসু।

সংহতি। মাসিক। ১৩৩০। সম্পাদক: জ্ঞানাঞ্জন পাল ও মুরলীধর বসু। বর্তমানে স্বরেন নিয়োগী।

খোকাখুকু। মাসিক। ১৩৩০। সম্পাদক: কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ও সত্যচরণ চক্রবর্তী। ২য় বর্ষ ১৩৩১। সম্পাদক: নিশিকান্ত সেন।

কল্লোল। মাসিক। ১৩৩০ সম্পাদক: দীনেশরঞ্জন দাশ।

সোনার বাংলা। সাপ্তাহিক। ১৩৩০। সম্পাদক: কাশিমসুন্দর চক্রবর্তী। নবপর্যায়: ১৩৩২-৩৩। সম্পাদক: গোপাল চট্টোপাধ্যায় ও বিপিন পাল।

সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা। মাসিক। ১৩৩১। সম্পাদক: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শনিবারের চিঠি। সাপ্তাহিক। ১৩ শ্রাবণ ১৩৩১। প্রথমে সম্পাদক: ছিলেন যোগানন্দ দাস। ভাদ্র ১৩৩৪ হইতে মাসিক, ফাল্গুন ১৩৩৪ হইতে সম্পাদক: সজনীকান্ত দাস (মৃত্যু ১৩৬৮ মাঘ পর্যন্ত)।

নাচঘর। সাপ্তাহিক। ১৩৩১-৩২। সম্পাদক: প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও হেমেন্দ্রকুমার রায়। ২য় বর্ষ ১৩৩২-৩৩। সম্পাদক: নলিনীমোহন রায় চৌধুরী ও হেমেন্দ্রকুমার রায়। ৮ম বর্ষ ১৩৩৯-৪০। সম্পাদক: হেমেন্দ্রকুমার রায়।

নবযুগ। সাপ্তাহিক। ১৩৩১-৩২ সাল। সম্পাদক: জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রকৃতি। ত্রৈমাসিক। ১৩০১। সম্পাদক : সত্যচরণ লাহা।

উষা। মাসিক। ১৩০২ সাল। সম্পাদক : অতুলপ্রসাদ সেন ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে মহেন্দ্র চক্রবর্তী।

বঙ্গলক্ষ্মী। মাসিক ১৩০২-০৩। সম্পাদিকা : মুকুন্দদিনী বসু। ৩য় বর্ষ ১৩০৩ সম্পাদিকা : হেমলতা দেবী।

কালিকলম। মাসিক। বৈশাখ ১৩০৩। সম্পাদক : প্রেমেন্দ্র মিত্র, মুরলীধর বসু ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ২য় বর্ষ ১৩০৪। সম্পাদক : মুরলীধর বসু ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

পূর্ণিমা : মাসিক। শ্রাবণ ১৩০৩। সম্পাদক : নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশ্ববাণী। মাসিক। ১৩০৪। সম্পাদক : অভেদানন্দ স্বামী। বর্তমানে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।

বাদুঘর। মাসিক। শ্রাবণ ১৩০৪। সম্পাদক : গিরিজাকুমার বসু ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

বিচিত্রা। মাসিক। শ্রাবণ ১৩০৪। সম্পাদক : উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

পুষ্পপাত্র। মাসিক। ১৩০৪। সম্পাদক : ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গল্পগুচ্ছ। মাসিক। ১৩০৭। সম্পাদক : অশ্বিনী চট্টোপাধ্যায়।

প্রগতি। মাসিক। ১৩০৪-৩৫। সম্পাদক : অজিতকুমার দত্ত ও সুকুমার বসু।

মাসপয়লা। মাসিক। বৈশাখ ১৩০৫। সম্পাদক : দ্বিজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য ও অখিল নিয়োগী।

শতদল। মাসিক। ১৩০৫। সম্পাদক : অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

নবশক্তি। সাপ্তাহিক। ১৩০৬ সাল। সম্পাদক : সরোজকুমার রায়চৌধুরী।

দীপালি। সাপ্তাহিক। ১৩০৬ বাং। সম্পাদক : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও আশুতোষ সান্যাল।

গল্পলহরী। মাসিক। ১৩০৬। সম্পাদক : ললিতকুমার ঘোষ।

পরিচয়। ত্রৈমাসিক। ১৩০৮। সম্পাদক : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। পরে মাসিকপত্রে রূপান্তরিত। বর্তমানে গোপাল হালদার ও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

রমণী। মাসিক। বৈশাখ ১৩০৮। সম্পাদিকা : লীলাবতী নাগ।

দীপক। সাপ্তাহিক। আশ্বিন ১৩৩৯। সম্পাদক: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রকুমার গুপ্ত।

বঙ্গশ্রী। মাসিক। ফাল্গুন ১৩৩৯। সম্পাদক: সজনীকান্ত দাস। পরবর্তী-কালে সম্পাদনা করেছেন ঘনজিৎ সেন।

দেশ। সাপ্তাহিক। ১৩৪০। সম্পাদক: সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, পরে বঙ্কিমচন্দ্র সেন। বর্তমানে অশোক কুমার সরকার।

উদয়ন। মাসিক। ১৩৪০।

শ্রীদুর্গা। ১৩৪০। ছাত্রদের মাসিক পত্র। বিজয় চট্টোপাধ্যায় ও বিজন মিত্র সম্পাদিত।

যৌবনবেদ। মাসিক। ১৩৪০। সম্পাদক: দেবীকুমার গোস্বামী।

শতাব্দী। মাসিক। ১৩৪১। সম্পাদক: বিমল মুখোপাধ্যায়।

ভবিষ্যৎ। মাসিক। ১৩৪১। সম্পাদক: শুকো ঠাকুর।

কবিতা। ত্রৈমাসিক। আশ্বিন ১৩৪২। সম্পাদক: সমর সেন ও বুদ্ধদেব বসু। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসু।

মণিদীপ। মাসিক। বৈশাখ ১৩৪৫। সম্পাদিকা: কমলা চট্টোপাধ্যায়।

পূর্বাশা। মাসিক। ১৩৪৫। সম্পাদক: সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

মাতৃভূমি। মাসিক। মাঘ ১৩৪৫। সম্পাদক: হেমেন্দ্রনাথ দত্ত।

চতুরঙ্গ। ত্রৈমাসিক। ১৩৪৮। সম্পাদক: হুমায়ুন কবির ও বুদ্ধদেব বসু। বর্তমানে হুমায়ুন কবির কর্তৃক সম্পাদিত।

পত্রিকা। মাসিক। ১৩৩৬। সম্পাদক: জ্যোতির্ময় হালদার ও বিরাজ মুখোপাধ্যায়।

রূপমঞ্চ। মাসিক। ১৩৪৬। সম্পাদক: কালীশ মুখোপাধ্যায়।

নিরুক্ত। ত্রৈমাসিক। ১৩৪৬। কবিতাপত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত।

অরণি। ১৩৪১। সাপ্তাহিক। সম্পাদক: সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

একক। ত্রৈমাসিক। ১৩৪৮। সম্পাদক: শুভময় বসু।

বিশ্বভারতী পত্রিকা। শ্রাবণ ১৩৪৯ মাসিক। সম্পাদক: প্রমথ চৌধুরী। পরবর্তীকালে পুলিনবিহারী সেন। বর্তমানে সুধীরঞ্জন দাস।

মেয়েদের কথা। মাসিক। ১৩৪৯। সম্পাদিকা: কল্যাণী সেন।

গল্পভারতী। মাসিক ১৩৫২। সম্পাদক: নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

পরবর্তীকালে সম্পাদনা করেছেন উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। বর্তমানে সম্পাদক : কালিদাস নাগ।

ভজনের বস্তু। মাঘ ১৩৫৪। প্রথমে সাপ্তাহিক রূপে, পরে মাসিকে রূপান্তরিত। সম্পাদিকা : মালবিকা বসু।

পাঠশালা। মাসিক। সম্পাদক : নরেন্দ্র দেব।

শুকতারা। মাসিক। ১৩৫৪। সম্পাদক : মধুসূদন মজুমদার।

স্বাস্থ্যসাথী। মাসিক। সম্পাদক : মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

অগ্রণী। মাসিক। ১৩৫৪। সম্পাদক : প্রফুল্ল রায় ও বর্ণকমল ভট্টাচার্য।

অগ্রগতি। সাপ্তাহিক। প্রথম সম্পাদক : শুভো ঠাকুর। পরবর্তীকালে আশু চট্টোপাধ্যায় ও বিনয় মুখোপাধ্যায়।

স্বপ্ন। মাসিক। ১৩৫৪। সম্পাদক : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ও সুরেশ গুহ।

ক্রান্তি। মাসিক ১৩৫৪। সম্পাদক : নীহাররঞ্জন রায় ও ত্রিদিব চৌধুরী।

বর্তমান। মাসিক। ১৩৫৪। সম্পাদক : সরোজ রায়চৌধুরী।

সাহিত্যপত্র। ত্রৈমাসিক। ১৩৫৪। সম্পাদক : চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, নবযুগ আচার্য, পরে অনিল বর্মন ও শান্তি বসু। বর্তমান সম্পাদক : অসীম রায়।

পরাগ। প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে মাসিক ১৩৫৪। সম্পাদক : মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

মহিলা। মাসিক। ১৩৫৪। সম্পাদিকা : আশা দেবী।

মহিলামহল। মাসিক। ১৩৫৪। সম্পাদিকা : অঞ্জলি বসু।

উত্তরসূরী। প্রথম প্রকাশ ১৩৫৪ প্রবন্ধ সংকলন হিসেবে। সাহিত্যিক চট্টোপাধ্যায়, সমরেন রায়, অমুর মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী সেন ও অরুণকুমার সরকারের পরিচালনায়। কয়েক বৎসর বন্ধ থাকার পর শিবনারায়ণ রায় ও নারায়ণ চৌধুরীর যুগ্ম সম্পাদনায় ত্রৈমাসিক পত্রে রূপান্তরিত হয়ে এক বছর প্রকাশিত হয়। ১৩৬১ সন থেকে ত্রৈমাসিকরূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

অভ্যুদয়। মাসিক। ১৩৫৪। সম্পাদক : অশোক গুহ ও গিরীন চক্রবর্তী।

ইদানীং। মাসিক। ১৩৫৪। সম্পাদক : যশোদা চৌধুরী।

পাহারা। মাসিক। বৈশাখ ১৩৫৪। সম্পাদক : প্রেমেন্দ্র মিত্র ও গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু (সমালোচনার কাগজ)

চতুষ্কোণ। ১৩৫৬। সম্পাদক : শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী ও সুনীল পাল রায়।

নতুন সাহিত্য। মাসিক। ১৯৪৯। সম্পাদক : অনিলকুমার সিংহ।

কথাসাহিত্য। মাসিক। ১৯৫০। সম্পাদক : [illegible]নাথ ঘোষ ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য।

সনৎকুমার গুপ্ত ও মানস রায়চৌধুরী
কর্তৃক সংকলিত

[এই তালিকা প্রণয়নে জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীতারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায় সাহায্য করেছেন। বলাই বাহুল্য, উপরোক্ত তালিকা সম্পূর্ণ নয়। এবং কিছুটা নির্বাচিত। তাতেও নানারকম ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নয়। সহৃদয় পাঠকবর্গ এবিষয়ে আমাদের সহযোগিতা করলে ক্রমশঃ আমরা এই তালিকা ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ ও নির্ভুল করতে পারি। সঃ উত্তরসূরী।]

আলোচনা

কয়েকটি ইংরেজী সাময়িকপত্র

রবীন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিকতা : ইউনেস্কোর প্রচার্য

আধুনিকতার সন্ধানে দুটি নির্দেশক শব্দ আছে : গতি ও সংহতি। পৃথিবীর সকল দেশের মানুষকে, তার সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে একটি মিলনসূত্রে বাঁধবার আদর্শ নিয়ে ইউনেস্কো একদা গুরুত্ব কাজে ব্রতী হয়েছিল। আধুনিক-কালে ইউনেস্কো সেই আদর্শের দিকে পৌঁছতে গিয়ে সময়ের দুটি নির্দেশক সংজ্ঞাকে মেনে নিয়েছে অমোঘভাবে। দূরকে নিকট করতে হবে, অনাত্মীয়কে আপন করে নেবে, একদিকে গতি অপরদিকে সংহতি, এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানবজাতিকে এক আনন্দ ও স্বাধীনতার স্বাদ এনে দেবে, ইউনেস্কো-প্রকাশিত কুরিয়ার্ পত্রিকাটির মধ্য দিয়ে সতত এই আদর্শ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পত্রিকাটির বিজ্ঞাপিত নামপত্র প্রতীক-আশ্রয়ী।[১] বিবিধ বিশ্বের দিকে যেন একটি জানালা উন্মুক্ত। সেখানে প্রবেশদ্বারে কোন রক্ষী নেই। যতদূর দেখা যায় স্বচ্ছ আকাশ নদী নালা প্রান্তর অরণ্যানী মানবসমাজ এক সূত্রে সমপ্রাণ।

রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কুরিয়ার্ এর আলোচ্য সংখ্যাটি যদিচ তাঁর বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখে তথ্যসমৃদ্ধ, তথাপি বিশ্বের বিচিত্র মানবসমাজে ও সভ্যতার প্রেক্ষিতে তাঁর মানবতাবোধ ও সত্য অভিজ্ঞতার মূল্যায়নই এই পত্রে সবচেয়ে আলোচিত। ইউনেস্কো যে নীতি ও আদর্শ গ্রহণ করেছে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি সমাজনীতি শিক্ষা বা দার্শনিক অভিমতের একটি আশ্চর্য নিগূঢ় যোগসূত্র ছিল। আন্তর্জাতিক মানবতাবোধ বলতে হয়ত সোনাকী সোনাদেহ,

---

১. The Unesco Courier : A window open on the world : December 1961. Editor-in-Chief. Sandy Koffler, Place de Fontenoy. Paris 7e.

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথ অজস্র রচনাবলীর মধ্য দিয়ে সেই মহৎ ঐতিহ্যের সন্ধান করেছেন—ইউনেস্কোর আদর্শ যে ভিত্তিতে আজো সমুন্নত।

এবং প্রায় সেই বক্তব্যই প্রতিধ্বনিত দেখতে পাচ্ছি ইউনেস্কোর ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীযুক্ত মাহিউ মেহোনিকের মন্তব্যে: India today does not celebrate merely the thinker and writer. Above all, India reverses Tagore's generous, universal soul, open to the problems not only of his own land but of the world. He had faith in the faithfulness of cultural intercourse and friendship" এবং পরে শ্রীযুক্ত মেহোনিক উক্তি করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ই যেহেতু ইউনেস্কোর আদর্শ সেহেতু তিনিই ইউনেস্কোর গুরুস্থানীয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই শ্রদ্ধার প্রকাশকে ভারতবর্ষ, বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্যে গৌরবের বিষয়।

শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবির তাঁর প্রবন্ধে এই আন্তর্জাতিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শিকড় যদিও ছিল ভারতীয় ঐতিহ্যে, তবুও তিনিই যখন আমাদের ছোট গণ্ডীর, দেশ থেকে বিদেশ, খাঁচা থেকে আন্তর্জাতিকতায় পৌঁছলেন, নিজেকে তিনি ক্রমশ উন্মুক্ত উদার মানবতাবোধে আবৃত করতে চাইলেন এবং শ্রীযুক্ত কবীর বলছেন, এখানেই তাঁর বিদ্রোহীর ভূমিকা সার্থক। পুরাতনকে অবশ্য বর্জন করেননি তিনি। ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে ক্রমশঃ পরিশীলিত করেছেন, কেননা তিনি জানতেন: Revolution are successful only when values of the past are rediscovered and reshaped to meet the needs of changing times এবং নন্দনতত্ত্বে তাঁর অবিচল বিশ্বাস ছিল বলেই বুঝতে পেরেছিলেন জীবন ও জগৎকে এক গভীর ঐক্যসূত্রে বাঁধতে গেলে প্রকৃতির কাছে মানুষকে যেতে হবে, পাঠ গ্রহণ করতে হবে অনপেক্ষে। মানবজীবনে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব রয়েছে সত্য, কিন্তু তার চেয়েও সত্য, বৈপরীত্যের মধ্যে এক অখণ্ড পূর্ণতা ও ঐক্য।

সত্যজিৎ রায় একদা রবীন্দ্রনাথের যে তথ্যচিত্রটি তুলেছিলেন তার commentary সম্পূর্ণ প্রকাশ করেছেন পত্রিকা-সম্পাদক। আমার একাধিকবার উক্ত ছবিটি দেখবার সুযোগ হয়েছে এবং প্রতিবারই উক্ত commentary আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে ঐতিহ্যে লালিত হয়েছিলেন তার

মূলে ছিল বাংলাদেশের উনবিংশ শতকের সমস্ত ঔদার্য মহত্ত্ব ও আদর্শ একত্র এক সমন্বয়ে গ্রথিত হয়েছিল শ্রীযুক্ত রায় সেই পরম সত্যটি আমাদের সামনে নতুন করে তুলে ধরেছেন। ফিলিপ স্টার্ন ও আর্নল্ড বাকের রচনায় রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক প্রতিভার আলোচনা রয়েছে। তাদের বিশ্লেষণের সূত্র হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতরচনায় তিনটি প্রবল প্রভাবের কার্যকারিতা, (১) য়ুরোপীয় সঙ্গীত (২) হিন্দুস্থানী রাগ সঙ্গীত, (৩) বাংলার ধর্ম-সঙ্গীত। এ মন্তব্যে হয়ত আমি একমত, কিন্তু Classical Hindu Music এর বর্ণনায় তাঁরা যে বলেছেন an extremely sophisticated one, bound by strict rules—সে কথা আমি মানতে রাজী নই। প্রথমত ক্লাসিক্যাল মিউজিক মাত্রই Hindu music নয়, দ্বিতীয়ত Sophistication কোনো কোনো শিল্পের নির্ণায়ক হতে পারে না। তা যদি হোত, তাহলে বলতে হয় পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যই sophisticated। তৃতীয়ত, যে কোন classical শিল্পই যে bound by strict rules হতে পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সে একটি জড়তায় বাধা করে রাখছে। সময়ে রাগ যে বিভিন্ন রকমে বিকশিত হয়েছে, সাধন যা কীর্তনাঙ্গের যে প্রকার ভেদ ঘটেছে তাই কি প্রমাণ করে না যে বিশিষ্ট সঙ্গীত-প্রতিভা যুগে যুগে বাধন ভেঙেছেন, নতুন নতুন সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হয়েছেন। তবে লেখকদের সঙ্গে আমি এই মন্তব্যে দ্বিমত নই যে রবীন্দ্রনাথ পরিশেষে সকল প্রভাব কাটিয়ে উঠে সৃষ্টি করেছিলেন একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সঙ্গীত-ঐতিহ্য।

প্রকাশিত অজস্র ছবি রবীন্দ্রজীবনীর নানা তথ্য উদ্ঘাটন করেছে। রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রের পুনর্মুদ্রণ পত্রিকাটিকে আকর্ষণীয় করেছে। সুরুচি ও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদিত এই প্রত্নার্ঘ শুধু রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই নয়, মহত্তর মানবজাগরণে উদ্দীপ্ত সকল দেশের মানুষকেই শুভবোধে জাগ্রত করবে।

ইংরেজী সাহিত্য ও ভারতীয় মন

একদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের অব্যবহিত পরে ও তখন শিক্ষিত কিছু বাঙালীদের প্রবল উৎসাহে একদা ইংরেজীনবিশ একটি বিরাট শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। সব সময় যে এর সুফল ফলেছে তা নয়, কেননা উৎসাহের প্রাচুর্যে তারা স্বদেশীয়ানা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলেন, মাতৃভাষাকে ঘৃণা ও অবহেলার

চক্ষে দেখতেন। সান্ত্বনার বিষয়, মাইকেলের মত বিরাট প্রতিভাধরও একদা পুরোদস্তুর বিদেশী কেতায় চলাফেরা করে অবশেষে বুঝতে পেরেছিলেন, মাতৃভাষাই ভাবপ্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন। তরু দত্ত বা সরোজিনী নাইডুর মত কয়াসী ইংরেজীতে কবিতা লিখতে পারা হয়ত খুবই গৌরবের, কিন্তু সেটা একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র।

কিন্তু মুকুল যেটা দলেছে তার সুফল প্রকাশ অন্যদিকে প্রবাহিত হয়েছে, অর্থাৎ চিন্তার ক্ষেত্রে, জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে ইংরেজী চর্চা আমাদের একশো বছরের মধ্যেই একটা আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। বিশেষ করে ভারতের দূর দূরান্ত প্রদেশের ইংরেজী কাব্য সাহিত্যের চর্চার মধ্য দিয়ে যেমন একটা ঐক্যসূত্র গড়ে উঠেছে তেমনি অন্যদিকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাগুলিও যথেষ্ট লাভবান হয়েছে ইংরেজী ভাষার সাহিত্য চর্চা ও চিন্তার মধ্য দিয়ে।

দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে সেই উৎসাহ অনেকটা নিভে এসেছে। তার একাধিক রাজনৈতিক কারণ বর্তমান থাকলেও একটা অন্তত আমি বিশ্বাস করি, ইংরেজীই একমাত্র আন্তর্জাতিক ভাষা যার সাহায্যে সকল দেশের শিল্প সাহিত্য চর্চার শেষতম সংবাদ আমাদের গোচর হতে পারে। সেকারণে আমাদের সামনে ইংরেজী চর্চার একান্ত প্রয়োজন এখনো। বিশেষত যারা সৃজনশীল সাহিত্য রচনার উৎসাহী এবং সমালোচনা দ্বারা নিজের চিন্তাভাবনাকে ক্রমশ বিশুদ্ধ ও আবেগবর্জিত পথে নিয়ে যেতে চান তাদের পক্ষে ইংরেজী চর্চার একান্ত প্রয়োজনীয়তাকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

এরকম সময়েই, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অধমেন্দু বসুর সম্পাদনায় একটি পরিচ্ছন্ন ভাবসম্ভীর ইংরেজী পত্রিকার ছুটি, বার্ষিক সংকলন হাতে পেয়ে অত্যন্ত ভালো লাগলো। আশান্বিত হলাম প্রচুর। উগ্র স্বাদেশিকতায় আমরা যেন না ভুলি জগতের কাছে আমাদের আধুনিক মানসিকতার পরিচয় বহন করে নিয়ে যেতে ইংরেজী চর্চা। যেন আমরা না ভুলি এখনো ইংরেজীই আমাদের কাছে একমাত্র উন্নত প্রগতিশীল ভাষা যার মাধ্যমে সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে ভাবজগতে আদানপ্রদান করতে আমরা সক্ষম। পত্রিকাটির নাম : The Indian Journal of English Studies ; মূলত অধ্যাপকগোষ্ঠী-নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা হলেও সাহিত্যচেতনার পত্রিকাটি একটি সুস্থ

সুখ অবহাওয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে ; কারণ লেখকমণ্ডলী সকলেই তত্ত্বালোচনায় বিদগ্ধ পণ্ডিত নন, সৃজনশীল সাহিত্যরচনায় যথেষ্ট প্রত্যাশীল। অনায়াসে তাই বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সাহিত্যবোধের সুষ্ঠু সমন্বীকরণ সম্ভব হয়েছে।

১৯৬০ সালের সংকলনটিতে যেমন পরবর্তী সংকলনেও[২] তেমনি কবিদের ওপর আলোচনার প্রাধান্য দেখা যায়। শেলীর পর দুটি আলোচনা, কোলরিজের পর দুটি, ওয়ার্ডস্বার্থ ও ইয়েটস্-এর পর একটি করে। আধুনিককালে এলিয়ট ও অডেন প্রসঙ্গেও আলোচনা রয়েছে, দুজনই কবি হপ্‌কিন্সের শব্দ প্রয়োগ ও গঠনবৈচিত্র্যের পরও একটি।

প্রথম প্রবন্ধে অধ্যাপক ভাল্লা শেলীর দুটি পরস্পরবিরোধী সত্তার কথা বিস্তৃত আলোচনা করে অবশেষে মন্তব্য করেছেন যে ন্যাচারালিষ্ট এবং রেপ্‌টিক শেলী ও প্লেটোনিষ্ট এবং মিস্টিক শেলী মূলত একই ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকশিত রূপ। কিন্তু আবার বলছেন দুটি বিরোধী সত্তার নিরন্তর দ্বন্দ্বই তাঁর চরিত্রের অনন্যতা। অন্যের কথা যদি অধ্যাপক ভাল্লা অনুমান করে থাকেন তবে তো তিনি অবচেতনে অবশ্যই দুটি শেলীর অস্তিত্ব মেনেই নিয়েছেন! শেলী সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে কোন নূতন দিক আলোচিত না হলেও তাঁর কবিতার প্রতীকের উপস্থাপনায় ও অবশ্য পরিবর্তনশীল মনের সঙ্গে চিত্রকল্পনার পরিবর্তনের ইঙ্গিতটি সার্থকল্পনা। কোলরিজের কবিতার তাঁর প্রবন্ধটিতে প্রথমদিকে লেখক যদিও বাহুলি বর্ণনায় আশ্রয় নিয়েছেন তথাপি শেষের দিকে তিনি উপলব্ধি করেছেন : The glimmering moonshine is that of the primitive consciousness. বস্তুত কোলরিজের কবিতায় প্রকৃতি শেলী বা ওয়ার্ডস্বার্থের মত উজ্জ্বল অথবা শান্ত কোনটাই নয়—অতিপ্রাকৃত, uncanny mysterious loneliness-এর প্রতীক। অপর প্রবন্ধে Coleridge's Knowledge of the Orientকে কেন্দ্র করেই লেখক তাঁর কবিতায় হিন্দু পুরাণ দর্শনের ইত্যাদির রেশ খোঁজবার চেষ্টা করেছেন। ইয়েটস্ প্রসঙ্গে মিস্ স্টক তাঁর আত্মচরিত থেকে যে উদ্ধৃতির অংশ তুলে ধরেছেন ইয়েটস্-এর কাব্যে যথার্থ তাই বোধহয় সবচেয়ে কার্যকরী প্রত্যয়। লেখিকা এই স্থির মন্তব্য করে আমাদের প্রশংসাভাজন হয়েছেন যে

---

২. The Indian Journal of English Studies : Vols. I & II, Chairman of the Editorial Board : Prof. Amalendu Bose ; An organ of the Indian Association for English Studies.

This 1937 introduction (to 'A Vision') has less of the unity of a work of art than that of 1925. এলিয়টের শেষের দিকের কবিতার চিত্রকল্পনা প্রসঙ্গে লেখক মন্তব্য করেছেন, 'While the images of the Waste Land are mostly primordial, those in Four Quartets are archetypes of transformation এবং পরবর্তীকালের ইমেজ-কল্পনা যে পরস্পর interrelated এই তত্ত্বটি লেখক সুন্দর পরিস্ফুট করে তুলেছেন।

প্রবন্ধটির শেষে Notes & Comments, Book Reviews এবং Brief Notices অংশগুলি খুবই উপভোগ্য। প্রাপ্তব্য আলোচনাগুলি নানা সমস্যার ইঙ্গিত দেয়: যেমন সুবোধ সেনগুপ্তের Towards a theory of Imagination বইটি প্রসঙ্গে অমলেন্দু বসু মন্তব্য করেছেন, প্লেটোর পরই কোলরিজের আলোচনা করায় এরিস্টটলের মূল্যবান চিন্তাগুলি, বিশেষ করে imagination-এর উৎপত্তির মৌলিক তত্ত্বটি আমরা এড়িয়ে যেতে পারি। এবিষয়ে প্রকৃত ঐতিহাসিকের দৃষ্টিদান থাকা বাঞ্ছনীয়। কিংবা ওয়ার্ডস্বার্থের sound imagery প্রসঙ্গে জিলোচন মিশ্রের মন্তব্য 'he quickly passed from the physical impulse of sound to the inward integration of the sensation'—রোমান্টিক কাব্যধারার একটি সুস্পষ্ট দিক ইঙ্গিত করে।

আমরা অনুরোধ করব, অধ্যাপক গোষ্ঠীর বাইরেও যে বিরাট সাহিত্যরসিকমণ্ডলী আছে, কর্তৃপক্ষ যেন তাদের কাছে এই মূল্যবান পত্রিকাটি পৌঁছবার দায়িত্ব নেন এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের সহযোগিতার আহ্বান জানান।

অরুণ ভট্টাচার্য

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক টেম্পল প্রেস, ৭, ভারত সেন ও শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস, ১৩৬১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯, থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।